সাহিত্যপাঠ

(গদ্য ও কবিতা)

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

সাহিত্যপাঠ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

লেখক ও সংকলক

অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান

অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম

ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান

প্রীতিশকুমার সরকার

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই-২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : জুন-২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য : ১১৩.০০ (একশত তেরো) টাকা।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে অধিকাংশ বিষয়ের মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণির **বাংলা সাহিত্য পাঠ** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে একদিকে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাক্রম সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যদিকে এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি চেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাকার বিষয়ও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাও এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মনন, মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

(প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা)
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র : গদ্য

ক্রমিক নম্বর	শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	আত্মচরিত	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১
০২	বিড়াল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯
০৩	কাসেমের যুদ্ধযাত্রা	মীর মশাররফ হোসেন	১৫
০৪	অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১
০৫	বর্ষা	প্রমথ চৌধুরী	৩৫
০৬	বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৯
০৭	চাষার দুক্ষু	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	৫৩
০৮	পণ্ডিত সাহেব	কাজী আবদুল ওদুদ	৫৯
০৯	আহ্বান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫
১০	ভুলের মূল্য	কাজী মোতাহার হোসেন	৭১
১১	তাজমহল	বনফুল	৭৫
১২	আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৯
১৩	জীবন ও বৃক্ষ	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	৮৩
১৪	মানব-কল্যাণ	আবুল ফজল	৮৭
১৫	গন্তব্য কাবুল	সৈয়দ মুজতবা আলী	৯১
১৬	মাসি-পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
১৭	কলিমদ্দি দফাদার	আবু জাফর শামসুদ্দিন	১০৯
১৮	সৌদামিনী মালো	শওকত ওসমান	১১৭
১৯	চেতনার অ্যালবাম	আবদুল হক	১২৭
২০	বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান	১৩১
২১	একটি তুলসী গাছের কাহিনি	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	১৩৯
২২	মানুষ	মুনীর চৌধুরী	১৪৭
২৩	মৌসুম	শামসুদ্দীন আবুল কালাম	১৫৫
২৪	গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া	আবদুল্লাহ আল-মুতী	১৬৩
২৫	কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ	শওকত আলী	১৭১
২৬	জাদুঘরে কেন যাব	আনিসুজ্জামান	১৮১
২৭	রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১৮৯
২৮	মহাজাগতিক কিউরেটর	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	১৯৯
২৯	মহুয়া	দ্বিজ কানাই	২০৫
৩০	নেকলেস	গী দ্য মোপাসাঁ	২১১

সূচিপত্র : কবিতা

ক্রমিক নম্বর	শিরোনাম	কবি	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	কালকেতুর ভোজন	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	২২১
০২	ঋতু-বর্ণন	আলাওল	২২৪
০৩	স্বদেশ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২২৮
০৪	বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২৩১
০৫	সুখ	কায়কোবাদ	২৩৮
০৬	মানব-বন্দনা	অক্ষয়কুমার বড়াল	২৪১
০৭	সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫০
০৮	ঐকতান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫৫
০৯	নবান্ন	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৬০
১০	জীবন-বন্দনা	কাজী নজরুল ইসলাম	২৬৪
১১	সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম	২৬৯
১২	এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে	জীবনানন্দ দাশ	২৭৩
১৩	নতুন কবিতা	জসীমউদ্‌দীন	২৭৬
১৪	তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	২৮০
১৫	আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম	শাহ আবদুল করিম	২৮৫
১৬	সেই অস্ত্র	আহসান হাবীব	২৮৮
১৭	পাঞ্জেরি	ফররুখ আহমদ	২৯২
১৮	আলো চাই	সিকান্‌দার আবু জাফর	২৯৬
১৯	আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৩০০
২০	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	৩০৪
২১	তোমার আপন পতাকা	হাসান হাফিজুর রহমান	৩০৮
২২	হাড়	আলাউদ্দিন আল আজাদ	৩১৪
২৩	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	৩১৮
২৪	নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	৩২৪
২৫	ছবি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	৩২৮
২৬	লোক-লোকান্তর	আল মাহমুদ	৩৩২
২৭	ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	৩৩৫
২৮	রক্তে আমার অনাদি অস্থি	দিলওয়ার	৩৪০
২৯	ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়	শহীদ কাদরী	৩৪৩
৩০	শান্তির গান	মহাদেব সাহা	৩৪৭

গদ্য

আত্মচরিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। তাঁর বংশ পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর তাঁর উপাধি। ঈশ্বরচন্দ্র নিজ গ্রামে পাঠশালার পাঠ শেষে আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। সেখানে শিবচরণ মল্লিকের বাড়ির পাঠশালায় এক বছর অধ্যয়ন সম্পন্ন করে তিনি ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজে নিরবচ্ছিন্ন বারো বছর অধ্যয়ন করে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে লাভ করেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। তিনি ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগে হেড পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে সরকার কর্তৃক বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হলে তাঁরই তত্ত্বাবধানে কুড়িটি মডেল স্কুল ও পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নিজ অর্থ ব্যয়ে মেট্রোপলিটন কলেজ (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন তাঁর অনন্য কীর্তি।

ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম গদ্যে যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। তাঁকে বলা হয় বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী। শিক্ষকতা ছাড়াও সমাজ সংস্কার ও মুক্তচিন্তার প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান তুলনারহিত। সমাজে বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষার প্রচলনে এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। পাঠ্যবই রচনায়ও তিনি অসামান্য মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। এছাড়া 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'বর্ণ পরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'ভ্রান্তিবিলাস' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ জুলাই কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক জননীর প্রথম সন্তান। বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্নসময়ে হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও আজ কাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাসবাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।"...

পিতৃদেব ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম যখন ১৪/১৫ বৎসর, তখন তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাস, প্রথমত বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না।...

যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়াশুনা করাই কর্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইংরেজি জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরেজি পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইংরেজি পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লিতে ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না।

যাহা হউক, একই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নির্বিঘ্নে, দুই বেলা আহার ও ইংরেজি পড়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব হইয়া গেল; সুতরাং, তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কৃষ্ট উপস্থিত হইল।...

এক দিন, মধ্যাহ্নসময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন।...

ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন; ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।

কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন।

দুই-তিন বৎসর পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাইভগিনীগুলির, অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল।

এই সময়ে, ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ-চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতীদেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ-ছয় মাস বাস করিতেন। কিন্তু একদিনের জন্যেও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুত, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে, তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত, আদ্যন্ত অবিচলিতস্নেহে, প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদানবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইহার পাঠশালার ছাত্রেরা, অল্প সময়ে উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত, এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।...

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমত এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল; একবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে, প্লীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও প্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে শীঘ্র আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু, রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল, রাধামোহন বিদ্যাভূষণ আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আমাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। মাতুলের সন্নিকটে কোটরীনামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। তিন মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। এই সময়ে, আমার উপর, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হইলাম এবং পুনরায় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা, আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল। আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম।...

পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনও প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার-প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভালো। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন কালেও আবশ্যক হয় নাই।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যুষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায় সকল সময়ে ঐ সকল স্থল দিয়া একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই-চারি বার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। ... বড়বাজারনিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা। এই সময়ে জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাহার এক পুত্র, এইমাত্র তাহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দেসম্ভাষণ করিতেন; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে, বড় দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কস্মিন কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমার ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি

স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমত কিছু দিন, তাহার জন্য, যার পর নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে, তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহ ও যত্নে আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতি জিনিস বিক্রি হইত। যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিস কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময় কর্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময় বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায় অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লিগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষাবিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইলস্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই–

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মতো একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোঁতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোঁতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইলস্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইলস্টোন কী, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইংরেজি কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোঁতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদাই করা রহিয়াছে। এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় 'একের পিঠে নয় উনিশ' ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এটি ইংরেজির এক আর এইটি ইংরেজির নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইলস্টোন যেখানে পোঁতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই আমি ইংরেজির অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইলস্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইলস্টোন দেখিয়া পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইংরেজি অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইলস্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপে

বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইলস্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর, পঞ্চম মাইলস্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইলস্টোন, বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইলস্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া 'বেস বাবা বেস' এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া, তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইল স্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা একবাক্য হইয়া, 'তবে ইহাকে রীতিমত ইংরেজি পড়ান উচিত' এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে সিদ্ধেশ্বরীতলার ঠিক পূর্বদিকে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে; ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও; যদি ভালো শিখিতে পারে বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক; হিন্দু কালেজে পড়িলে ইংরেজির চূড়ান্ত হইবেক। আর যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইংরেজি জানিলে, হাতের লেখা ভালো হইলে ও যেমন তেমন জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশত ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমার ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি চাকরি করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণ রূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।

[সংক্ষিপ্ত পাঠ]

শব্দার্থ ও টীকা

ক্রোশ	–	দূরত্ব পরিমাপের একক। দুই মাইলের চেয়ে কিছু বেশি।
নিরাকৃত	–	নিরাকরণ। দূরীকরণ।
বিজ্বর	–	জ্বরমুক্ত।
অতিসার	–	উদরাময়। পেটের পীড়াবিশেষ।
অনুবর্তন	–	অনুসরণ। অনুগমন।
কপটবাচী	–	কপট বা মিথ্যা কথা বলে যে।
আক্কেলসেলামি	–	মূর্খতার জন্য প্রাপ্ত শাস্তি।
দেহাত্যয়	–	দেহত্যাগ। মৃত্যু।
সৌম্যমূর্তি	–	প্রসন্ন বা প্রশান্ত মূর্তি।
কৃতঘ্ন	–	উপকারীর অপকার করে যে।
পামর	–	পাপিষ্ঠ। নরাধম।
সমভিব্যাহারী	–	একত্রে অবস্থানকারী। সঙ্গী।
হৌস	–	সওদাগরি দপ্তর বা অফিস।

পাঠ-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক বর্ণনাধর্মী অসমাপ্ত রচনার নাম 'আত্মচরিত'; সংকলিত অংশে তাঁর শৈশব জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে। এ রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতা, পিতামহ ও জননীর কথা বর্ণনা করেছেন। বিষয় অনুসারে গদ্যের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে তাঁর সহজাত শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটেছে বর্তমান রচনায়। কৌতুকবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা এবং পাঠকের বোধগম্য করার অভিপ্রায়ে যথার্থ বিরামচিহ্ন ব্যবহার বর্তমান রচনার বিশিষ্ট প্রান্ত। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবকালে ছিলেন ডানপিটে। পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করা হয় এবং আট বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যুর পর, পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থোপার্জনের নিমিত্তে কলকাতায় পাড়ি জমান, তখন বালক ঈশ্বরচন্দ্রও পিতার হাত ধরে শহরে আসেন। কলকাতায় যাবার প্রাক্কালে, রাস্তার পাশে 'বাটনাবাটা শিলের মতো' প্রস্তর বা মাইলস্টোন দেখে বালক ঈশ্বরচন্দ্র খুবই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর পিতৃদেবের সহায়তায় পাথরের গায়ে খোদিত ইংরেজি অঙ্কগুলো অতি দ্রুত শিখে নেন। বালকের অভাবিত মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর পিতা ও অন্য সহগামীবৃন্দ বিস্ময়াভিভূত হন; তখন কেউ কেউ ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দেন, ঈশ্বরচন্দ্রকে যেন ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়, কারণ ইংরেজি ভাষা ভালো জানা থাকলে 'সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে' কাজ পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু ঠাকুরদাস এসব পরামর্শ কানে নেননি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "আত্মচরিত" রচনাটিতে কে স্পষ্টবাদী?

ক. কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় খ. রাধামোহন বিদ্যাভূষণ

গ. রামজয় তর্কভূষণ ঘ. ভাগবতচরণ সিংহ

২. কোন গুণের কারণে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে উপযুক্ত শিক্ষক বলা যায়?

ক. আগ্রহের জন্য খ. সদিচ্ছার জন্য

গ. যত্নশীলতার জন্য ঘ. প্রশিক্ষণের জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মেঘনা গ্রামের অপু কাজের সন্ধানে ঢাকায় এসে বংশালের সাইকেল ব্যবসায়ী কাদের সাহেবের কাছে আশ্রয় নিলেন। গ্রামের স্কুলটি তেমন ভালো নয় বলে তিনি পুত্র উপলকে মালিকের বাসায় এনে রাখেন। মালিকের বোন রুমা অপত্য স্নেহ দিয়ে উপলকে দেখাশুনা করতে লাগলেন। উপল একাকিত্ব ও গ্রামের স্মৃতি ভুলে সেখানে দিনাতিপাত করতে লাগল। এই সান্নিধ্যের কারণে উপল নারীর প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।

৩. উদ্দীপকের রুমা "আত্মচরিত" রচনার কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়?

ক. গৃহিণীর খ. জ্যেষ্ঠ ভগিনীর

গ. কনিষ্ঠা ভগিনীর ঘ. পিতামহীদেবীর

৪. উক্ত চরিত্রটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে–

i. জননীর স্নেহ

ii. দায়িত্ব বোধ

iii. মমত্ব

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাকাল গ্রামের মন্দিরের পুরোহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ তার পুত্র দিনেশকে টোল অর্থাৎ সংস্কৃত পাঠশালায় পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রামবাসী তাকে বোঝালেন, এ শিক্ষা শেষে সব ধরনের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করলে শিক্ষার দিগন্ত ও জ্ঞানার্জনের পথ বিস্তৃত হয় এবং চাকরির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত দিনেশকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করলেন।

ক. বড় বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের কিসের দোকান ছিল?

খ. ঈশ্বরচন্দ্রকে কেন ইংরেজি পড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।

গ. 'দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার সাদৃশ্য আছে।'– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "দিনেশ ও ঈশ্বরচন্দ্র একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন"–'আত্মচরিত' অবলম্বনে মূল্যায়ন কর।

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬এ জুন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্নাতকদের মধ্যে তিনি একজন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। এ চাকরিসূত্রে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে তিনি নীলকরদের অত্যাচার দমন করেছিলেন। দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান; যোগ্য বিচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বাংলা সাহিত্যচর্চায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তিনি। উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার বাইরে ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মৃণালিনী’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘রাজসিংহ’, ‘সীতারাম’। ‘Rajmohons Wife’ নামে একটি ইংরেজি উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা ও সমাজবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ‘লোকরহস্য’, ‘বিজ্ঞানরহস্য’, ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, ‘সাম্য’, ‘কৃষ্ণচরিত্র’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ইত্যাদি তাঁর গদ্যগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ‘সাহিত্যসম্রাট’ উপাধিতে ভূষিত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে– দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই– এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও!”

চাহিয়া দেখিলাম– হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিং ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, “মেও!”

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, “মেও!” বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, “কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।” বুঝি সে “মেও!” শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, “তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি– এখন বল কী?”

বলি কী? আমি তো ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কী জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে– আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল– অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী– আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে– চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না– সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালংকার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা তো নয়– তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ– দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর– আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর– ছি! ছি!

দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি– কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল– গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল– তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

আর, আমাদিগের দশা দেখ– আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে– জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে– অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!–' আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জারপণ্ডিত! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জার বলিল, "না হইলে ত আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে– আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মর্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শব্দার্থ ও টীকা

চারপায় – টুল বা চৌকি।

প্রেতবৎ – প্রেতের মতো।

নেপোলিয়ন – ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯–১৮২১) প্রায় সমগ্র ইউরোপে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াটারলু যুদ্ধে ওয়েলিংটনের ডিউকের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়েলিংটন – ঐতিহাসিক চরিত্র, একজন বীর যোদ্ধা। তিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটন নামে পরিচিত (১৭৬৯-১৮৫৪)। ওয়াটারলু যুদ্ধে তাঁর হাতে নেপোলিয়ন পরাজিত হন।

ডিউক – ইউরোপীয় সমাজের বনেদি বা অভিজাত ব্যক্তি। অতীতে ইউরোপের স্বাধীন অঞ্চলের শাসকশ্রেণি।

মার্জার – বিড়াল।

ব্যূহ রচনা – প্রতিরোধ বেষ্টনী তৈরি করা। যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো।

প্রকটিত – তীব্রভাবে প্রকাশিত।

যষ্টি – লাঠি।

দিব্যকর্ণ – ঐশ্বরিকভাবে শ্রবণ করা।

ঠেঙ্গালাঠি	–	প্রহার করার লাঠি।
শিরোমণি	–	সমাজপতি। সমাজের প্রধান ব্যক্তি।
ন্যায়ালংকার	–	ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত।
ভার্যা	–	স্ত্রী। বউ।
সতরঞ্চ খেলা	–	নিচে (মাটিতে) বিছিয়ে যে খেলা খেলতে হয়; পাশা খেলা। দাবা খেলা।
লাঙ্গুল	–	লেজ। পুচ্ছ।
সোশিয়ালিস্টিক	–	সমাজতান্ত্রিক। সমাজের সবাই সমান – এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ।
নৈয়ায়িক	–	ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি।
কস্মিনকালে	–	কোনো সময়ে।
মার্জারী মহাশয়া	–	স্ত্রী বিড়াল।
জলযোগ	–	হালকা খাবার। টিফিন।
সরিষাভোর	–	ক্ষুদ্র অর্থে (উপমা)। স্বল্প পরিমাণ।
পতিত আত্মা	–	বিপদগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত আত্মা। এখানে বিড়ালকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। তিন অংশে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে যে কটি প্রবন্ধ আছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিড়াল'। একদিন কমলাকান্ত নেশায় বুঁদ হয়ে ওয়াটারলু যুদ্ধ নিয়ে ভাবছিলেন। এমন সময় একটা বিড়াল এসে কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধটুকু খেয়ে ফেলে। ঘটনাটা বোঝার পর তিনি লাঠি দিয়ে বিড়ালটিকে মারতে উদ্যত হন। তখন কমলাকান্ত ও বিড়ালটির মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন চলতে থাকে। এর প্রথম অংশ নিখাদ হাস্যরসাত্মক, পরের অংশ গূঢ়ার্থে সন্নিহিত।

বিড়ালের কণ্ঠে পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, দলিতের ক্ষোভ-প্রতিবাদ-মর্মবেদনা যুক্তিগ্রাহ্য সাম্যতাত্ত্বিক সৌকর্যে উচ্চারিত হতে থাকে, "আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক।" মাছের কাঁটা, পাতের ভাত – যা দিয়ে ইচ্ছে করলেই বিড়ালের ক্ষিধে দূর করা যায়, লোকজন তা না করে সেই উচ্ছিষ্ট খাবার নর্দমায় ফেলে দেয়। যে ক্ষুধার্ত নয়, তাকেই বেশি করে খাওয়াতে চায়। ক্ষুধাকাতর-শ্রীহীনদের প্রতি ফিরেও তাকায় না, এমন ঘোরতর অভিযোগ আনে বিড়ালটি।

বিড়ালের 'সোশিয়ালিস্টিক', 'সুবিচারিক', 'সুতার্কিক' কথা শুনে বিস্মিত ও যুক্তিতে পর্যুদস্ত কমলাকান্তের মনে পড়ে আত্মরক্ষামূলক শ্লেষাত্মক বাণী– "বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে"– এবং তিনি সে-রকম কৌশলের আশ্রয় নেন। সাম্যবাদবিমুখ, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের একজন সরকারি কমকর্তা হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিড়ালের মুখ দিয়ে শোষক-শোষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-চোরের অধিকারবিষয়ক সংগ্রামের কথা কী শ্লেষাত্মক, যুক্তিনিষ্ঠ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তা এ প্রবন্ধ পাঠ করে উপলব্ধি করা যায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কমলাকান্ত বিড়ালের উপর রাগ করতে না পারার কারণ, বিড়ালের–

ক. অধিকার
খ. দুর্দশা
গ. ক্ষুৎপিপাসা
ঘ. দারিদ্র্য

২. 'বিড়ালের প্রতি পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়' বলতে কোন ধরনের আচরণকে বোঝানো হয়েছে?

ক. প্রথাগত
খ. স্বাভাবিক
গ. স্বভাববিরুদ্ধ
ঘ. অস্বাভাবিক

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে
নিচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

৩. কবিতাংশে "বিড়াল" প্রবন্ধের যে চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা হলো–

i. শ্রেণিবৈষম্য
ii. সাম্যবাদিতা
iii. মানবিকতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নিচের কোন বাক্যে?

ক. অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়
খ. তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী?
গ. পরোপকারই পরম ধর্ম
ঘ. খাইতে পাইলে কে চোর হয়?

সৃজনশীল প্রশ্ন

নাজমার বড় সংসার। স্বামী অকর্মণ্য। তাই সে বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে। এ স্বল্প আয়ে সংসার চলে না বলে বাধ্য হয়ে তাকে বিভিন্ন বাড়ি থেকে মশলা, তৈল, তরকারি চুরি করে সংসারের চাহিদা পূরণ করতে হয়। চুরি করার কারণে এখন আর কেউ তাকে কাজে নেয় না। তাই পরিবারের প্রয়োজন কীভাবে পূরণ হবে এ চিন্তায় সে আকুল হয়ে ওঠে।

ক. মার্জারের মতে, সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ কী?

খ. 'তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. নাজমা ও বিড়ালের জীবন কোন দিক থেকে বিপন্ন–"বিড়াল" রচনার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নাজমার কাজ নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্মাচারবিরোধী'– "বিড়াল" রচনা অবলম্বনে মূল্যায়ন কর।

কাসেমের যুদ্ধযাত্রা
মীর মশাররফ হোসেন

লেখক-পরিচিতি

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়ায় মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশিদূর অগ্রসর না হলেও মীর মশাররফ হোসেন ফরিদপুর নবাব এস্টেটে ও দেলদুয়ার এস্টেটে চাকরি করে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। এরপর তিনি কলকাতা ও পরে পদমদিতে অনেক দিন অবস্থান করেন। ছাত্রজীবনেই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। মুসলিম রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রবর্তক হিসেবে তিনি খ্যাত। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে– নাটক : 'বসন্তকুমারী', 'জমিদার দর্পণ', 'এর উপায় কি'; গদ্য : 'বিষাদ-সিন্ধু', 'নিয়তি কি অবনতি', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী', 'ফাস কাগজ' প্রভৃতি। মহররমের বিষাদময় ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু' তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাঁর রচিত মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ।

মীর মশাররফ হোসেন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সূর্যদেব যতই ঊর্ধ্বে উঠিতেছেন, তাপাংশ ততই বৃদ্ধি হইতেছে। হোসেনের পরিজনেরা বিন্দুমাত্র জলের জন্য লালায়িত হইতেছেন, শত শত বীরপুরুষ শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভ্রাতা, পুত্র, স্বামীর শোণিতাক্ত কলেবর দেখিয়া কামিনীরা সময়ে সময়ে পিপাসায় কাতর হইতেছে; চক্ষুতে জলের নামমাত্রও নাই, সেই যেন একপ্রকার বিকৃত ভাব, কাঁদিবার বেশি শক্তি নাই। হোসেন চতুর্দিক চাহিয়া দেখিলেন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আর কেহই নাই। রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া জয়লাভের জন্য শত্রুসম্মুখীন হইতে আদেশের অপেক্ষায় তাঁহার সম্মুখে আজ কেহই আসিতেছে না। হোসেন এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়! একপাত্র বারি প্রত্যাশায় এত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব হারাইলাম, তথাচ পরিবারগণের পিপাসা নিবারণ করিতে পারিলাম না। কারবালাভূমিতে রক্তস্রোত বহিতেছে, তথাচ স্রোতস্বতী ফোরাত শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আর বাঁচিবার ভরসা নাই, আশাও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই।"

হাসান-পুত্র কাসেম পিতৃব্যের এই কথা শুনিয়া সুসজ্জিত বেশে সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "তাত, কাসেম এখনো জীবিত আছে। আপনার আজ্ঞাবহ চিরদাস আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। অনুমতি করুন, শত্রুকুল নির্মূল করি।"

হোসেন বলিলেন, "কাসেম, তুমি পিতৃহীন, তোমার মাতার তুমিই একমাত্র সন্তান; তোমায় এই ভয়ানক শত্রুদলমধ্যে কোন প্রাণে পাঠাইব?"

কাসেম বলিলেন, "ভয়ানক! আপনি কাহাকে ভয়ানক শত্রু জ্ঞান করেন? পথের ক্ষুদ্র মক্ষিকা, পথের ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে আমি যেমন ক্ষুদ্র জ্ঞান করি, আপনার অনুমতি পাইলে এজিদের ভয়ংকর ভয়ংকর সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সেইরূপ তৃণজ্ঞান করিতে পারি। কাসেম যদি বিপক্ষ ভয়ে ভয়ার্তচিত্ত হয়, হাসানের নাম ডুবিবে, আপনার নামও ডুবিবে। অনুমতি করুন, একা আমি সশস্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ রিপুবিনাশে সমর্থ।"

হোসেন বলিলেন, "প্রাণাধিক! আমার বংশে তুমি সকলের প্রধান, তুমি ইমাম বংশের বহুমূল্য রত্ন, তুমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি সৈয়দ বংশের অমূল্যনিধি! তুমি তো তোমার মাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে এবং সমুদয় পরিজনকে সান্ত্বনা কর। আমি নিজেই যুদ্ধ করিয়া ফোরাতকূল উদ্ধার করিতেছি।"

কাসেম বলিলেন, “আপনি যাহাই বলুন, কাসেমের প্রাণ দেহে থাকিতে আপনার অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না। কাসেম এজিদের সৈন্য দেখিয়া কখনোই ভীত হইবে না। যদি ফোরাতকূল উদ্ধার করিতে না পারি, তবে ফোরাতনদী আজ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া এজিদের সৈন্যশোণিতে যোগ দিয়া মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হইবে।”

হোসেন বলিলেন, “বৎস! আমার মুখে এ কথার উত্তর নাই। তোমার মাতার আদেশ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।”

হাসনেবানুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মহাবীর কাসেম যুদ্ধযাত্রা প্রার্থনা জানাইলে হাসনেবানু কাসেমের মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্বচন প্রয়োগপূর্বক বলিলেন, “যাও, বাছা, যুদ্ধে যাও। তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ কর। পিতৃশত্রু এজিদের সৈন্যগণের মস্তক চূর্ণ কর, যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফোরাতকূল উদ্ধার কর, তোমার পিতৃব্যকে রক্ষা কর। তোমার আর ভ্রাতা-ভগ্নীগণ তোমারই মুখাপেক্ষা করিয়া রহিল। যাও বাপ, তোমায় আজ ঈশ্বরের পদতলে সমর্পণ করিলাম।”

হাসনেবানুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পিতৃব্যের পদচুম্বনপূর্বক কাসেম অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবেন, এমন সময় হোসেন বলিলেন, “কাসেম, একটু বিলম্ব কর।” অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র অশ্ববল্গা ছাড়িয়া কাসেম তৎক্ষণাৎ পিতৃব্যসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, “কাসেম, তোমার পিতার নিকট আমি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, আমাকে সেই প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার করিয়া যুদ্ধে গমন কর। যুদ্ধে যাইতে আমার আর কোনো আপত্তি নাই। তোমার পিতা প্রাণবিয়োগের কিছু পূর্বে আমাকে করারে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমার কন্যা সখিনার সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি সখিনাকে বিবাহ না করিয়া যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। তোমার পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, আমাকেও প্রতিজ্ঞা হইতে রক্ষা করা,– উভয়ই তোমার সমতুল্য কার্য।”

কাসেম মহাবিপদে পড়িলেন। এতাদৃশ মহাবিপদ সময়ে বিবাহ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই তিনি অস্থিরচিত্ত। কী করেন, কোনো উত্তর না করিয়া মাতার নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন।

হাসনেবানু বলিলেন, “কাসেম! আমিও জানি, আমার সম্মুখে তোমার পিতা তোমার পিতৃব্যের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে করারে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শোক, তাপ এবং উপস্থিত বিপদে আমি সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছি। ঈশ্বরানুগ্রহে তোমার পিতৃব্যের স্মরণ ছিল বলিয়াই তোমার পিতার উপদেশ প্রতিপালিত হইবে বোধ হইতেছে। ইহাতে আর কোনো আপত্তি উত্থাপন করিও না। এখনই বিবাহ হউক। প্রাণাধিক! এই বিষাদ-সমুদ্রমধ্যে ক্ষণকালের জন্য একবার আনন্দস্রোত বহিয়া যাউক।”

কাসেম বলিলেন, “জননী! পিতা মৃত্যুকালে আমাকে একখানি কবচ দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যে সময় তুমি কোনো বিপদে পড়িবে, নিজ বুদ্ধির দ্বারা যখন কিছুই উপায় স্থির করিতে না পারিবে, সেই সময় এই কবচের অপর পৃষ্ঠ দেখিয়া তদুপদেশমতো কার্য করিও। আমার দক্ষিণ হস্তে যে কবচ দেখিতেছেন, ইহাই সেই কবচ। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে অপর পৃষ্ঠ পাঠ করিয়া দেখি কী লেখা আছে!”

হাসনেবানু বলিলেন, “এখনই দেখ! তোমার আজিকার বিপদের ন্যায় আর কোনো বিপদই হইবে না। কবচের অপর পৃষ্ঠ দেখিবার উপযুক্ত সময়ই এই।” এই কথা বলিয়াই হাসনেবানু কাসেমের হস্ত হইতে কবচ খুলিয়া কাসেমের হস্তে দিলেন। কাসেম সম্মানের সহিত কবচ চুম্বন করিয়া অপর পৃষ্ঠ দেখিয়াই বলিলেন, “মা! আমার আর কোনো আপত্তি নাই। এই দেখুন, কবচে কী লেখা আছে। পরিজনেরা সকলেই দেখিলেন, কবচে লেখা আছে, “এখনই সখিনাকে বিবাহ কর।” কাসেম বলিলেন, “আর আমার কোনো আপত্তি নাই। এই বেশেই বিবাহ করিয়া পিতার আজ্ঞা পালন ও পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।”

হাসনেবানু বলিয়াছেন, “বিষাদ-সমুদ্রে আনন্দস্রোত!” যে শিবিরে স্ত্রী-পুরুষেরা, বালক-বালিকারা দিবারাত্রি মাথা ফাটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে, পুত্রমিত্রশোকে জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছে, প্রাণপতির চিরবিরহে সতী নারীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, ভ্রাতার বিয়োগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রিয় ভ্রাতা বক্ষ বিদারণ করিতেছে, শোকে-তাপে

স্ত্রী-পুরুষ একত্রে দিবানিশি 'হায় হায়' রবে কাঁদিতেছে, জগৎকেও কাঁদাইতেছে; আবার মুহূর্ত পরেই পিপাসা, সেই পিপাসারও শান্তি হইল না; সেই শিবিরেই আজ বিবাহ!

কাহারো মুখে হাসি নাই, কাহারো মুখে সন্তোষের চিহ্ন নাই; বিবাহ, অথচ বিষাদ! পুরবাসীগণ সখিনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। রণবাদ্য তখন সাদিয়ানা বাদ্যের কার্য করিতে লাগিল। অঙ্গরাগাদি সুগন্ধি দ্রব্যের কথা কাহারো স্মরণ হইল না; কেবল কষ্টবিনির্গত নেত্রজলেই সখিনার অঙ্গ ধৌত করিয়া পুরবাসিনীরা পরিষ্কৃত বসনে সখিনাকে সজ্জিত করিলেন। কেশগুচ্ছ পরিপাটি করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, সভ্যদেশ প্রচলিত বিবাহের চিহ্নস্বরূপ দুই-একখানি অলংকার সখিনার অঙ্গে ধারণ করাইলেন। সখিনা পূর্ণবয়স্কা, সকলই বুঝিতেছেন। কাসেম অপরিচিত নহেন। প্রণয় ভালোবাসা, উভয়েরই রহিয়াছে! ভ্রাতা–ভগ্নীমধ্যে যেরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র প্রণয় হইয়া থাকে, তাহা কাসেম ও সখিনার বাল্যকাল হইতেই রহিয়াছে। কাহারো স্বভাব কাহারো অজানা নাই, বাল্যকাল হইতেই এই উপস্থিত যৌবনকাল পর্যন্ত একত্র ক্রীড়া, একত্র বাস নিবন্ধন উভয়েরই মনে সবিশেষ সরল প্রণয় জন্মিয়াছে। উভয়েই এক পরিবার, এক বংশোদ্ভূত, উভয়ের পিতা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং লজ্জা, মান, অভিমান অপর স্বামী-স্ত্রীতে যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা উহাদের নাই। লগ্ন সুস্থির হইল। ওদিকে এজিদের সৈন্যমধ্যে ঘোর রবে যুদ্ধবাজনা বাজিতে লাগিল। ফোরাত নদীর কূল উদ্ধার করিতে আর কোনো বীরপুরুষই হোসেনের পক্ষ হইতে আসিতেছে না দেখিয়া আজিকার যুদ্ধে জয় সম্ভব বিবেচনায় তুমুল শব্দে বাজনা বাজিতে লাগিল। সেই শব্দে ফোরাতকূল হইতে কারবালার অন্তঃসীমা পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হোসেনের শিবিরে পতিপুত্রশোকাতুরা অবলাগণের কাতর নিনাদে সপ্ততল আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। সেই কাতরধ্বনি ঈশ্বরের সিংহাসন পর্যন্ত যাইতে লাগিল। হোসেন বাধ্য হইয়া এই নিদারুণ দুঃখের সময় কাসেমের হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতা সখিনাকে সমর্পণ করিলেন। বিধিমতো বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল। শুভকার্যের পর আনন্দাশ্রু অনেকের চক্ষে দেখা যায়, কিন্তু হোসেনের শিবিরস্থ পরিজনগণের চক্ষে কোনো প্রকার অশ্রুই দেখা যায় নাই। বর-কন্যা উভয়েই সমবয়স্ক। স্বামী-স্ত্রীতে দুই দণ্ডে নির্জনে কথাবার্তা কহিতেও আর সময় হইল না। বিবাহকার্য সম্পন্ন করিয়াই গুরুজনগণের চরণ বন্দনা করিয়া মহাবীর কাসেম অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এখন কাসেম শত্রু নিপাতে চলিল।"

হাসনেবানু কাসেমের মুখে শত শত চুম্বন দিয়া আর সকলের সহিত দুই হস্ত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে করুণাময় জগদীশ্বর! কাসেমকে রক্ষা করিও। আজ কাসেম বিবাহসজ্জা, বাসরসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া চিরশত্রু সৈন্য সম্মুখে যুদ্ধসজ্জায় চলিল। পরমেশ্বর! তুমিই রক্ষাকর্তা; তুমিই রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক হইয়া পিতৃহীন কাসেমকে এ বিপদে রক্ষা কর!"

কাসেম যাইতে অগ্রসর হইলেন; হাসনেবানু বলিতে লাগিলেন, "কাসেম, একটু অপেক্ষা কর। চিরমনসাধ আমি পূর্ণ করি। তোমাদের দুই জনকে একত্রে নির্জনে বসাইয়া আমি একটু দেখিয়া লই। উভয়কে একত্রে দেখিতে আমার নিতান্তই সাধ হইয়াছে।" এই বলিয়া সখিনা ও কাসেমকে বস্ত্রাবাসমধ্যে একত্র বসাইয়া বলিলেন, "কাসেম, তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লও।" হাসনেবানু শিরে করাঘাত করিতে করিতে তথা হইতে বাহির হইয়া কাসেমের গম্য পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাসেম সখিনার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কাহারো মুখে কোনো কথা নাই। কেবল সখিনার মুখপানে চাহিয়া কাসেম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাসেম বলিলেন, "সখিনা! প্রণয়–পরিচয়ের ভিখারি আমরা নহি; এক্ষণে নূতন সম্বন্ধে পূর্বের প্রণয় নূতনভাবে আজীবনকাল পর্যন্ত সমভাবে রক্ষার জন্যই বিধাতা এই নূতন সম্বন্ধ সৃষ্টি করাইলেন। তুমি বীরকন্যা, বীরজায়া; এ সময়ে তোমার মৌনী হইয়া থাকা আমার অধিকতর দুঃখের কারণ। পবিত্র প্রণয় তো পূর্ব হইতে ছিল, এক্ষণে তাহার উপরে পরিণয়সূত্রে বন্ধন হইল, আর আশা কী? অস্থায়ী জগতে আর কী সুখ আছে বল তো?"

সখিনা বলিলেন, "কাসেম, তুমি আমাকে প্রবোধ দিতে পারিবে না। তবে এইমাত্র বলি, যেখানে শত্রুর নাম নাই, এজিদের ভয় নাই, কারবালা প্রান্তর নাই, ফোরাতজলের পিপাসাও যেখানে নাই, সেই স্থানে আমি যেন তোমাকে পাই; এই আমার প্রার্থনা। প্রণয় ছিল, পরিণয় হইল, আর কী আশা?"– কাসেমের হস্ত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখিনা পুনঃপুনঃ বলিলেন, "কাসেম! প্রণয় ছিল, পরিণয় হইল, আর কী আশা!"

প্রিয়তমা ভার্যাকে অতি স্নেহসহকারে আলিঙ্গন করিয়া মুখের নিকটে মুখ রাখিয়া কাসেম বলিতে লাগিলেন, “আমি যুদ্ধযাত্রী, শত্রুশোণিতপিপাসু; আজ সপ্ত দিবস একবিন্দুমাত্র জল গ্রহণ করি নাই, কিন্তু এখন আমার ক্ষুধা-পিপাসা কিছুই নাই। তবে যে পিপাসায় কাতর হইয়া চলিলাম, বোধহয় এ জীবনে তাহার তৃপ্তি নাই, হইবেও না। তুমি কাঁদিও না, মনের আনন্দে আমাকে বিদায় কর। একবার কান পাতিয়া শোন দেখি, শত্রুদলের রণবাদ্য কেমন ঘোর রবে বাদিত হইতেছে। তোমার স্বামী, মহাবীর হাসানের পুত্র, হজরত আলীর পৌত্র কাসেম তোমার স্বামী, এই কাসেম কি ঐ বাদ্য শুনিয়া নববিবাহিতা স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? সখিনা! আমি এক্ষণে বিদায় হই।”

সখিনা বলিতে লাগিলেন, “তোমাকে ঈশ্বরে সঁপিলাম। যাও কাসেম–যুদ্ধে যাও! প্রথম মিলনরজনীর সমাগম আশয়ে অস্তমিত সূর্যের মলিন ভাব দেখিয়া প্রফুল্ল হওয়া সখিনার ভাগ্যে নাই। যাও কাসেম!– যুদ্ধে যাও!”

কাসেম আর সখিনার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। আয়তলোচনে বিষাদিতভাবে চক্ষে দেখিতে আর ক্ষমতা হইল না। কোমলপ্রাণা সখিনার সুকোমল হস্ত ধরিয়া বারংবার চুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন। সখিনার আশা-ভরসা যে মুহূর্তে অঙ্কুরিত হইল, সেই মুহূর্তেই শুকাইয়া গেল। কাসেম দ্রুতপদে শিবির হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে অশ্বে আরোহণপূর্বক সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে দৌড়াইয়া চলিল।
[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

তাপাংশ – তাপের অংশ। তাপমাত্রা।

শোণিতাক্ত কলেবর – রক্তাক্ত শরীর। রক্তমাখা দেহ।

কামিনী – রমণী। নারী।

কারবালা – ইরাকে সিরিয়া মরুভূমির পাশে বাগদাদ নগরীর প্রায় ৫৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কারবালার এই ঐতিহাসিক প্রান্তরেই ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের মহররম মাসে হজরত ইমাম হোসেন (রা) এজিদের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁর মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আধুনিক কারবালা শহর। ইমাম হোসেনের (রা) মাজারটি একটি সুদৃশ্য সৌধের মধ্যে অবস্থিত। মাজারের উপরে স্বর্ণমণ্ডিত অর্ধগোলাকার ছাদ এবং তিনটি ছোট মিনার রয়েছে। এটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের পবিত্র স্থান।

স্রোতস্বতী – নদী। প্রবাহিণী।

ফোরাত – ইরাকের বিখ্যাত নদী। পূর্ব তুরস্কে উৎপন্ন এ নদী ইরাকের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৬৭৫ মাইল বিস্তৃত হয়ে তাইগ্রিস নদীতে মিশেছে এবং সেখানেই ‘শাতিল-আরব’ নদী সৃষ্টি করেছে।

তাত – কাকা। চাচা।

ক্ষুদ্র মক্ষিকা – ছোট মাছি।

এজিদ – উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার পুত্র। তার মাতা মাইসুন-বেদুইন গোত্রীয় খ্রিষ্টান বলে কথিত। মুয়াবিয়া জীবিত থাকাকালে ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে পুত্র এজিদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। হজরত রসুল করিম (স) এরপর প্রথম চার খলিফা যে জনগণের নির্বাচিত খিলাফত প্রজাতন্ত্র পরিচালনা করে আসছিলেন। মুয়াবিয়া তাকে একটি বংশগতি রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর (রা) জ্যেষ্ঠপুত্র হজরত ইমাম হাসান তাকে মেনে নিলেও দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হোসেন তাকে মেনে নেননি। কারবালা প্রান্তরে এ কারণে তার সাথে যুদ্ধে নির্মমভাবে শহিদ হন হোসেন ও তাঁর অনুগামী সবাই।

সৈন্যাধ্যক্ষ	–	সেনাপতি। সৈন্যদলের প্রধান পরিচালক।
রিপুবিনাশে	–	শত্রু নিধনে।
অমূল্যনিধি	–	মূল্য দিয়ে কেনা যায় না এমন রত্ন বা সম্পদ।
পিতৃব্য	–	পিতার সহোদর। চাচা বা কাকা। জ্যাঠা।
করারে	–	প্রতিজ্ঞায়। প্রতিশ্রুতির বন্ধনে আবদ্ধ।
পুরবাসী	–	নগরবাসী।
সাদিয়ানা বাদ্য	–	বিয়ের বাজনা।
অঙ্গরাগাদি	–	প্রসাধন সামগ্রী।
লগ্ন	–	রাশির উদয়কাল। মুহূর্ত। ক্ষণ। সময়।
পতিপুত্রশোকাতুরা অবলাগণ	–	স্বামী-পুত্র হারানোর বেদনায় কাতর নারীরা।
সপ্ততল আকাশ	–	অসীম আকাশ।
দুহিতা	–	মেয়ে। কন্যা। তনয়া।
বস্ত্রাবাসমধ্যে	–	তাঁবুর ঘরে।
ভার্যা	–	পত্নী। স্ত্রী।
আয়তলোচনে বিষাদিতভাবে	–	টানাটানা চোখে করুণভাবে।

পাঠ-পরিচিতি

মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু'র একটি আবেগময় অথচ বীরত্বব্যঞ্জক অংশ চয়ন করা হয়েছে এ পাঠটিতে। কারবালা যুদ্ধের সপ্তম দিনে দুর্বিনীত এজিদ বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য হজরত আলীর (রা) পৌত্র প্রয়াত ইমাম হাসানের সুযোগ্য পুত্র মহাবীর কাসেম যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করে পিতৃব্যের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। হোসেন কাসেমকে তার একটি প্রতিজ্ঞা এবং ইমাম হাসানের আজ্ঞার কথা জানান। ইমাম হোসেনের কন্যা সখিনার সঙ্গে কাসেমের বিয়ের ব্যাপারে দুই ভাই হাসান-হোসেন পূর্বেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। কাসেম যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে এ বিয়েতে রাজি হন। যুদ্ধের দামামা পরিণত হলো বিয়ের বাদ্যে। হঠাৎ করেই অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো। অপরদিকে ফোরাত নদীর কূলে এজিদ-শিবিরে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাজনা। কাসেম বিয়ের সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করেন। বিবাহসজ্জা, বাসরসজ্জা সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে কাসেম মায়ের কাছে যান বিদায় নিতে। মা তাঁকে নিয়ে যান সখিনার কাছে। দুজনকে একসাথে দেখাই ছিল তার সাধ। যেখানে শত্রু নেই, বিরোধ নেই, যুদ্ধ নেই সেরকম স্থান-পরিবেশে সখিনা স্বামীর সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। একে একে গুরুজন, মাতা, বধূর কাছে বিদায় নিয়ে শত্রুকে পরাভূত করতে অশ্বপৃষ্ঠে ওঠেন মহাবীর কাসেম। কাসেমের দায়িত্ববোধ, পরিমিতিবোধ, সংযত আবেগ, সংকল্পে দৃঢ়তা প্রভৃতির সমবায়ে এ রচনাটি তাৎপর্য লাভ করেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'তোমাকে ঈশ্বরে সঁপিলাম'– উক্তিটি কার?

ক. হাসানের
খ. হোসনে বানুর
গ. হোসেনের
ঘ. সখিনার

২. 'কাসেম মহাবিপদে পড়িলেন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. যুদ্ধ প্রস্তুতি
খ. ফোরাতকুল উদ্ধার
গ. বিবাহে সম্মতি
ঘ. মায়ের কাছ থেকে বিদায়

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

যুদ্ধ মানেই
শত্রু শত্রু খেলা।
যুদ্ধ মানেই
আমার প্রতি
তোমার অবহেলা।

৩. উপরের কবিতাংশের বক্তা "কাসেমের যুদ্ধযাত্রা" গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়?

ক. হাসান
খ. হোসেন
গ. কাসেম
ঘ. সৈনিক

৪. উক্ত চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে–

i. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
ii. পত্নীপ্রেম
iii. অমনোযোগ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

অমিত সবেমাত্র বিয়ে করেছেন। এমন সময় দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। একদিকে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান। স্ত্রীর মৌন সম্মতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে চলে গেলেন। তিনি বুঝেছিলেন, দেশ অবরুদ্ধ হলে সব কিছু স্থগিত রাখতে হয়।

ক. কবচের অপর পৃষ্ঠে কী লেখা ছিল?

খ. 'বিষাদ-সমুদ্রে আনন্দস্রোত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অমিতের মধ্যে কাসেম চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দিষ্ট দিকটির কারণেই অমিত ও কাসেম নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন'– উক্তিটির পক্ষে তোমার যুক্তি দাও।

অপরিচিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫এ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। বিশ্বকবি অভিধায় সম্ভাষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা এবং বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর লেখনীতেই বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। তাঁর ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলোর সমতুল্য। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে "ভিখারিনী" গল্প রচনার মাধ্যমে ছোটগল্প লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর পর থেকে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ চৌষট্টি বছরে তিনি অখণ্ড 'গল্পগুচ্ছে' সংকলিত ৯৫টি ছোটগল্প রচনা করেছেন। এর বাইরেও 'সে', 'গল্পসল্প' এবং 'লিপিকা' গ্রন্থে তাঁর আরও গল্প সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম "মুসলমানীর গল্প"।

পারিবারিক জমিদারি তদারকির সূত্রে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কালই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ। 'সোনার তরী' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোও তিনি একই সময়ে রচনা করেন। প্রকৃতির পটে জীবনকে স্থাপন করে জীবনের গীতময় বিশ্বজনীন প্রকাশই রবীন্দ্রগল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে বিশ শতকে রচিত গল্পে প্রকৃতি ও গীতময়তার স্থলে বাস্তবতাই প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পকার হিসেবে তিনি যেমন বরেণ্য, ঔপন্যাসিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। তাঁর রচিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো : 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২এ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান ঘটে।

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রুপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রুপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে– বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই– থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল–আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে–"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই– বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন– কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিসতুতো ভাই। তাহার মতো রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল– ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না– কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হ্যাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ–ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-শুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং

বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই। –সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন–বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক–বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন— দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির সেকরাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং সেকরা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা– হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়– যেমন মোটা তেমনি ভারী।

সেকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই–এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে সেকরার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

সেকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন–"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না–এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে –"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার

উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, "দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।" কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি।

মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, "বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল– পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।"

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল– এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি– কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা–এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না–এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক–একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না? হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, "আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।" হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।" মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, "কই কিছুই তো হয় নি বাবা।" বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি

ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, "বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।" কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, "যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও–আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।" তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল–এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকার মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত– আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছি।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।" মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটি শ্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, "এমন তো আর শুনি নাই।"

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি– চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া–"গাড়িতে জায়গা আছে।" আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে–শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট–মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্লাটফর্মে সাহেবেদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না– এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া–"জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল–গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে–কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে–তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক– রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না–ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই–তাহারই কোনো–একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্না ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া–আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়াছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বার বার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু–"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।"

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম–পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত–স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা–"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে– সে যেন কোন ওপারের বাঁশি–আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল–সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল "জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা–জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই–আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

শব্দার্থ ও টীকা

'এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে।'	– গল্পের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।
ফলের মতো গুটি	– গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা।
মাকাল ফল	– দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে গুণহীন।
অন্নপূর্ণা	– অন্নে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা।
গজানন	– গজ (হাতি) আনন যার। গণেশ।

'আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।'	— দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ।
ফল্গু	— ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত।
'ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।'	— অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।
গণ্ডূষ	— একমুখ বা এককোষ জল।
অন্তঃপুর	— অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি।
স্বয়ংবরা	— যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে।
গুড়গুড়ি	— আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ।
বাঁধা হুঁকা	— সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ।
উমেদারি	— প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া।
অবকাশের মরুভূমি	— আনন্দহীন প্রচুর অবসর বোঝানো হয়েছে।
এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।	— লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তাঁর প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল।
পশ্চিমে	— এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।
আন্ডামান দ্বীপ	— ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আন্ডামান বা আন্দামানে পাঠানো হতো।
কোন্নগর	— কলকাতার নিকটস্থ একটি স্থান।
মনু	— বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ।
মনু সংহিতা	— মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ।
প্রজাপতি	— জীবের স্রষ্টা। ব্রহ্মা। ইনি বিয়ের দেবতা।
পঞ্চশর	— মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ।
কন্সর্ট	— নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

সেকরা	–	স্বর্ণকার, সোনার অলংকার প্রস্তুতকারক।
‘বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম’	–	অনুপম নিজের বিবাহযাত্রার পরিস্থিতি বর্ণনায় সুরশূন্য বিকট কোলাহলকে সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছে।
অভিষিক্ত	–	অভিষেক করা হয়েছে এমন।
সওগাদ	–	উপঢৌকন। ভেট।
লোক-বিদায়	–	পাওনা পরিশোধ। এখানে অনুষ্ঠানের শেষে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে।
দেওয়া-থোওয়া	–	বিয়ের যৌতুক ও আনুষঙ্গিক খরচ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে।
কষ্টিপাথর	–	যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করা হয়।
মকরমুখো মোটা একখানা বালা	–	মকর বা কুমিরের মুখাকৃতিযুক্ত হাতে পরিধেয় অলংকারবিশেষ।
এয়ারিং	–	কানের দুল। Earring
দক্ষযজ্ঞ	–	প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌঁছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এখানে প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোঝাচ্ছে।
রসনচৌকি	–	শানাই, ঢোল ও কাঁসি– এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন।
অভ্র	–	এক ধরনের খনিজ ধাতু। Mica
অভ্রের ঝাড়	–	অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি।
মহানির্বাণ	–	সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি।
কলি	–	পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। কলিযুগ। কলিকাল।
কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল!	–	কলিকাল পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল।
পাকযন্ত্র	–	পাকস্থলী।
প্রদোষ	–	সন্ধ্যা।
একচক্ষু লণ্ঠন	–	একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধরনের লণ্ঠন, যা রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
মৃদঙ্গ	–	মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।
‘গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল।’	–	চলন্ত রেলগাড়ির অবিরাম ধাতব ধ্বনি বোঝানো হয়েছে।

ধুয়া	–	গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে।
জড়িমা	–	আড়ষ্টতা। জড়ত্ব।
মঞ্জরী	–	কিশলয়যুক্ত কচি ডাল। মুকুল
একপত্তন	–	একপ্রস্থ।
কানপুর	–	ভারতের একটি শহর।
'তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।'	–	কল্যাণী যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, অনুপমের এই আত্মোপলব্ধি এখানে প্রকাশিত।

পাঠ-পরিচিতি

"অপরিচিতা" প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে, 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।

"অপরিচিতা" গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র বীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থক।

"অপরিচিতা" উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যাঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত।

'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খালনের অকপট কথামালা। অনুপমের আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্যা হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?

ক. ডাক্তারি খ. ওকালতি

গ. মাস্টারি ঘ. ব্যবসা

২. মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার

ক. প্রতিপত্তি খ. প্রভাব

গ. বিচক্ষণতা ঘ. কূট বুদ্ধি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিতৃহীন দীপুর চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। দীপু শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙে দেন। দীপু মেয়েটির ছবি দেখে মুগ্ধ হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

৩. দীপুর চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

ক. হরিশের খ. মামার

গ. শিক্ষকের ঘ. বিনুর

৪. উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে —

i. দৌরাত্ম্য

ii. হীনম্মন্যতা

iii. লোভ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মা মরা ছোট মেয়ে লাবনি আজ শ্বশুর বাড়ি যাবে। সুখে থাকবে এই আশায় দরিদ্র কৃষক লতিফ মিয়া আবাদের সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে পণের টাকা যোগাড় করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু টাকার ঘাটতি রয়ে গেল। এদিকে বর পারভেজের বাবা হারুন মিয়ার এক কথা সম্পূর্ণ টাকা না পেলে তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। বিষয়টি পারভেজের কানে গেলে সে বাপকে সাফ জানিয়ে দেয়, 'সে দরদাম বা কেনাবেচার পণ্য নয়। সে একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। ফিরতে হলে লাবনিকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরবে।'

ক. শম্ভুনাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন?

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুপম ও পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়– মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরূপণ কর।

বর্ষা
প্রমথ চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। শিক্ষাজীবনে তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক। সেই সঙ্গে পরিশীলিত বাগবৈদগ্ধ্যময় রম্যরচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে 'বীরবল' ছদ্মনামে। বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষারীতির প্রথম মুখপত্র 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি ছিল তাঁরই সম্পাদিত। রবীন্দ্রনাথসহ সমকালীন বিখ্যাত মননশীল লেখকদের অনেকেই ছিলেন এই পত্রিকার লেখক। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যশৈলীর নিদর্শন রয়েছে 'চার ইয়ারি কথা', 'বীরবলের হালখাতা', 'রায়তের কথা', 'তেল-নুন-লকড়ি' ইত্যাদি গদ্যগ্রন্থে। 'সনেট পঞ্চাশৎ' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। গল্পকার ও সনেটকার হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট অবস্থান রয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের দোসরা সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে মৃত্যুবরণ করেন।

এমন দিনে কী লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূল নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুই-ই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কী যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তার পর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নতুন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যেসব গাছের ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনো-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে, দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমতো একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতা-পাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তার পর ব্যতিব্যস্ত হবে, তারপর মাথা নাড়বে, তারপর হাত-পা ছুড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন-একটা অনুভূতি যার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কী লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ঐ অনামিক অনুভূতির জমির ওপর অনেক ছোটোখাটো ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠছে, আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুনগুন করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনো পুরোপুরি কখনো আধখানা হয়ে আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যেসব কবিতা যেসব গান আজ আমার মনে পড়ছে সেসবই হয় সংস্কৃত, নয় বাংলা, নয় হিন্দি।

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভূবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালি একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও-চরণ আপনা হতেই বাজতে থাকবে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরনো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে-ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে – 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। এমন দিনে যা বলা যায় তা হয়ত রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেন নি, শেক্‌স্‌পিয়রও বলেন নি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তা হলে তাঁর কবিতার ভিতর কোনো mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয় – পদ্য হতে পারে।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেইসঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেইসব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মতো আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর-একটি চলে যাচ্ছে। ভালো কথা – এটা কখনো ভেবে দেখেছেন যে, বাংলার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, ও-ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই একশো–

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥

সংগীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যেসব কথা আনাগোনা করছে সেসব এতই বিচ্ছিন্ন এতই এলোমেলো যে, সেসব যদি ভাষায় ধরে তার পর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলকধাঁধায় পড়ে যাবেন। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন যিনি বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বন্ধ গদ্যরচনা মনের সুখে পড়তে পারেন তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে তার যা-কিছু মূল্য আছে তা আমার কাছেই আছে, অপর কারো কাছে নেই। বহুকাল-মৃত বহুকাল-বিস্মৃত কোনো শুকনো ফুলের পাপড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুষ্কপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুকনো ফুল সঞ্চিত থাকে যা অপরের কাছে বার করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল, বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না; আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি।

শব্দার্থ ও টীকা

মর্মর	–	শুকনো পাতার খসখস ধ্বনি।
হিল্লোল	–	ঢেউ।
এলিয়ে	–	শিথিল হয়ে।
পত্রপুট	–	পাতা দিয়ে তৈরি ঠোঙা।
ফটিকজল	–	স্বচ্ছ পানি।
অনামিক অনূভূতি	–	নাম দেয়া যায় না এমন অনুভূতি।
শ্লোক	–	ছন্দোবদ্ধ বাক্য।
'মেঘৈ... মৈ'	–	মেঘেতে মেদুর আকাশ, তাল তমালে শ্যামা বনভূমি। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের বর্ষা বর্ণনা। জয়দেবের বর্ষার এই সহজ-সরল রূপ বাঙালির চিরচেনা।
গীতগোবিন্দ	–	কবি জয়দেবের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।
ঘনঘটা	–	মেঘর আড়ম্বর।
ছত্র	–	পঙ্‌ক্তি। লাইন।
Mystery	–	রহস্য।
বায়োস্কোপ	–	চলচ্চিত্র। ছায়াছবি।
কান্তমূর্তি	–	সুন্দর বা কমনীয় মূর্তি।
সাকার	–	আকার বিশিষ্ট।
ঘন	–	মেঘ।
দেয়া	–	আকাশ। মেঘ।
বরিষে	–	বর্ষিত হচ্ছে।
রঙে	–	আনন্দে। আমোদে।
বিগলিত চীর অঙ্গে	–	অঙ্গের শিথিল বা অবিন্যস্ত পোশাকে।
নিন্দ	–	নিদ্রা।
হরিষে	–	আনন্দে।
গোলকধাঁধা	–	প্রহেলিকা।
পাঁচালি	–	গীতাভিনয়।

পাঠ-পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরীর "বর্ষা" প্রবন্ধটি তাঁর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' (১৯৫২) থেকে সংকলিত এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত। নদীমাতৃক এই দেশে বর্ষা ঋতু অত্যন্ত পরিচিত। অবিরাম বৃষ্টিতে বৃক্ষরাজির অবস্থা, মানব মনের আনন্দ-বিষাদ মাখানো অনুভূতি, বর্ষার গান ও কবিতা, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বর্ষার চিত্র প্রাবন্ধিকের মন জুড়ে বয়ে চলেছে। এমন দিন প্রতিটি বাঙালি ভাবুকজনের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর অনুভূতি অন্যের কাছে প্রকাশ করা কঠিন। মন্ময় এই প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বর্ষা মানবহৃদয়কে যে ভাবাবেগে আপ্লুত করে, একই সঙ্গে করে তোলে সজীব ও স্মৃতিকাতর, নৈঃসঙ্গ্যানুভূতিতে জর্জর ও সৃষ্টিমুখর- তারই মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে এ রচনায়। বর্ষা প্রকৃতিতে যে সজীবতা ও আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে তা মানবের প্রাণকেও আন্দোলিত করে গভীরভাবে। এই গভীর হৃদয়ানুভূতি "বর্ষা" প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে; যার মধ্য দিয়ে এ রচনার ভাষা হয়ে উঠেছে নান্দনিক অনুভব-সঞ্জাত বক্তব্য প্রকাশের বিশেষ উপযোগী।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাবন্ধিকের মতে বাংলায় বর্ষা কে আবিষ্কার করেছেন?

ক. জয়দেব খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. কায়কোবাদ ঘ. জসীমউদ্‌দীন

২। 'আনন্দে-বিষাদে মেশানো অনামিক অনুভূতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মন খারাপ করা খ. আত্মভোলা

গ. মনের বিক্ষিপ্ততা ঘ. উচ্ছ্বসিত মন

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে
জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না।

... ...

মেঘমল্লারে সারা দিনমান বাজে ঝরনার গান
মন হারাবার আজি বেলা পথ ভুলিবার খেলা
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চির ঋণে।

৩। উক্ত কবিতাংশটির প্রাকৃতিক অবস্থা "বর্ষা" প্রবন্ধের কোন বিষয়টির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. অবিরাম বর্ষণের খ. বর্ষায় উন্মনা মনের

গ. সাহিত্য রচনায় অনীহার ঘ. শুষ্কতা থেকে মুক্তির

৪। প্রকৃতির এই অবস্থা প্রমথ চৌধুরীকে উদাস করে তোলে, কারণ–

i. বর্ষা মানবমনকে আলোড়িত করে

ii. বর্ষায় মানুষ স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠে

iii. বর্ষার আগমনে প্রকৃতি চঞ্চল হয়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

'এইখানে ছিল প্রমত্তা নদী। বর্ষায় এই নদীর জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে এক অদ্ভুত সুরের জন্ম দিত। আজ এখানে খরা। কতকাল বৃষ্টির শব্দ শুনি না। জলের ফোঁটা পাতার উপর পড়ায় পাতার যে শিহরণ তা দেখে মন ভরে যেত। ঝড়ো বৃষ্টির দাপটে গাছগুলো যেন দাঁড়িয়ে থাকা ভুলে গিয়ে দৌড়ে বেড়াতে চাইত।' এভাবেই কাশেম মাঝি তার নাতনিকে বর্ষার গল্প শোনাচ্ছেন। কেন এমন হলো তা কাশেম মাঝি জানেন না। শুধু শুনেছেন পৃথিবীর মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ে যা খুশি তাই করছে। আর এই কারণে প্রকৃতি আজ এমন বিরূপ। তাহলে কি পৃথিবী থেকে বর্ষা বিদায় নেবে? মানুষ আর বর্ষার রিমঝিম শব্দে উদাস হবে না! এই সব ভাবতে ভাবতে কাশেম মাঝির দুচোখ জলে ভরে উঠে।

ক. প্রমথ চৌধুরী বর্ষার আকাশকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

খ. বর্ষার বাতাসকে 'খামখেয়ালি' বলা হয়েছে কেন?

গ. অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে কাশেম মাঝির অনুভূতিতে "বর্ষা" প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ.অনুচ্ছেদটি "বর্ষা" প্রবন্ধের সমগ্র আবহকে ধারণ করতে পেরেছে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, জননী ভুবনমোহিনী দেবী। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ঔপন্যাসিকের ছেলেবেলা কাটে দারিদ্র্যের মধ্যে। চব্বিশ বছর বয়সে মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। সংগীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতির সূত্রে ঘটনাচক্রে এক জমিদারের বন্ধু হয়েছিলেন তিনি; জীবিকার তাগিদে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন বর্মা মুল্লুকে অর্থাৎ বর্তমান মিয়ানমারে।

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। বিশেষ করে সমাজের নিচু তলার মানুষ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে অপূর্ব মহিমা নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানসের মৌলবৈশিষ্ট্য মানবতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত “মন্দির” নামে একটি গল্প। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : ‘দেবদাস’, ‘পল্লি-সমাজ’, ‘চরিত্রহীন’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘গৃহদাহ’, ‘দেনাপাওনা’ ইত্যাদি। এসব উপন্যাসে বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর বহু উপন্যাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বিদেশি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে।

শরৎচন্দ্র ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই–দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লিগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়–চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি–বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধুলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল–ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান–তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাঁদের ক্ষুধার জ্বালা, তাঁদের কথা না হয় নাই ধরিলাম কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লির এত দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়া কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ওই চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই–দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দুই তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রং ধরিয়াছে, কার পুকুরপাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা–কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে– এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় একরকমই আছে–তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না– সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়–আমরা কিন্তু তাহার ওই থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা–সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ওই বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা–আদালতে নালিশ করিয়া নয়–ওপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ওই আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া–খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই–বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা তো দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এ কথাও কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না–গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি– মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সমুখেই তক্তপোষের ওপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "কে, ন্যাড়া?"

বলিলাম, "হুঁ।"

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনের দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েক দিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য–সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, "পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।"

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, "একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?"

মেয়ে মানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না তো। সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা "না" বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, "ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।"

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় তো যে-কোনো মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কী করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি–বাটীতে ছেলে-পুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তার সদ্যবিধবা স্ত্রী আর আমি। তার স্ত্রী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তো পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার তো আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই–অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভাই, যা হবার সে তো হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কী হইবে? রাতটা কাটুক না।"

বলিলাম, "অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।"

তিনি বলিলেন, "হোক কাজ, তুমি বসো।"

বলিলাম, "বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে", বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।"

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটি শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামি করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপন অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লিগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অত বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে, একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লিগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না–অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে – ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ওই এক কথা–অ্যাঁ এ হইল কী? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার–বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়োবাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছে। অকস্মাৎ লাঠিসোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের ওপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল। খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনো কালে বোধ করি ভাইপোর-স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো?

খুড়া বলিলেন তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীরদর্পে হুংকার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রামস্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে।

এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কী কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল কুকুরে খেয়ে যাবে–রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য–অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লিগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে তো আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা–এ তো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা কিন্তু কাল করিল যে ওই ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে তো আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লিগাঁয়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে তারাই তো একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া!

এই তো ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ওই বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয় এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা-উত্তর ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমনকি, পথে আসিতে অনেকেই দশের এবং দেশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনি আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ দুই দূরের মালোপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা–কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানি বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রান্স পাস করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শুয়ার চরায়। ভালো কায়স্থ–সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে–তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনো কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই তো মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু যাক। ঝোঁকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকারচর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বই জন নরনারীই ওই পল্লিগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, “তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।”

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখরা সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধা হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কবজিতে ওষুধ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে–

–ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন–

মনসা দেবী আমার মা–
ওলটপালট পাতাল–ফোঁড়–
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে–
–দুধরাজ, মণিরাজ।
কার আজ্ঞা–বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রেরও দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন–নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন–তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল ততদিন সাপ ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুই জন। আমার গুরু যে, সে তো ভালো মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ংকর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসলে কথা হইতেছে এই যে, সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুই চারদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরুশিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পালাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, “দেখ, এমন করে মানুষ ঠকায়ো না।”

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, “সবাই করে–এতে দোষ কী?”

বিলাসী বলিত, “করুক গে সবাই। আমাদের তো খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই।”

আর একটা জিনিস আমি বারবার লক্ষ করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত–আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার তো একরকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভালো করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে–সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, “ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় একজোড়া তো আছে বটেই হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।”

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, "এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।"

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, "দেখছ না বাসা করেছিল?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।"

বিলাসী কহিল, "দু-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছে আমি বলছি।"

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় 'উঃ' করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উলটা পিঠ দিয়ে ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি তো ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই 'বিষহরির আজ্ঞা' মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির ওপর একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও-বা একসঙ্গে কখনও আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।

আমার মাদুলি-কবচ তো মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, তো হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে তো তেমন আসে যায় না–না হয় একটু নিন্দাই হতো। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মরলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হলো একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু। গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কী! অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো পল্লিগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই তো মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ংকর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক Contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী– অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

মা-সরস্বতী – হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বীণাপাণি। বাগ্দেবী।

কৃতবিদ্য – বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পণ্ডিত। বিদ্বান।

বঁইচি – কাঁটাযুক্ত একরকম ছোট গাছ ও তার ফল।

রম্ভার কাঁদি – কলার ছড়া।

কানাচ – ঘরের পেছন দিককার লাগোয়া জায়গা।

খেজুরমেতি – খেজুর গাছের মাথার কাছের নরম মিষ্টি অংশ।

কামস্কাট্কা – প্রকৃত উচ্চারণ কামচাট্কা (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর-পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য, তুন্দ্রা ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে এখানে। প্রচুর স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম– পেত্রোপাভ্লোভস্ক্।

সাইবেরিয়া – এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে।

এডেন – লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত।

পারশিয়া – পারস্য বা ইরান দেশ।

হুমায়ূন – মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা।

তোগলক খাঁ – ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন : গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক।

চল্লিশের কোঠা – এখানে চল্লিশ থেকে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা।

থার্ড ক্লাস – বর্তমান অষ্টম শ্রেণি। সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণি হিসাব করা হতো ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণি তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস, নবম শ্রেণি ছিল সেকেন্ড ক্লাস।

প্রত্নতাত্ত্বিক – পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি।

ফোর্থ ক্লাস – এখনকার সপ্তম শ্রেণি।

সেকেন্ড ক্লাস – এখনকার নবম শ্রেণি।

গুলি – আফিমের তৈরি একরকম মাদক যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়।

ওপরের আদালতের হুকুমে – স্রষ্টার নির্দেশে।

এমনি সুনাম – দুর্নাম বোঝাতে বিদ্রুপ করা হয়েছে।

মালো – এ গল্পে সাপের ওঝা অর্থে ব্যবহৃত। সাধারণত এরা সাপ ধরে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা ও সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে মালো বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কেও বোঝায় যাদের পেশা মাছ ধরা।

সদ্ব্যয় করিয়াছি – অপব্যয় করেছি বোঝাতে ব্যঙ্গ ভরে বলা হয়েছে।

কঙ্কালসার – অস্থিচর্মসার অবস্থা যেন প্রায় কঙ্কাল।

যমরাজ – ধর্মরাজ। এখানে মৃত্যু অর্থে।

তিলার্ধ – তিল পরিমাণ সময়ের অর্ধ, মুহূর্তমাত্র।

জনশ্রুতি – লোকপরম্পরায় শোনা কথা, জনরব, লোকশ্রুতি।

সত্যযুগ – হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ যখন সমাজে অসত্য অন্যায় একেবারেই ছিল না বলে ধারণা করা হয়।

রসাতলে গেল – অধঃপাতে বা উচ্ছন্নে গেল।

অকালকুষ্মাণ্ড – অসময়ে ফলেছে এমন কুমড়ো। এখানে অকর্মণ্য ব্যক্তি।

নিকা – আরবি শব্দ নিকাহ্; বিয়ে। বিধবাবিবাহ বা পুনর্বার বিবাহ।

কলি – হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। পুরাণ মতে, এ যুগে অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের বাড়াবাড়ি ঘটবে।

বদন দগ্ধ না হয় – মুখ যেন না পোড়ে। সুনাম যেন নষ্ট না হয়।

নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে – কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একদিকে সর্বভারতীয় রাজারা একপক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নিরস্ত্র রথ-সারথি। সেখানে নারায়ণের নিরপেক্ষ আচরণ ছিল কাপুরুষ-সুলভ। সেই নারায়ণের পথাবলম্বীরাও এরূপ আচরণকে ভীরুতা বলতে লজ্জিত হবে। বাক্যাংশটিতে প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে– ওদের আচরণ এতই বর্বর ছিল যে তা কাপুরুষতার চেয়েও লজ্জাজনক ছিল।

বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে – ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় দেশসমূহে যেখানে হিন্দু সমাজের আচারধর্মের কোনো বালাই নেই।

সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না – এখানে হিন্দু ধর্মের সংস্কারাচ্ছন্নতাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

শ্রাব্য-অশ্রাব্য – শোনার যোগ্য ও অযোগ্য। শ্লীল-অশ্লীল অর্থে ব্যবহৃত।

দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া – এখানে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে– দেবী সরস্বতীর প্রকৃত মান্যতার অভাবে এরা সংকীর্ণতাসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

প্রাতঃস্মরণীয় – প্রাতঃকালে স্মরণ করার যোগ্য। অতি শ্রদ্ধেয়।

সেটা কাশীই বটে – কাশী ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত বিখ্যাত ও সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। সেখানে সাধু-সন্ত-পুণ্যার্থীর সমাবেশ যেমন হয় তেমনি দুশ্চরিত্র লোকজনের আখড়াও সেখানে জমে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূকে যেখান থেকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল তা কাশী হলেও তীর্থস্থান ছিল না বরং পতিতালয় বা অনুরূপ কোনো স্থান ছিল এখানে সেই ইঙ্গিতই করা হয়েছে।

বারওয়ারি – অনেকের সমবেত চেষ্টায় যা করা হয়। সর্বজনীন। বারোয়ারি।

সুদক্ষিণা – পুরোহিতের সম্মানী বা সেলামি।

ফলাহার – জলযোগ। ফলার।

ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল – সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

মহত্ত্বের কাহিনি – মহানুভবতার কথা। ব্যঙ্গার্থে নীচতার কাহিনি।

এন্ট্রান্স – প্রবেশিকা পরীক্ষা। বর্তমান মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য।

ধুচুনি – চাল ইত্যাদি ধোয়ার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের ঝুড়ি।

পঞ্চমুখ – পাঁচ মুখে যে কথা বলে। মুখর।

পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে – ব্যঙ্গ করে সুখ্যাতি বলা হয়েছে। বস্তুত লেখক গ্রামের পুরুষদের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন।

মন্ত্রসিদ্ধ – মন্ত্রে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেছেন এমন যার উচ্চারিত মন্ত্র অব্যর্থভাবে কার্যকর।

মনসা – হিন্দু ধর্মানুসারে সাপের দেবী।

মন্ত্রের দ্রষ্টা – যিনি প্রথম মন্ত্র লাভ করেন। মন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ লোকবিশ্বাস এই যে, মন্ত্র কেউ তৈরি করেন না। তা কোনো ভাগ্যবান দৈববলে পেয়ে থাকেন। যাঁর কাছে প্রথম মন্ত্র আবির্ভূত হয় তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা।

কামাখ্যা – ভারতের আসাম রাজ্যে অবস্থিত প্রাচীন তীর্থস্থান। তান্ত্রিক সাধক ও উপাসকদের তন্ত্রমন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত।

চক্র তুলিয়া – ফণা তুলে।

খরিশ গোখরা – খুব বিষাক্ত এক প্রজাতির গোখরা সাপ।

বিষহরির দোহাই – মনসার মন্ত্রশক্তি।

মৃত্যুঞ্জয় নাম – মৃত্যুঞ্জয় নামের অর্থ– যিনি মৃত্যুকে জয় করেন। বিষকণ্ঠ শিব বা মহেশ্বরের অন্য নাম মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা-মা তাদের পুত্রের নাম মৃত্যুঞ্জয় রাখলেও সে মৃত্যুকে জয় করতে পারল না। তার নাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি – মৃত্যুঞ্জয় তার শ্বশুরের কাছ থেকে অমোঘ মন্ত্রৌষধি পেয়েছিল বলে জনশ্রুতি ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা – জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা হুকুম যা পালন করা বাধ্যতামূলক। ম্যাজিস্ট্রেট চলে গেলেও হুকুম বহাল থাকে।

বাঙালির বিষ – লেখক ব্যঙ্গার্থে বলতে চান, বাঙালির ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি মুখের বাক্যেই সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। তা সাপের বিষের মতো অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়।

পিণ্ডি – শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশে দেওয়া চালের গোলাকার ডেলা।

ভুজ্যি উচ্ছুগ্য – মৃতের আত্মার সদগতি কামনা করে ব্রাহ্মণকে যে ভোজ্য উৎসর্গ করা হয় তা।

বহুদর্শী – জ্ঞানী। অনেক দেখেছেন এমন। বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

ভূদেববাবু – ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করে আধুনিক মানস গঠনের লক্ষ্যে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' ইত্যাদি এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

অতিকায় হস্তী – মহাগজ। Mammoth। হাতির এই প্রজাতি বর্তমান কালের হাতির চেয়ে অনেক বড় ছিল। এই প্রজাতির হাতি প্রাণিজগৎ থেকে লুপ্ত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন রয়ে গেছে তাদের কঙ্কালে।

পাঠ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্রের "বিলাসী" গল্পটি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায়। "ন্যাড়া" নামের এক যুবকের নিজের জবানিতে বিবৃত হয়েছে এ গল্প। এই গল্পের কাহিনিতে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।

"বিলাসী" গল্পে বর্ণিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী দুই মানব-মানবীর চরিত্রের অসাধারণ প্রেমের মহিমা, যা ছাপিয়ে উঠেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা। গল্পে সংঘটিত একের পর এক ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমেই কাহিনি অগ্রসর হয়। ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনিতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। লেখক কোন অবস্থান থেকে কাহিনি বলছেন, সেটা অনেক সময় কাহিনি বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখক সর্বদর্শী অবস্থান থেকেও কাহিনি বর্ণনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি সবগুলো চরিত্র ও ঘটনা–নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বর্ণনা করেন। যেমনটি দেখা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাস এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মাসি-পিসি" গল্পে। পক্ষান্তরে গল্পটি উত্তম পুরুষের ভাষ্যেও বর্ণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে গল্পে আমি, আমাকে ইত্যাদি সর্বনাম এসে যায়। এরকম ক্ষেত্রে কখনো-কখনো লেখক নিজেই কাহিনির একটা চরিত্রের ভূমিকা নেন, হয়ে ওঠেন কথক। "বিলাসী" গল্পে লেখক সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সংকলনের "অপরিচিতা", "আহ্বান" ও "তাজমহল" গল্পে উত্তমপুরুষের ভাষ্য গৃহীত হয়েছে।

"বিলাসী" গল্পের নাম চরিত্র কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমতী ও সেবাব্রতী বিলাসী; শরৎসাহিত্যের অন্যান্য উজ্জ্বল নায়িকাদের মতোই একজন। যে প্রেমের জন্যে নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ আর তার প্রেমের মহিমাময় আলোয় ধরা পড়েছে সমাজের অনুদারতা ও রক্ষণশীলতা, জীবনের নিষ্ঠুর ও অশুভ চেহারা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "ঘন জঙ্গলের পথ। একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।"– উক্তিটি কার?

ক. ন্যাড়ার | খ. মৃত্যুঞ্জয়ের
গ. বিলাসীর | ঘ. খুড়ার

২. 'মহত্ত্বের কাহিনি আমাদের অনেক আছে'। এখানে 'মহত্ত্ব' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ব্যঙ্গার্থে | খ. প্রশংসার্থে
গ. ক্ষোভার্থে | ঘ. নিন্দার্থে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

নিলুফা শহরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তার শহরে কাজ করার বিষয়টি গ্রামের কিছু মানুষ পছন্দ করেন না। ছুটিতে বাড়ি গেলে গ্রামের ওই মানুষগুলো নিলুফার নামে বিচার বসান। তারা নিলুফাকে জোর করে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নিলুফা তাতে প্রতিবাদ করেন। অসুস্থ মাকে রেখে তিনি এসময় কিছুতে কোথাও যাবেন না।

৩. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'বিলাসী' গল্পের যে দিকের সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো–

i. নারীর প্রতি নির্যাতন
ii. কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ
iii. গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii | খ. i ও iii
গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii

৪. এই অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, নিলুফা ও বিলাসী উভয়েই–

i. প্রতিবাদী নারীসত্তা

ii. নির্যাতিত নারী

iii. কুসংস্কারের শিকার

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহপুত্র মিহিরের স্ত্রী খনা। একদিন পিতা বরাহ এবং পুত্র মিহির আকাশের তারা গণনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে খনা এ সমস্যার সমাধান দেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর গুণে মুগ্ধ হন। গণনা করে খনার দেওয়া পূর্বাভাসে রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হতেন বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্ন হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু খনার এই খ্যাতি ও সম্মান অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবনে বিড়ম্বনা নিয়ে আসে। রাজসভায় প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে ও নারীর জ্ঞানের কাছে নিচু হওয়ার লজ্জায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বরাহের আদেশে মিহির খনার জিহ্বা কেটে দেন। এর কিছুকাল পরে খনার মৃত্যু হয়।

ক. খুড়া কোন বংশের?

খ. 'ইহা আর একটি শক্তি'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. বিলাসী চরিত্রের কোন দিকটি খনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'মৃত্যুঞ্জয় ও মিহির পরস্পর বিপরীত চরিত্রের মানুষ।'– মন্তব্যটি যাচাই কর।

চাষার দুক্ষু
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহিরউদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন এবং বৈবাহিক সূত্রে নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। রোকেয়ার পিতা বহু ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। বড়ভাই-বোনের সাহচর্যে রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ভালোভাবেই রপ্ত করেন এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৮৯৮ সালে উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর জ্ঞানার্জনের পথ অধিকতর সুগম হয়। বিরূপ সমালোচনা ও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মুখেও তিনি কখনই নারীশিক্ষার লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি; বরং পর্দাপ্রথা ও শিক্ষাবিমুখ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন। রোকেয়া বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী গদ্য রচনা করেন। তাঁর সব রচনাই সমাজ জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত। 'মতিচূর' ও 'অবরোধবাসিনী' তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। এছাড়া 'সুলতানার স্বপ্ন' ও 'পদ্মরাগ' নামে দুটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন।
১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।

শুনিতে পাই, দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল,– এই দেড় শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই।– সত্যই তো, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর লরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট দশ জন ডাক্তারে টেপে নাড়ী, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি লেমলেন্ড জিঞ্জারেন্ড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য–দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)– এসব কি সভ্যতার নির্দশন নহে? নিশ্চয়! যে বলে 'নহে', সে ডাহা নিমকহারাম।

কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে–কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার 'ধান ভানিতে শিবের গান' কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লিবাসী কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম তবে কেহ চট্ করিয়া আমার চক্ষে আঙুল দিয়া

দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে ইত্যাদি। ভালোর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালোর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল; —এক একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০ —৭০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবি হালে থাকে, নবাবি চাল চালে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে, — "পাছায় জোটে না ত্যানা!" ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহতা'লা এত অবিচার কীরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, — তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, "ধান্য তার বসুন্ধরা যার"। তাই তো, অভাগা চাষা কে? সে কেবল "ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে", হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে "মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল", এ কথার অর্থ কী? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কী করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?

আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? দুই একটি উদাহরণ দেখাই— বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই :

"কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ি লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম" হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।

এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বিহার অঞ্চলে দুই সের খেসারির বিনিময়ে কৃষক পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত। পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা 'পখাল' (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। শুঁটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র-জলে চাউল ধুইয়া ভাত রাধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোন কোন গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাট শাক, লাউ শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত। আর পরিধান করিত কী, শুনিবেন? পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিম্বা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপীন ধারণ করিত। শীতকালে দিবা ভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালি (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে—

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে।

পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র তো এই, তবে "মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল-ভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল" ইত্যাদি কোন সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বের অবস্থা। যখন–

কৃষক রমণী স্বহস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 'এন্ডি' বলে। এন্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সুতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সুতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এন্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এন্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা– কিছুই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র-সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই–

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে– সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবার কারণ কী? কারণ– যেহেতু আপাত সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চরকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এন্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লিবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে "পাছায় জোটে না ত্যানা" কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে ত! "বৌ-এর পৈছা বিকায়" কিন্তু তবু "বেলোয়ারের চুড়ি" থাকে ত! মুটে মজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়– কিন্তু ঐ যাঃ, যাইতে আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এইরূপে দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানি চাই, ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে :

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা,
ঔষধ দিব কোথা?

আর–

এ বহ্নির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকাবাহকগণ পাল্কি লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে।

আবার মজা দেখুন, আমরা তো সুসভ্য হইয়া এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই 'আসাম সিল্ক' নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল! ক্রমে পল্লিবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এন্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর 'হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডল'র দোকানে 'আসাম সিল্ক' পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এন্ডি গুটি বিদেশে চালান যায় – তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই তো সেদিনের কথা – বঙ্গের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একখানি দেশি রেশমি রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কারমাইকেল ইংরাজ বাচ্চা – সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামে ঐরূপ রেশমি রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লিগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে, চাষার দুঃখু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই "মরাই-ভরা ধান, ঢাকা মসলিন" ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশি শিল্প– বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

শব্দার্থ ও টীকা

ছেইলা – ছেলে। সন্তানসন্ততি অর্থে।

পৈছা – স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলংকার।

দানা – খাদ্য অর্থে। ছোলা, মটর, কলাই– এইসব শস্যকেও দানা বলে।

অভ্রভেদী – অভ্র অর্থ আকাশ। অভ্রভেদী অর্থ আকাশ বা মেঘ ভেদকারী। আকাশচুম্বী।

ট্রামওয়ে – ট্রাম চলাচলের রাস্তা। রেলওয়ের মতো রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে। তবে তা অধিকতর হালকা। বাস চলাচলের রাস্তার ভিতরেও ট্রামওয়ে থাকতে পারে।

বায়স্কোপ – চলচ্চিত্র, ছায়াছবি, সিনেমা।

চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড – বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। সুপ্রাচীন কাল থেকে অন্য কুটির শিল্পের মতো সামান্য বৃত্তি থাকলেও কৃষিই এদেশের মানুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি। এমনকী বিশ শতকে পৃথিবীর কিছু দেশ যখন শিল্পে অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে আমাদের দেশ তখনও কৃষি বিকাশকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং কৃষি যে এদেশের মেরুদণ্ড এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

"পাছায় জোটে না ত্যানা" – পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। চটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাটের চাহিদা ও কদর বেড়ে যায়। পাটকল শ্রমিকগণও পর্যাপ্ত মাসোহারা পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে থাকেন। কিন্তু যারা পাট উৎপাদন করতেন সেই কৃষকদের অবস্থা ছিল মানবেতর। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাদের জীবন শেষ হতো। প্রবাদটির ভিতর দিয়ে কৃষকদের সেই করুণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

কৌপীন – ল্যাঙ্গট। চীরবসন। লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্র।

মহীতে – পৃথিবীতে।

টেকো – সুতা পাকাবার যন্ত্র।

এন্ডি – মোটা রেশমি কাপড়।

বেলোয়ারের চুড়ি – উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত চুড়ি।

পাঠ-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'চাষার দুক্ষু' শীর্ষক রচনাটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত "রোকেয়া রচনাবলি" থেকে চয়ন করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে লেখালেখির জগৎ উৎসর্গীকৃত হয়েছে পশ্চাৎপদ নারীসমাজের মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য। কিন্তু 'চাষার দুক্ষু' শীর্ষক প্রবন্ধটি তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার মর্মন্তুদ দলিল হয়ে আছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও অগ্রগতির ফিরিস্তি তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, সেখানে কৃষকদের অবস্থা কত শোচনীয়। পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর গাড়ি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফসহ আরও যে কত আবিষ্কার ভারতবর্ষের শহুরে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ ও সচ্ছল করে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই ভারতবর্ষেই কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না, শীতে বস্ত্র নেই, অসুখে চিকিৎসা নেই। এমনকি তাদের পান্তাভাতে লবণও জোটে না। সমুদ্র তীরবর্তী লোকেরা সমুদ্রজলে চাল ধুইয়ে লবণের অভাব মেটানোর চেষ্টা করেন। টাকায় পঁচিশ সের চাল মিললেও রংপুরের কৃষকগণ চাল কিনতে না পেরে লাউ, কুমড়া, পাট শাক, লাউ শাক সিদ্ধ করে খেয়ে জঠর-যন্ত্রণা নিবারণ করে। কৃষকদের এই চরম দারিদ্র্যের জন্য তিনি সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন। আবার কোনো কোনো কৃষককেও এই বিলাসিতার বিষে আক্রান্ত করেছে। এছাড়া গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয়ও কৃষকদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে আত্মনির্ভরশীল গ্রাম-সমাজকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলেছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর গ্রামীণ কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে রোকেয়ার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, যুক্তিশীলতা ও চিন্তার বিস্ময়কর অগ্রসরতার প্রতিফলন ঘটেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কী কারণ নির্দেশ করেছেন?

ক. সচ্ছলতা খ. বিলাসিতা

গ. অলসতা ঘ. আরামপ্রিয়তা

২. 'নবাবি চাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. অলস সময় কাটানো খ. অসৎ উপার্জন

গ. উৎপাদনহীন অবস্থা ঘ. অনুকরণপ্রিয়তা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

নুরুল গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষক ছিলেন। পৈতৃক জমিজমা তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের উৎস ছিল। বিদ্যুতের অভাবে গ্রামের অন্য কৃষকেরা জমিতে সেচ দিতে পারেন না। কিন্তু নুরুলের ঘরে ছিল এয়ার কন্ডিশন ও বৈদ্যুতিক চুলা। প্রয়োজন না থাকলেও লোকদেখানো সব বিলাস দ্রব্যই তার চাই। এই বিলাসিতার কারণে একে একে সব জমি বিক্রি করে আজ তিনি নিঃস্ব।

৩. নুরুলের বর্তমান অবস্থা "চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধের যে অংশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা হলো–

i. কর্মবিমুখ কৃষকসমাজ

ii. শিক্ষাহীন কৃষককুল

iii. কৃষিকাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উপর্যুক্ত অবস্থার কারণ কী?

ক. পরিশ্রমবিমুখতা খ. সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ

গ. গ্রামীণ শিল্পে অনাগ্রহ ঘ. পশ্চাৎপদতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

সোনাকুড়া গ্রামের শিল্পী ও সবুর কৃষক-দম্পতি। ঋণগ্রস্ত সবুর একে একে সব বন্ধক রেখে আজ নিঃস্ব। বাঁচার তাগিদে শিল্পী গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যান। এবং এক ধনী পরিবারে গৃহপরিচারিকার কাজ নেন। সেখানে দেখেন, গ্রামের নারীদের তৈরি নকশি কাঁথার কদর অনেক বেশি। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শিল্পী গ্রামে ফিরে আসেন। আরও কয়েকজন নারীকে নিয়ে তিনি একটি কর্মীদল গঠন করেন। তারা সবাই মিলে নকশি কাঁথা প্রস্তুত করে শহরে বিক্রির মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্র্য মোচন করেন। শিল্পীও বন্ধক রাখা সব জমি পুনরুদ্ধার করেন।

ক. রংপুর অঞ্চলে রেশমকে স্থানীয় ভাষায় কী বলে?

খ. "শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ *ঢেকে রাখে টাক" বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন?*

গ. "চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধের কোন দিকটি শিল্পীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিল্পীর স্বাবলম্বন "চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধে লেখকের বর্ণিত দিক নির্দেশনার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

পণ্ডিত সাহেব
কাজী আবদুল ওদুদ

লেখক-পরিচিতি

কাজী আবদুল ওদুদ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬এ এপ্রিল রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী সগীরউদ্দীন ও মাতা খোদেজা খাতুন। অসাধারণ মেধাবী কাজী আবদুল ওদুদ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে বিএ এবং অর্থনীতি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি আমীন আহমদ প্রমুখ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু ও আরবি ভাষায়ও দক্ষতা অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি রবীন্দ্রভক্ত হন এবং সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান ঢাকা কলেজে) বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এ সময় ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের সদস্যরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন পরিচালনা করেন। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন এ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক যুগন্ধর পুরুষ। কাজী আবদুল ওদুদ বাংলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কলকাতা যান। সেখানে অবস্থানকালে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 'সংকল্প' এবং 'তরুণপত্র' নামে দুটি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— গল্প : 'মীরপরিবার' উপন্যাস : 'নদীবক্ষে', 'আজাদ'; প্রবন্ধ : 'নবপর্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড)', 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠ', 'সমাজ ও সাহিত্য', 'শাশ্বতবঙ্গ', 'আজকার কথা', 'নজরুল প্রতিভা', 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলার জাগরণ' ইত্যাদি। এছাড়া 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' নামে একটি অভিধান তিনি সংকলন করেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মে কাজী আবদুল ওদুদ কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

বন্ধুরা বললেন, "এত কাছে এবার সাহিত্য-সম্মেলন হচ্ছে, চলো দেখে আসা যাক।" আমি বললাম, 'কী সেখানে হবে তার কল্পনা করা তোমাদের পক্ষে এতই কি শক্ত?' তাঁরা বললেন, "রাখো তোমার কুঁড়েমি, এবার যেতেই হবে; তৈরি হও।"

নির্দিষ্ট দিনে মুন্সীগঞ্জ অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। যাচ্ছিলাম আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে বটে, কিন্তু সেদিন আমাদের সত্যিকার ব্যাপার ছিল নিরুদ্দেশ ভ্রমণ।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছা গেল। আমাদের বাস নির্দিষ্ট হলো শহরের কিছু বাইরে মাঠের মাঝখানে এক দালানে। চারদিকেই খোলামাঠ; পুবদিকে কিছুদূরে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মা–অভিসারী এক খাল; দূরে কৃষক-পল্লি,— শুধু সবুজ গাছের ভিড়; চষা পরিপাটি মাঠে শোভা পাচ্ছে চারা ধানগাছ। মনে মনে খুশি হয়ে ভাবলাম, আমাদের এবারকার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের উপর বিধাতার সুন্দর হস্তের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

যথাসময়ে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া গেল। যথাবিহিত অভিনন্দন আপ্যায়ন সুনিষ্পন্ন হলো। সাহিত্যমহারথীবৃন্দ একে একে তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করে চললেন। যখন যেখানে করতালির প্রয়োজন গল্প আর ধূমপান ক্ষণকালের জন্য বন্ধ করে তা সমাধা করে শ্রোতৃমণ্ডলী নিজেদের সমঝদারির পরিচয় দিলেন। বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি, তার বর্তমান অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ, তার চমৎকারিত্ব, তার ত্রুটি, বাঙালির জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, তার ভবিষ্যৎ কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বহু মন্তব্য শ্রবণ করবার সৌভাগ্য আমাদের হলো। তা রাত্রে ফিরে এসে গ্রাম্য বাবুর্চির বিশুদ্ধ ঘৃতের পোলাও, টাটকা মুরগির কোরমা, আর রামপালি কলা উদরস্থ করে ভলান্টিয়ারদের ভূয়সী প্রশংসা করলাম, আর মনে মনে ভাবলাম–যাক, আমাদের এবারকার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের রস কিছুতেই গেঁজে যাবে না এমন আশা করতে পারি।

জ্যোৎস্না-আলোকিত মাঠের মাঝখানে এই ঘরটিতে বহু রাত পর্যন্ত দরজা-জানালা খুলে রেখে শেষে ঘুমিয়ে পড়া গেল। গানের শব্দে সকালে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, পাশের বিছানায় বসে এক বন্ধু ভৈরবী-ললিত মিশানো একটি গান গাচ্ছেন। আমার পানে চেয়ে তিনি হাসলেন, আমিও হাসলাম। পাশে চাইতেই দেখলাম–একজন গ্রাম্য 'মুসল্লি'-গোছের লোক ওধারের চেয়ারে বসে আমারই দিকে চেয়ে আছেন। তিনি আদাব করলেন; আমি আদাব করলাম। কালো স্বাস্থ্য-সমন্বিত জওয়ান চেহারা তাঁর, মুখে অনম্য ঝাঁকড়া দাড়ি, কালো পুরু ওষ্ঠের ওপর শক্ত গোঁফ খাটো করে ছাঁটা; চোখ দুটি ছোট, তাতে যে দৃষ্টি তাতে যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য।

তহবন-পরা লম্বা নীল কোর্তা গায়ে এই বলিষ্ঠ ব্যক্তি বিনীতভাবে আমার বিছানার এক পাশে এসে বসলেন। তাঁর বাঁ হাতে কয়েকখানি খাতা। একখানি খুলে আমার সামনে রেখে বললেন, "এক নতুন পদ্ধতিতে আমি এই বইখানি লিখেছি, মেহেরবানি করে একটু পড়ে দেখুন।" কিছু সন্দিগ্ধচিত্তে খাতাখানি হাতে তুলে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে এখানে ওখানে দেখতে লাগলাম। দুই-এক জায়গায় লেখার যে বাঁধুনি চোখে পড়লো তাতে কিছু বিস্ময় বোধ হলো। তাঁকে বললাম, "আপনি পড়ুন আমি শুনি।" তিনি পড়তে লাগলেন। প্রথম শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের কী করে মুখে মুখে বানান শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এর যে ভূমিকা তিনি পড়লেন তার কয়েকটি কথা এই, "যে পথ দুর্গম চেষ্টা করে সে পথকে সুগম করা যায়। যা জটিল তাও চেষ্টা করে আয়ত্ত করা যায়, আর তা আয়ত্ত করবার সহজ পথ নির্দেশ করা যায় : তবে কেন সরলমতি শিশুদের মনে ভীতি অথবা অরুচি উৎপাদন না করে তাদের মাতৃভাষার বর্ণবিন্যাস স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে না?" আমার আন্তরিক প্রশংসার অবধি ছিল না। মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে লক্ষ করছিলাম– সত্যান্বেষীর পক্ষে অবশ্যলভ্য যে বিজ্ঞানদৃষ্টি এই অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য লোকটির পক্ষেও তা কী অদ্ভুতভাবে সম্ভবপর হয়েছে।

পড়া শেষ হলে তাঁকে সাধুবাদ প্রদানের কার্পণ্য করতে পারলাম না। তিনি বললেন, এটি প্রকাশ করতে তিনি ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁর মতো নগণ্য ব্যক্তির আদর কি স্কুলকর্তৃপক্ষেরা করবেন। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমারও ক্ষমতা তাঁরই মতো, তবে অন্য কোনো উপায়ে যদি আমার দ্বারা কোনো কাজ হয় তা তো নিশ্চয়ই করবো।

লোকটির সঙ্গে আলাপের গাঢ়ত্ব সহজেই সম্ভবপর হলো। অতি অল্পক্ষণ কথাবার্তার পরই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের নানা ছোট ছোট কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম। সহজভাবে তিনিও সে সমস্তের উত্তর দিলেন। তিনি গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক; বহুকাল পর্যন্ত গ্রামের 'খতিব'ও ছিলেন; কোনো রকমে দিনগুজরান হয়– অর্থাৎ বাংলার মুসলমানদের হাজারকরা নয়শত নিরানব্বই জনের যে রকমে হয়। আমাদের আলাপ এগিয়ে চলল। শেষে এমন একটা জীবনের ছাপ আমার চিত্তপটে মুদ্রিত হলো যা গ্রাম্য পণ্ডিতের নয়, কবিযশঃপ্রার্থীরও নয়,– যার প্রত্যাশা এবারকার নিরুদ্দেশ-যাত্রার প্রারম্ভে স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারিনি।

পণ্ডিত সাহেব একে একে তাঁর পনেরো বৎসরের শিক্ষকতার কথা আমাকে বললেন। গ্রামের লোকেরা তাঁর প্রতি সদয় নয়। তাঁর স্কুলের ছাত্রেরা প্রায়ই বৃত্তি পায়; স্কুল-পরিদর্শকরা তাঁর খুবই প্রশংসা করেন : এ সমস্ত আর গ্রামের লোকদের চোখে সহ্য হয় না। আমি বললাম, "তা শিক্ষকতা তো আর সকলে করে না যে প্রশংসা পাবে।" তিনি বললেন, "সে চেষ্টা কি আর তারা করেনি। কিন্তু স্কুল খুলে কদিন চালাবার ক্ষমতা তাদের আছে। দুইবার খুব তোড়জোড়ে দুই স্কুল খুলেছিল। তাদের স্কুল আর কদিন চলতে পারে। ছাত্রদের পড়ানো হয় না, তারা পাস করতে পারে না, তারা পালিয়ে শেষে আবার আমার স্কুলে এসে ভর্তি হলো।" হেসে বললেন, "পেটে বিদ্যে বুদ্ধি কিছু থাকলে তো স্কুল চালাতে পারবে।"

–দিলখোলা এ হাসি, তবে এর পর্দায় বিদ্রূপের বিষ আর ব্যর্থতার প্রতিঘাত।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের প্রকৃত কারণ কিছু অনুমান করতে পারলাম। তবু বললাম, "এ তো আড়াআড়ির কথা। কী নিয়ে এঁদের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্যের সূত্রপাত যাতে তাঁরা ভিন্ন স্কুল খুলেছিলেন?" তিনি বললেন, "তারা গ্রামের মাতব্বর। তাদের দলাদলিতে আমি সায় দিইনে। আমাকে প্রকারান্তরে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলে; তা আমি দেব কেন। এই সব নিয়েই আমার সঙ্গে বিরোধ। সে বহু কথা। একবার এক মাতব্বরের ছেলে 'ইদ্দত' পার না হতেই এক বিধবাকে নিকে করতে পাগল হয়ে উঠল। মোড়ল আমাকে নিকে পড়িয়ে দিতে বললে। আমি বললাম,–'শরা'র বিরুদ্ধে কাজ আমি পারবো না। এ নিয়ে মোড়ল আমার উপর মহা খ্যাপ্পা।"

এই সবল মেরুদণ্ডসম্পন্ন আত্মাভিমানী গ্রাম্য পণ্ডিতের প্রতি এক আন্তরিক স্নেহ আর সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরে উঠছিল। একধার থেকে তিনি গ্রামবাসীদের শ্রাদ্ধ করে চলেছিলেন। "এরা লোক দেখিয়ে নামাজ পড়ে; পরের অনিষ্ট আর নিজের স্বার্থ সিদ্ধির দিকেই এদের মন; এরা নামে মাত্র মুসলমান, কাজে একদম পশু।" ইত্যাকার বচনে তাদের সবিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছিলেন। হাসিমুখে তাঁর সমস্ত কথাই শুনছিলাম, আর ভাবছিলাম, "মুকুলিত আমগাছ তার উগ্রগন্ধে কেন দশদিক আন্দোলিত করে তোলে, আর তার পাশে শেওড়া গাছ কেন শ্রীহীন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ তত্ত্বের তাৎপর্য গ্রহণ তোমার জন্য নয়।"– শেষে পণ্ডিত বললেন, "এরা যে কী শক্ত 'জাহেল' তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। কতকগুলো মেয়েও আমার কাছে কোরান শরিফ পড়ে। তারই ভিতরে একটি মেয়ে কী 'নেক-খাসলত' আর পড়াশুনায় দক্ষ হয়েছিল। কোরান শরিফ পাঠ খতম করেছিল। উর্দু 'মেফ্‌তাহুলজান্নাত' শেষ করেছিল। বাংলা নিম্ন প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিল; কিন্তু সাহিত্যে উচ্চ প্রাইমারি ক্লাসের ছাত্রেরাও তার কাছে কিছু নয়। আর কী তার হাতের লেখা! স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর বলেছিলেন, এ পর্যন্ত নিম্ন প্রাইমারির কোনো ছাত্র-ছাত্রীর লেখাই তিনি অত সুন্দর দেখেননি। এই জাহেলরা আমাকে জব্দ করবার জন্য তাকেই বিয়ে দিলে এক আকাট মূর্খের সঙ্গে।" তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে এল, মুখ ফিরিয়ে জামার আস্তিনে তিনি চোখ মুছলেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম। শেষে ধীরে ধীরে বললাম, "তা মেয়েটির বাপ-মা..." তিনি বললেন, "বেশি টাকা তারা পেলে-আর তারা কী দেখবে।"

অদূরে-বসা আমার এক ইতিহাসজ্ঞ বন্ধু আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "যাঁরা অগ্রবর্তী চিরকালই তাঁদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। পেস্টালোজ্জি যখন তাঁর নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে শিশুর শিক্ষা বিধানে অগ্রসর হলেন, অভিভাবকরা তাঁর কাছে সন্তান পাঠাতে পর্যন্ত রাজি হলেন না। রাস্তার বেওয়ারিশ ছেলেদের নিয়ে প্রথমে তাঁর নতুন ধরনের শিক্ষা চলল।"

কিন্তু হায়, এর কি কোনো সান্ত্বনা আছে! নীরবে বসে তাঁর বলিষ্ঠ বেদনামাখা চিত্তের উত্তাপ আর জ্বালা অনুভব করতে চেষ্টা করছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল বলি, "আপনার যে দুঃখ, তা বহনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত বলেই তো বাংলার মুসলমান আজ হতভাগ্য।" তা আর সাহস হলো না। কথাটা তাঁর কাছে হেঁয়ালির মতো শোনাবার সম্ভাবনাই বেশি।

সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁকে জয়ী হতে হবে, শেষে এই সব বলে তাঁকে বিদায় দিলাম। সম্মেলনের বৈঠক দুই দিনের জায়গায় তিন দিন হলো। সুখাদ্য, সু-আলাপ, গান, জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত মাঠে

বাসের রোমাঞ্চ, তেমনি চলল। কিন্তু সেদিনের সমস্ত সুখস্মৃতির পুষ্পদলের মাঝখানে কাঁচা নবীন ফলের মতো জেগে রয়েছে এই গ্রাম্য শিক্ষকের স্মৃতি। সেখানে আলাপের দিনের অবসানে রাত্রে সেই মাঠের ভিতরকার দালানে পায়চারি করতে করতে দূরে গ্রামের পানে চেয়ে ভাবছিলাম তাঁর কথা। মূঢ়, গতানুগতিক, সর্বপ্রকারে দরিদ্র, গ্রামবাসীদের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, কিছু উগ্র, আত্মাভিমানী, ন্যায়নিষ্ঠ, উন্নত জীবনের আগ্নেয় আকর্ষণে আকৃষ্ট, এই অর্ধশিক্ষিত পুরুষ। সেবারকার সাহিত্য সম্মেলনে এই ছিল আমার সব চাইতে বড় তথ্যের আবিষ্কার।

আজ পুনরায় যখন সেই স্মৃতি মনে ভেসে উঠছে তখন দেখছি, সত্য এ এক আবিষ্কার। সর্বপ্রকারে অধঃপতিত বাংলার বিশাল মুসলমান সমাজের পুঞ্জীভূত প্রাণহীনতার মাঝে হোথায় হেথায় ক্বচিৎ কখনো সত্যকার প্রাণস্পন্দনও যে অনুভব করা যায়, এ তারই আবিষ্কার। কিন্তু সেদিন ভেবে কিছু দুঃখিতই হয়েছিলাম, এই সামান্য প্রাণ-শক্তির চারপাশ ঘিরে কী বিকট মৃত্যু তার গ্রাস এ কতক্ষণ এড়িয়ে থাকতে পারবে!

আজ যখন ভাবছি, দূরে গণ্ডগ্রামে সেই পণ্ডিত নিত্য তার পারিপার্শ্বিক হীনতার সঙ্গে যুঝছে, হয়ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার জন্য সহানুভূতি হলেও দুঃখবোধ নেই। এ সত্যকার প্রাণবহ্নি,— নির্বাপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তার পরিবেষ্টনকে দহন করে চলবে।– এ দহনের বড় প্রয়োজন।

শব্দার্থ ও টীকা

পদ্মা-অভিসারী	–	পদ্মানদী অভিমুখী। পদ্মার দিকে প্রবহমান।
সাহিত্যমহারথীবৃন্দ	–	বিশিষ্ট লেখক-কবিবৃন্দ।
গেঁজে যাবে না	–	এখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না। বিফল হবে না।
তহবন-পরা	–	লুঙ্গি পরিহিত।
খতিব	–	খুতবা পাঠকারী।
হাজারকরা নয়শত নিরানব্বই	–	এক হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন (সংখ্যা)।
কবিযশঃপ্রার্থী	–	কবি খ্যাতি অর্জনের অপেক্ষায় আছেন এমন। তরুণ কবি।
পর্দায় বিদ্রূপের ... ব্যর্থতার প্রতিঘাত	–	বাইরে এক রকম আর ভেতরে অন্যরকম অর্থাৎ অপ্রাপ্তির বেদনাকে গ্রামীণ তুচ্ছতায় উপস্থাপন।
আড়াআড়ির কথা	–	ঝগড়া-বিবাদের প্রসঙ্গ।
আত্মাভিমানী	–	অহংকারী।

মুকুলিত আমগাছ...আন্দোলিত

করে	–	আম গাছে যখন মুকুল আসে তখন তার তীব্রগন্ধে চারদিক আমোদিত হয়। আম গাছের মুকুলিত অবস্থার সঙ্গে পণ্ডিত সাহেবের ভূমিকায় তুলনা করতে গিয়ে লেখক এ উপমাটি ব্যবহার করেছেন।
জাহেল	–	অজ্ঞ। মূর্খ। নির্বোধ। অশিক্ষিত ব্যক্তি।
নেক-খাসলত	–	ভালো স্বভাব। ভালো আচরণ।
মেফ্তাহুলজান্নাত	–	উর্দুভাষায় রচিত একটি ধর্মীয় গ্রন্থ।
বেওয়ারিশ	–	স্বত্বাধিকারশূন্য। অভিভাবকহীন। দাবিদার নেই এমন।
পেস্টালোজ্জি	–	জার্মান শিক্ষাতত্ত্ববিদ। পুরো নাম ইয়োহান হাইনরিখ পেস্টালোজ্জি (Johann Heinrich Pestalozzi)

পাঠ-পরিচিতি

সাহিত্যানুরাগী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে লেখক মুন্সিগঞ্জে গিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠানে। সেখানে অবস্থানকালে পরিচিত হওয়া একজন গ্রামীণ স্কুল শিক্ষকের শিক্ষাভাবনা ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু অনুভূতির স্মৃতিচারণ বর্তমান রচনাটির উপজীব্য। একজন গ্রামীণ স্কুল-শিক্ষক 'এক নতুন পদ্ধতিতে' মাতৃভাষার বর্ণবিন্যাস, বানান শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। পণ্ডিত সাহেবের রচনা ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিবেশীদের প্রতিবন্ধকতার শিকার হলেও লেখকের ভালো লেগেছিল। মানুষ কিছুটা নির্ভরতা পেলে তার হৃদয়ের সমস্ত কথা,—এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত কথাও, প্রকাশ করে ফেলে। পণ্ডিত সাহেবও তার সুদীর্ঘ পনেরো বছরের শিক্ষকতা জীবনের নানা স্মৃতি, গ্রাম্য দলাদলি, তুচ্ছতা প্রভৃতির কথা লেখককে জানালেন। বললেন অপ্রাপ্তি ও বেদনার কথা। সেকালের অধঃপতিত বাংলার বিশাল মুসলমান সমাজের পুঞ্জীভূত প্রাণহীনতার মধ্যে এক প্রাণবান পুরুষ হিসেবে পণ্ডিত সাহেবকে আবিষ্কার করলেন লেখক।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "পণ্ডিত সাহেব" গল্পের সম্মেলনটি কোথায় হয়েছিল?

ক. রাজবাড়ি খ. ঢাকা

গ. মুন্সীগঞ্জ ঘ. কলকাতা

২. "এ দহনের বড় প্রয়োজন"– কার সঙ্গে দহন বোঝানো হয়েছে?

ক. শিক্ষার খ. পারিপার্শ্বিকতার

গ. মোড়লের ঘ. শিক্ষার্থীদের

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

বন্ধুগো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
--- --- ---
প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

৩. কবিতাংশে কবির ক্ষিপ্ততা "পণ্ডিত সাহেব" গল্পের কোন চরিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?

ক. লেখকের
খ. ইতিহাসজ্ঞ বন্ধুর
গ. গ্রামের পণ্ডিতের
ঘ. ইন্সপেক্টরের

৪. কবিতাংশে বর্ণিত অবস্থা "পণ্ডিত সাহেব" গল্পের অনুরূপ, কারণ উভয় অবস্থাতেই প্রকাশিত–

i. অসহায়ের দুঃখ ও ক্ষোভ
ii. নির্যাতিত ব্যক্তির দৃঢ় সংকল্প
iii. প্রতিকূলতায় পিছিয়ে আসার অভিপ্রায়

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

আলোকায়ন বিদ্যাপীঠের শিখন-শেখানো পদ্ধতিটা একেবারেই অন্যরকম। সেখানে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত আর মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীর সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীদের জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠদানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয়। সেই সাথে মুখস্থ বিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তাই এখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা সহজেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ কারণে বিদ্যাপীঠটি এ অঞ্চলে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছে।

ক. লেখক কোন সম্মেলনে গিয়েছিলেন?

খ. পণ্ডিত সাহেবের জন্য লেখকের "সহানুভূতি হলেও দুঃখবোধ নেই"— কেন?

গ. আলোকায়ন বিদ্যাপীঠের কার্যক্রমে "পণ্ডিত সাহেব" গল্পের যে দিক ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পণ্ডিত সাহেবের জীবনদর্শন আলোকায়ন বিদ্যাপীঠের শিক্ষাদান পদ্ধতি পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ'— উক্তিটির যাথার্থ্য নিরূপণ কর।

আহ্বান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস একই জেলার ব্যারাকপুর গ্রামে। বিভূতিভূষণের বাল্য ও কৈশোরকাল কাটে অত্যন্ত দারিদ্র্যে। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯১৬ সালে আইএ – উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন। তিনি দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং এর পাশাপাশি শহর থেকে দূরে অবস্থান করে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসাধনা করেছেন। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের জীবনকে তিনি তাঁর অসাধারণ শিল্পসুষমাময় ভাষায় সাহজিক সারল্যে প্রকাশ করেছেন। মানুষকে তিনি দেখেছেন গভীর মমত্ববোধ ও নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে। তাঁর গদ্য কাব্যময় ও চিত্রাত্মক বর্ণনায় সমৃদ্ধ।

বিভূতিভূষণের কালজয়ী যুগল উপন্যাস 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– উপন্যাস : 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'আরণ্যক', 'দেবযান' ও 'ইছামতি'; গল্পগ্রন্থ : 'মেঘমল্লার', 'মৌরিফুল', 'যাত্রাবদল' ও 'কিন্নর দল'।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েছি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় আমার বাবার পুরাতন বন্ধু। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন–কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা? প্রণাম করে পায়ের ধুলা নিলাম। বললেন–এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়িঘর করবে না?

–আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই–

–তাতে কী? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কী? আমি খড় বাঁশ দিচ্ছি, চালাঘর তুলে ফেল, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো।

আরও অনেকে এসে ধরল, অন্তত খড়ের ঘর ওঠাতে হবে। অনেক দিন পরে গ্রামে এসে লাগছে ভালোই। বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা, ডান হাতে নড়ি ঠকঠক করতে করতে বোধহয় বাজারের দিকে চলেছে।

বুড়িকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

–বাজারে বাবা।

বুড়ি আমায় ভালো না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরল। বলল, কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

–চিনবে না। আমি অনেক দিন গাঁয়ে আসি নি।

–তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না। তিনি থাকতি অভাব ছিল না কোনো জিনিসের। গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু।

—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, বুড়ি?

—আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বললাম, তোমার ছেলে আছে?

—কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাত-জামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। আমার বড্ড কষ্ট। ভাত জোটে না সবদিন।

বুড়িকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

—ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা চুকল না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় সেই বুড়ি লাঠি ঠকঠক করতে করতে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি। তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী। অনেকদিন আগে মরে গিয়েছে জমির।

বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল, ও বাবা।

বোধহয় চোখে একটু কম দেখে।

বললাম, এই যে আমি এখানে।

আমার খুড়োমশায় বুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠোনের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে গেল।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার নতুন তৈরি খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়ত হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়ত।

বললাম, কী বুড়ি, ভালো আছ?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বলল, আমার কি মরণ আছে রে বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও আম কীসের।

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে আলাম। গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি, খেয়ে দেখ এখন।

বড়ো ভালো লাগল। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই। একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাই নি বাল্যকালে মা-পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে।

বুড়ি বললে, খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?

—খুড়ো মশায়ের বাড়ি।

—বেশ যত্ন করে তো ওনারা?

—তা করে।

—দুধ পাচ্চ ভালো?

—ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

—ও বাবা, ওর দুধ! অর্ধেক জল– দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝেচি।

পরদিন সকাল হয়েছে সবে, বুড়ি দেখি উঠোনে এসে ডাকছে, অ গোপাল।

বিছানা ছেড়ে উঠে বললাম, আরে এত সকালে কী মনে করে। হাতে কী?

বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি।

—সে কী! দুধ পেলে কোথায় এত সকালে?

আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ব্যাটার বউ। তারও কেউ নেই। মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েছিলাম, বলি বউ আমার, গোপাল দুধ খেতি পায় না। তাই আজ ভোরে উঠে দেখি আমারে ডাকচে, মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও।

—আচ্ছা কেন বলতো তোমার এসব! এ রকম আর কখনও এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বল। কতটা দুধ?

বুড়ি একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা, পয়সা কেন?

—পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়?

—ওই যে, বললাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ি থেকে।

—তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরিব লোক।

বুড়ি পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে দমে গিয়েছে তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারলাম। মনে একটু কষ্ট হলো বুড়ি চলে গেলে। পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি? বুড়ির কী রকম হয়ত মন পড়ে গিয়েছে আমার ওপর, স্নেহের দান– এমন করা ঠিক হয়নি। বুড়ি কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখল না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে এসে জুটবে।

—অ গোপাল, এই দুটি কচি শসার জালি মোর গাছের, এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিকিন মোর সামনে?

—বুড়ি তোমার চলে কীসে?

—ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমায় দুটো না দিয়ে খায় না।

—একা থাক?

—তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুর পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েছিলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি।

সেবার বুড়ির বাড়িতে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। নানাদিকে ব্যস্ত থাকি। অনেক দিন পরে গ্রামে এসেছি তো! যে কদিন গ্রামে থাকি বুড়ি রোজ সকালে আসতে ভুলবে না। কিছু না কিছু আনবেই। কখনো পাকা আম, কখনো পাতি লেবু, কখনো বা একছড়া কাঁচকলা কি এক-ফালি কুমড়ো।

পুনরায় গ্রামে এলাম পাঁচ–ছয় মাস পরে, আশ্বিন মাসের শেষে। কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে; বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ির সঙ্গে দেখেছিলাম সেই মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বললে, বাবু কবে এসেছেন?

—দিন পাঁচ-ছয় হলো। কেন?

—আমার সেই মা পেটিয়ে দিলে, বলে দেখে এসো গিয়ে।

—কে?

—ওই সেই বুড়ি– এখানে যিনি আসত। তেনার বড্ড অসুখ। এবার বোধহয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে– অস্থির, আমারে রোজ শুধায়। একবার দেখে আসুন গিয়ে, বড্ড খুশি হবে তাহলি।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুয়ে আছে একটা মাদুরের ওপর, মাথায় মলিন বালিশ। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ মেলে আমার দিকে চাইল। পরে আমাকে চিনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতেই আমি বললাম, উঠো না, ও কী?

বুড়ি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, ভালো আছ অ মোর গোপাল? বসতে দে গোপালকে। বসতে দে।

—বসবার দরকার নেই, থাক।

—গোপালেরে ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে।

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মতো অনুযোগের সুরে বলতে লাগল, তোর জন্যি খাজুরের চাটাইখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরনো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তুই একদিনও এলি না গোপাল। অসুখ হয়েছে তাও দেখতে এলি না।

বুড়ির দুচোখ বেয়ে জল বেয়ে পড়ছে গড়িয়ে। আমায় বলল, গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস।

আসবার সময় বুড়ির পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্য। হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না।

বুড়ি কিন্তু সে যাত্রা সেরে উঠল।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি। বোধহয় দেড় বছরও হতে পারে। একবার শরতের ছুটির পর তখনও দুইদিন ছুটি হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুইদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলে? সে বুড়ি যে কাল রাতে মারা গিয়েছে। তোমার নাম করলো বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল।

আমি এসেছি শুনে বুড়ির নাতজামাই দেখা করতে এল। আমার মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল সেই একদিন– আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহু দূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে। আমার মন হয়ত ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।

কাপড় কেনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল, মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন।

শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাল-লতা দোলানো একটা প্রাচীন তিত্তিরাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল, শুকুর মিয়া, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়ত আবেদালি, তার ছেলে গনি। এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে।

প্রবীণ শুকুর মিয়া আমায় দেখে বলল, এই যে বাবা, এসো। বুড়ির মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালোবাসত বুড়ি।

দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়ছে। কবর দেওয়ার পর সকলে এক এক কোদাল মাটি দিল কবরের উপর। শুকুর মিয়া বলল, দ্যাও বাবা– তুমিও দ্যাও।

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত,– অ মোর গোপাল।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

চক্কোত্তী	–	‘চক্রবর্তী’ উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ। পূজারী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।
নড়ি	–	লাঠি।
অন্ধের নড়ি	–	অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।
গোলাপোরা	–	গোলাভরা।
গেয়ালপোরা	–	গোয়ালভরা।
করাতের কাজ	–	কাঠ চেরাই করার পেশা।
করাতি	–	করাত দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে যে।
দাওয়া	–	রোয়াক। বারান্দা।

পাঠ-পরিচিতি

“আহ্বান” গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প। মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই গড়ে ওঠে। ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্য, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যে দূরত্ব সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে গড়ে ওঠে তাও ঘুচে যেতে পারে– নিবিড় স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে। দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনধারার প্রতিফলনও এই গল্পের অন্যতম উপজীব্য। এ গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে-ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গ্রামীণ লোকায়ত প্রান্তিক জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে যে অনেকটা মুক্ত সে-সত্যও এ গল্পে উন্মোচিত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “আহ্বান” গল্পে কথকের সহপাঠী কে ছিলেন?

ক. আবদুল　　খ. আবেদালি

গ. শুকুর মিয়া　　ঘ. নসর

২. বুড়ি কেন বারবার গোপালের কাছে যেতেন?

ক. পয়সা পাওয়ার লোভে　　খ. স্নেহ ভালোবাসার টানে

গ. নিঃসঙ্গতা দুর করতে　　ঘ. অতিথি পরায়ন বলে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

অকালে বিধবা হয়ে প্রতিমা আজ থেকে ৩০ বছর আগে এসেছিলেন সুদীপ্তদের বাড়িতে, সুদীপ্তর বয়স তখন তিন মাস। ব্যস্ত চিকিৎসক বাবা-মার অনুপস্থিতিতে প্রতিমার কাছেই সুদীপ্ত বেড়ে উঠে। আজ সুদীপ্তও একজন চিকিৎসক। উচ্চশিক্ষার জন্য সে আমেরিকা চলে যাবে শুনে প্রতিমা তাকে বলেন– বাবা, যেখানে থাকিস আমার মৃত্যুর পর তুই মুখাগ্নি করতে আসিস।

৩. সুদীপ্ত "আহ্বান" গল্পের কোন চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. আব্দুলের খ. জমির করাতির

গ. আবেদালির ঘ. কথকের

৪. প্রতিমা ও গল্পের বুড়ি চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে–

i. স্নেহ

ii. নির্ভরতা

iii. দায়িত্ববোধ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন দিন মজুর কেরামত। হঠাৎ দেখতে পান মৃতপ্রায় একটি শিশু পথের ধারে পড়ে আছে। পরম যত্নে তিনি শিশুটিকে ঘরে তুলে আনেন । নিজের ছেলে-মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসারে স্ত্রী প্রথমে খানিকটা আপত্তি করলেও শিশুটির অবস্থা দেখে তিনিও বুকে জড়িয়ে ধরেন– বড় করতে থাকেন নিজের সন্তান পরিচয়ে।

ক. বুড়িকে মা বলে ডাকত কে?

খ. "স্নেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি"– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কেরামত দম্পতির মধ্য দিয়ে "আহ্বান" গল্পের কোন বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উক্ত বিশেষ দিকটিই অনুচ্ছেদ ও "আহ্বান" গল্পের মূল উপজীব্য'– বিশ্লেষণ কর।

ভুলের মূল্য
কাজী মোতাহার হোসেন

লেখক-পরিচিতি

কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০এ জুলাই কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার লক্ষ্মীপুরে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তর ফরিদপুরের রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কাজী গওহর উদ্দীন আহমদ, মায়ের নাম তসিরুন্নেসা। পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র মোতাহার হোসেন কর্মজীবনে অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৫ সালে 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে ভূষিত হওয়া প্রথম তিনজনের অন্যতম ছিলেন তিনি। বিশ ও ত্রিশের দশকে ঢাকায় 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে পরিচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক এবং ওই আন্দোলনের মুখপত্র বিখ্যাত 'শিখা' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। মননশীল লেখক কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তিনি বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি নিয়ে অনেক তথ্যসমৃদ্ধ মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- প্রবন্ধ সংকলন : 'সঞ্চয়ন' ও 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'; সমালোচনাগ্রন্থ : 'নজরুল কাব্য পরিচিতি'; পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ : 'গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস', 'আলোক বিজ্ঞান' ইত্যাদি। যুক্তিশীলতা ও স্বচ্ছতা কাজী মোতাহার হোসেনের গদ্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

চিন্তা-ভাবনা এবং কার্যকলাপে ভুল করা মানুষের পক্ষে শুধু যে স্বাভাবিক তাই নয়, অপরিহার্যও বটে। স্বাভাবিক এইজন্য যে মানুষ বড় দুর্বল, সর্বদা নানা ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে পারে না। অপরিহার্য এইজন্য যে তার জ্ঞান অতি সংকীর্ণ, —কোনটি ভুল, কোনটি নির্ভুল তা নির্ধারণ করাই অনেক সময় কঠিন, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখানে কেবল যে দুর্বলচেতা ও স্বল্পজ্ঞান মানুষের কথা বলছি তা নয়। এ মন্তব্য সবল-দুর্বল এবং অজ্ঞ-বিজ্ঞ-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই খাটে।

প্রতারক, দস্যু, মাতাল, ঘোড়দৌড়ের খেলোয়াড় প্রত্যেকেই জানে যে তার কাজ ঠিক হচ্ছে না—সে ভুল পথে চলেছে। কিন্তু সে পথ হতে ফিরবার ক্ষমতা তার কোথায়? তার বিবেক হয়ত দংশন করছে, কিন্তু প্রবৃত্তি বশ মানছে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিবেক-বুদ্ধিই শিথিল অথবা শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। অন্য কথায়, সে নিজের কাজের সমর্থক যুক্তি বের করে বিবেকের উগ্রতাকে প্রশমিত করে নিচ্ছে। প্রবৃত্তির হাতে বিবেকের এই নিগ্রহই মানুষের দুর্বলতার প্রধান পরিচয়। তাছাড়া মানুষ এমন সব ঘটনার ঘূর্ণিপাকে পড়ে যায় যে, তাকে বাধ্য হয়ে খেলার পুতুলের মতো নিরুপায়ভাবে একটার পর আর একটা ভুল করে যেতে হয়, একটা ভুল ঢাকতে গিয়ে আরও দশটার আশ্রয় নিতে হয়।

মানুষ বড় জটিল জীব। তাকে দশ দিক বজায় রেখে কাজ করতে হয়। আবার পৃথিবীও এমন কঠিন ঠাঁই যে, অনেক সময় এক কূল বজায় রাখতে গেলে আর-এক কূলে ভাঙন লাগে। জীবনে এইগুলোই সবচেয়ে বড় সমস্যা, এইখানেই ভুল হয় বেশি। আবার এখানেই মানুষের বিশেষত্বও ফুটে ওঠে অপূর্বভাবে। এইরূপ নানা বিচিত্র ঘটনাবর্তের ভেতর দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা দিতে দিতে যেতে হয় বলেই তার শ্রেষ্ঠত্ব, আর এই আত্ম-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবার মধ্যেই তার সৌন্দর্যের বিকাশ এবং যোগ্যতার পরিচয়।

পূর্বেই বলেছি, মানুষের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ। ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন জ্ঞানভাণ্ডার খুলে যাচ্ছে, আর পুরনো জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন, রাজনীতি, ধর্মনীতি, ব্যবহারিক জ্ঞান, কলা-বিদ্যা প্রভৃতি সমুদয় ক্ষেত্রেই এর এত অধিক দৃষ্টান্ত বর্তমান যে, তার উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। এর থেকে বোঝা যায়, আজ যেটি সত্য এবং নির্ভুল মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেটি হয়ত মিথ্যা অথবা আংশিক সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। এজন্য আমরা আজকাল যে আদর্শ ধরে চলছি, তা নিয়ে অতিরিক্ত উল্লাসের সাথে আস্ফালন করতে পারিনে—যেহেতু, আমাদের আজকার উদ্ধত অহংকার কালকার দীন লজ্জায় পরিণত হতে পারে।

মানুষের প্রকৃত যে জ্ঞান, তা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই আসে। শিশুকে আগুনের শিখা, ছুরির ধার, মরিচের ঝাল, এসব থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। যদি তা পারা যেত, তবে বোধ হয়, সে চিরকাল

শিশুই থাকত। শিশুর পক্ষে যা, পরিণত মানুষের পক্ষেও কতকটা তাই সত্য। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যেখানে অভাব, সেখানে সমস্ত জ্ঞানই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যে কোনো দিন পথ ভোলার কষ্ট ভোগ করে নাই, সে কখনো ঠিক পথে চলার আনন্দ উপভোগ করতে পারে না; যে কোনো দিন পানিতে পড়ে হাবুডুবু না খেয়েছে, সে কখনো নিরাপদে নৌকায় চড়ার সুখ ভালো করে বুঝতে পারে না।

মানুষ ভুল করে, পরে সেই ভুল সংশোধন করেই সত্যের সন্ধান পায়। সাধারণের ধারণা, 'ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখাই' বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' বলেও একটা কথা আছে। নিরুদ্বেগ আপদহীনতার ভেতরেই অনেক সময়ে বিপদের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। আসল কথা, জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতিলব্ধ যে জ্ঞান ও শিক্ষা, বাস্তবিকই তার তুলনা নাই। স্বল্প পরিসর টবের ভেতরে জীবন ধারণ করার চেয়ে, বাইরের বিস্তৃতির ভেতরে আনন্দে বিকশিত হওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে অন্যের দুর্দশা দেখেও অবশ্য শিক্ষা লাভ করতে হবে। কারণ একজনের পক্ষে সকল রকম অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। আমাদের এই বর্তমান– কোটি কোটি অভিজ্ঞতারই ফল, সুতরাং জীবন-যাত্রায় অন্যের অভিজ্ঞতারও যে প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। অন্যের নিকট থেকে পাওয়া অসম্পূর্ণ বা অপরীক্ষিত জ্ঞানকে নিজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচাই করে নিজস্ব করে নিতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিপুষ্ট জীবনের এই-ই ধারা।

মানুষ এইরকম ভুলের ওপর চরণ ফেলে ফেলে সত্যকে খুঁজে পাচ্ছে এবং এভাবেই ক্রমশ অগ্রসর হয়ে চলেছে। ভুল না করলে যেন সত্যের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না,– এ যেন আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা। যেমন একটা ফুলকে নানাভাবে চারদিক থেকে দেখলে তার নতুন নতুন সৌন্দর্য চোখে পড়ে, এরূপ সত্যকেও নানা ঘটনার ভেতরে দিয়ে নানাভাবে পরখ করে দেখতে হয়; তবেই তার সমগ্র রূপ ধরা পড়ে। কোনো বৃহৎ সত্যই এ পর্যন্ত সমগ্রভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে কিনা সন্দেহ। তবে যে-সত্যের যত বেশি ব্যতিক্রম আমাদের চোখে পড়েছে, তা আমরা ততই ভালো করে বুঝতে পেরেছি।

দুঃখ যত প্রবলভাবে মানুষের মনে আঘাত করে, সুখ ততটা করে না। সুখকে কোনো কোনো লোকে যত নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করতে পারে, চেষ্টা করলেও দুঃখকে তত সহজে মনের গোপনে লুকিয়ে রাখতে পারে না। এজন্য জীবনে দুঃখের মূল্য বড় বেশি। আগে দুঃখ পেতে হবে, তবেই সমস্ত অনুভূতি সজাগ ও তীক্ষ্ণ হবে। ভুল করে যে দুঃখ পায়, তাহার ভুল করা সার্থক। আর ভুল করলেও যে নির্বিকার,– আত্ম-বিচার যার নাই– তার কাছে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, অর্থশূন্য শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ভুলের সবচেয়ে বড় সার্থকতা এখানে যে, ভুল মানুষকে দুঃখ ও অনুশোচনার আগুনে পুড়িয়ে তাকে বিশুদ্ধ করে তোলে এবং মনুষ্যত্ব-সাধনের দিকে অনেক দূর অগ্রসর করে দেয়।

ভুল সম্বন্ধে আর-একটা বড় কথা, এই যে ভুল না করলে বুঝি-বা লোকে প্রেমময় হতে পারে না। তার কারণ, প্রেমের মূল উৎস হচ্ছে সহানুভূতি। নিজের ভুল করে যার অহংকার চূর্ণ হয়নি, সে মুখে যতই বলুক না কেন তার ব্যবহারের মধ্যে প্রায়ই প্রচ্ছন্নভাবে একটা আত্মম্ভরিতা এবং অন্যের প্রতি উপেক্ষা বা কৃপার ভাব থেকে যায়। আমার মনে হয়, এজন্য গোঁড়া নীতিবাগীশের দল অন্যের প্রতি অতি কঠোর বিচারের প্রয়োগ করেন এবং এ কারণেই তাঁরা রীতিমতো সামাজিক হতে পারেন না। কিন্তু যখন বিচারের সেই নিষ্ঠুর মাপকাঠি দিয়ে নিজের (বা প্রিয়াস্পদের) জীবন যাচাই করে দেখবার সময় আসে, তখনই প্রথম চোখে পড়ে, ভুল করা কত স্বাভাবিক, কত অবশ্যম্ভাবী। তখন তার দৃষ্টি বদলে যায়, করুণায় প্রাণ-মন ভরে ওঠে; তখন তার কল্পনার মোহ ভেঙে যায়। তখনই সে প্রথম বুঝতে পারে, সে রক্তমাংসের মানুষ। আত্মকৃত ভুল মানুষকে ঘৃণা থেকে নিবৃত্ত করে, প্রেমময় হতে শেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা বোধ জন্মায়। একথা শুনতে অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু এ সত্য। ভুলের মতো একটা সাধারণ ব্যাপার, যা অহরহ ঘটছে, তাই আবার মানুষের এতখানি কাজে লাগে, এটি বিশ্বের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সত্যোদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টার চেয়েও বোধ হয় ভুলের এই কার্যকারিতা বেশি কল্যাণপ্রসূ হয়েছে।

বাস্তবিক, ভুল আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর। ভুল না থাকলে পৃথিবীর দয়া, মায়া, ক্ষমা, ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল গুণগুলির এত অবকাশ ও বিকাশ হতো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভুল না থাকলে এত দিন মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি কবে রুদ্ধ হয়ে সমস্ত অসাড় নিস্পন্দ হয়ে যেত। এখানেই ভুলের মূল্য।

শব্দার্থ ও টীকা

পারিপার্শ্বিক	–	চতুর্দিকস্থ। পার্শ্ববর্তী।
দুর্বলচেতা	–	দুর্বল চিত্ত এমন।
অজ্ঞ-বিজ্ঞ-নির্বিশেষে	–	মূর্খ-জ্ঞানী সকলেই।
বিবেক	–	মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি; যার দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, ধর্মাধর্ম বিচার করা যায়। ন্যায়-অন্যায় বোধ।
প্রবৃত্তি	–	স্পৃহা। আকাঙ্ক্ষা। ইচ্ছা।
উগ্রতাকে প্রশমিত	–	রূঢ়তা বা তীব্রতাকে শান্ত বা নিবারণ করা।
ঘূর্ণিপাক	–	বায়ু বা পানির প্রচণ্ড আবর্ত।
ঘটনাবর্ত	–	ঘটনার আবর্ত। ঘটনাবলি।
‘অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি’	–	একটি প্রবাদ বাক্য। অতি চালাকের মন্দ পরিণতি বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়।
পরিপুষ্ট	–	অতিশয় পুষ্ট। সুপুষ্ট।
নিস্পৃহভাবে	–	স্পৃহাহীনভাবে। কামনা-বাসনাহীনভাবে।
আত্মম্ভরিতা	–	অহংকার। দম্ভ।
গোঁড়া	–	ধর্মমতে অন্ধবিশ্বাসী ও একগুঁয়ে। অন্ধভক্ত।
নীতিবাগীশ	–	নীতি-নিষ্ঠা সম্পর্কে দাম্ভিক।
প্রিয়াস্পদ	–	প্রিয়ভাজন। প্রিয়পাত্র।
আত্মকৃত	–	নিজে সম্পাদিত। নিজের করা যা।
নিবৃত্ত	–	বিরত। ক্ষান্ত।
সত্যোদ্‌ঘাটন	–	সত্য + উদ্‌ঘাটন = সত্যোদ্‌ঘাটন। প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করা।
কল্যাণপ্রসূ	–	কল্যাণ বা শুভকর এমন।

পাঠ-পরিচিতি

কাজী মোতাহার হোসেন রচিত “ভুলের মূল্য” প্রবন্ধটি তাঁর রচনাবলির ১ম খণ্ড (১৯৮৪) থেকে সংকলিত। এই প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনে ভুলের গুরুত্ব বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। মানবজাতির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা সাফল্য লাভ। সেই পথ-পরিক্রমায় কর্ম ও চিন্তায় অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলেই কমবেশি ভুল করে থাকে। অনেক সময় প্রবৃত্তির তাড়নায়ও মানুষ ভুল পথে হাঁটে। লেখকের মতে, ভুল মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পৃথিবীর বিচিত্র ঘটনাবর্ত অতিক্রমণে যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়াই মানুষের বিশেষত্ব। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষ সত্যে পৌঁছে। আত্মকৃত ভুলের শিক্ষা মানুষকে দুঃখ ও অনুশোচনার আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করে। মানুষকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও প্রেমময় করে তোলে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভুলের কার্যকারিতা সত্যোদ্‌ঘাটনের শক্তির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে লেখকের কাছে মনে হয়েছে, ভুলই পৃথিবীর অগ্রযাত্রার অন্যতম চালিকা শক্তি। এ রচনায় লেখক জীবনের এক ধরনের দর্শনকেই যেন ব্যক্ত করেছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের প্রকৃত জ্ঞান আসে কিসের মাধ্যমে?

ক. পড়াশোনার খ. শিক্ষাগুরুর

গ. অভিজ্ঞতার ঘ. ভ্রমণের

২. ভুল না করলে যেন সত্যের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না। কারণ–

ক. মানুষের স্বভাব ভুল করা খ. সত্যের পূর্বশর্ত হলো ভুল করা

গ. ভুল মানুষকে পরিশুদ্ধি দান করে ঘ. ভুলের মাধ্যমে মানুষ সত্যের সন্ধান পায়

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাপে পুণ্যে সুখে দুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

৩. পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের বক্তব্য "ভুলের মূল্য" প্রবন্ধের যে যে বাক্যকে সমর্থন করে তা হলো–

i. ভুল না করলে সত্যের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না

ii. অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান আসে

iii. ভুল আছে বলে পৃথিবীটা এত সুন্দর

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে শিক্ষণীয় বিষয় কোনটি?

ক. জীবনে পদে পদে ভুল করা খ. ভুল থেকে সংশোধিত হওয়া

গ. মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ঘ. ঠেকে না শিখে দেখে শেখা

সৃজনশীল প্রশ্ন

i. নাসির সাহেবের স্ত্রী সবকিছুতে শুরুতেই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। ছেলে-মেয়েদের কোনো ভুল তিনি সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। ফলে, তিনি যেমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, তেমনি সন্তানেরাও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে।

ii. অফিস থেকে ফিরে নাসির সাহেব দেখলেন, তার স্ত্রী সন্তানদের বকাবকি করছেন– নিশ্চয়ই তারা কোনো ভুল করেছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন– ভুল করা খুব স্বাভাবিক বিষয়, একটি ভুল মানুষকে শত ভুল না করার শিক্ষা দেয়। ভুল করা ছাড়া মানুষ পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারেন না, আর ভুল আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর।

ক. ভালোবাসা বা প্রেমের মূল উৎস কী?

খ. লেখক ভুলকে একই সাথে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য বলেছেন কেন?

গ. অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে "ভুলের মূল্য" প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নাসির সাহেবের স্ত্রীর মানসিকতা পরিবর্তনে "ভুলের মূল্য" প্রবন্ধের বক্তব্য কতটুকু কার্যকর বলে তুমি মনে কর। মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

তাজমহল

বনফুল

লেখক-পরিচিতি

বনফুল ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই বিহারের পূর্ণিয়ার মণিহারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস হুগলির শিয়াখালায়। সাহিত্য জগতে 'বনফুল' ছদ্মনামে খ্যাত ছোটগল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও কবির আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পেশায় ডাক্তার এই লেখক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করলেও তাঁর স্বচ্ছন্দ দক্ষতার অসাধারণ পরিচয় রয়েছে ছোটগল্পে। সেখানে উঠে এসেছে বিচিত্র সব মানুষের জীবনছবি, যাঁদের সান্নিধ্য তিনি পেয়েছেন পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর রচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জঙ্গম', 'স্থাবর', 'হাটে বাজারে', 'ভুবন সোম', 'গল্প সংগ্রহ', 'কিছুক্ষণ', 'রাত্রি', 'ডানা' ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'শ্রীমধুসূদন' নাটক তাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা। তাঁর বেশকিছু উপন্যাস ও গল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি পেয়েছেন। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার', 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'সহ বহু পদক ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

বনফুল ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেন তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌঁছায়নি। একজন সহযাত্রী বলে উঠলেন– ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে–

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দমে গেলাম। চুনকাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো– ওই তাজমহল! তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শাহজাহানের তাজমহল। ... অবসন্ন আপরাহ্নে বন্দি শাহজাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল। ... আলমগীর নির্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি ... মহাসমারোহে মিছিল চলেছে ... সম্রাট শাহজাহান চলছেন প্রিয়া সন্নিধানে? আর বিচ্ছেদ সইল না ... শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে ... ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল ... হয়ত এখনও আছে ... ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর ...

চুনকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠেনি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এলো। ঝাউ-বীথি থেকে নয়– মনে হলো যেন সুদূর অতীত থেকে; মর্মর-ধ্বনি নয়, যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মতো স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগলো অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হলো– সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠলো যেন সহসা বিস্মিত চেতনা-পটে। চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজ-রাজেশ্বরী শাহজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেক দিন কেটেছে।

কোন কনট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন হোটেল-ওয়ালা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওয়ালাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেত রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কি ভীষণ ভাড়া নেয়– এ সব খবরও পুরোনো হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, উষায়, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে আর চোখে লাগে না। চোখে পড়েই না। ... পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু– গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে।

সেদিন 'আউট ডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকলো। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে বেচারির। ভাবলাম কোনও মেওয়াওয়ালা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম, ঝুড়ির ভেতর– মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে– নিজের বেগমকে পিঠে করে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে। নিতান্ত গরিব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে–

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম অরিস! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে করে বয়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ। অন্যান্য রোগী আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউন্ডার, ড্রেসর, এমনকি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজি হলো না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা করে চলেছে। সকলের আপত্তি দেখে সরাতে হলো বারান্দা থেকে। হাসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেকশান দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠক ঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম– "হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চল আপাতত।" বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে– "এর বাঁচবার কোনও আশা আছে হুজুর?"

সত্যি কথা বলতে হলো– 'না।'

বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে– সেদিনও কল থেকে ফিরছি– একটা মাঠের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কী যেন করছে বসে বসে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কী করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতগুলো ভাঙা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কী যেন গাঁথছে।

"কী হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব–"

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

"বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।"

"কবর?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

চুপ করে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম– "তুমি থাক কোথায়?"

"আগ্রার আশে-পাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব-গরবয়।"

"দেখিনি তো কখনও তোমাকে। কী নাম তোমার?"

"ফকির শাজাহান।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

অলিন্দ	– চাতাল। বারান্দা।
দারা সেকো	– দিল্লির সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আওরঙ্গজেব তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দি ও হত্যা করেন। তিনি উদার-হৃদয় ও বিনয়ী ছিলেন। পারস্য ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তিনি।
তমিস্রা	– অন্ধকার। অন্ধকার রাত।
মিনারেট	– মিনারসদৃশ উঁচু স্তম্ভ। Minaret।
গম্বুজ	– গোলাকার ছুঁচালো ছাদ।
গড়গড়া	– ছোট এক রকমের আলবোলা। মাটিতে রাখা হয় এমন লম্বা নলযুক্ত হুঁকো।
টাঙা	– দুই চাকাওয়ালা এক ধরনের ঘোড়ার গাড়ি।
মেওয়াওয়ালা	– ফলবিক্রেতা।
আলখাল্লা	– পা পর্যন্ত লম্বা এক রকম ঢিলা জামা।
চোস্ত	– নিপুণ। ত্রুটিহীন।
ক্যাংক্রাম অরিস	– গলিত মুখক্ষত। Cancrum oris।
ড্রেসার	– ক্ষতস্থান শুশ্রূষাকারী। Dresser।
গরিব-গরবয়	– গরিব-গুর্বা। দীন-দরিদ্র।

পাঠ-পরিচিতি

বনফুলের "তাজমহল" গল্পটি তাঁর 'অদৃশ্যলোকে' গল্প-সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গল্পে অবিস্মরণীয় মহিমা পেয়েছে সমাজের নিচুতলার মানুষ ফকির শাজাহানের পত্নীপ্রেম। সে সম্রাট শাহজাহানের মতো তাজমহল নির্মাণ করতে না পারলেও ইট-বালি দিয়ে নিজের মতো করে মৃত বেগমের কবর গড়েছে।

কাহিনি, ঘটনা ও চরিত্র রূপায়ণের দিক থেকে "তাজমহল" গল্পটি বিস্তৃত পরিসরের নয়। খুব সংহত শিল্প বিন্যাসই এ গল্পের বৈশিষ্ট্য। বনফুল তাঁর অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পেও অত্যন্ত সচেতনভাবে মিতবাক। এ গল্পের শেষ দুটি বাক্য না পড়লে গল্পের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য ধরা পড়ে না। অদ্ভুত চমকের ভেতর দিয়ে সেখানে প্রকাশিত হয় এক গভীর জীবনসত্য। এখানে মানবিক অনুভূতির বাস্তব চিত্রের প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে লেখক যুগযুগ ধরে গড়ে ওঠা মানবিক সম্পর্ককে মহিমান্বিত করেছেন। এ গল্পে লেখক নিরপেক্ষ দর্শকের মতো ঘটনা সাজিয়েছেন নিরাসক্ত বর্ণনায়। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত হওয়ায় কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র কোনো কিছু সম্পর্কেই লেখক কোনো মন্তব্য ও বিশ্লেষণ যোগ করেননি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বর্ণনা ও সংলাপের বাইরে নেই কোনো বাহুল্য। সবচেয়ে বড় কথা, এ গল্পে যে জীবনসত্য ফুটে উঠেছে তা গল্পকার পাঠককে সরাসরি বলেননি। গল্প তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায়ই পাঠককে দিয়ে তা উপলব্ধি করিয়ে নেয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাজমহল কোথায় অবস্থিত?

ক. দিল্লি খ. আগ্রা

গ. মাদ্রাজ ঘ. মুম্বাই

২. তাজমহল সম্বন্ধে লেখকের মোহ নেই কেন?

ক. সৌন্দর্যের প্রতি নির্মোহ খ. মোঘলদের প্রতি বিরূপতা

গ. একাধিকবার দর্শন ঘ. তাজমহরের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ
তাই নিয়ে প্রভু পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।

৩. কবিতাংশে "তাজমহল" গল্পের যে বিশেষ দিকটি প্রতিভাত হয়েছে তা হলো–

i. প্রিয়জনের প্রতি গভীর ভালোবাসা

ii. পরহিতব্রতে আত্মলীনতা

iii. আর্ত-পীড়িতের সুস্থতা কামনা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বিবৃতির বৈশিষ্ট্য "তাজমহল" গল্পে কার মধ্যে বিদ্যমান?

ক. লেখকের খ. বৃদ্ধের

গ. ড্রেসরের ঘ. মেথরের

সৃজনশীল প্রশ্ন

i. মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন আবির হাসান যখন কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন তার উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ ছিল না। তাদের গাড়ি চট্টগ্রাম অভিমুখে যাওয়ার সময় আবির গাড়ির জানালায় মুখ বাড়িয়েছিলেন কখন পাহাড় আর সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য তার চোখ জুড়াবে। আজ কর্মসূত্রে কক্সবাজারে আছেন ডা. আবির। অথচ সমুদ্রের তীরে যাওয়া হয়ে ওঠে না তার, উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দেখা হয় না সূর্যাস্ত।

ii. অফিসরুমে বসেই অলস সময় কাটাচ্ছিলেন ডা. আবির। একজন বৃদ্ধা এলেন তাঁর সাথে দেখা করতে। আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলেন যে, তিনি অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর নামে গড়েছেন হাসপাতাল ও এতিমখানা। চালু করেছেন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এমন দৃষ্টান্ত আবির হাসানকে মুগ্ধ করে।

ক. সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কী?

খ. "মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম"– কেন?

গ. প্রথম অনুচ্ছেদে "তাজমহল" গল্পের যে দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে– তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বৃদ্ধা, মোগল সম্রাট শাহজাহান ও "তাজমহল" গল্পের মুসলমান বৃদ্ধ যেন একসূত্রে গাঁথা – বিশ্লেষণ কর।

আমার পথ
কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫এ মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন।

সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহস নিয়ে নজরুল আমৃত্যু সকল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার, প্রতিবাদী। এজন্য বাংলা সাহিত্যের 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। আবার একই সঙ্গে কোমল দরদি মন নিয়ে ব্যথিত বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকেছেন তিনি। এক হাতে বাঁশি আরেক হাতে রণতূর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল; আর এসেই প্রচলিত শিল্পধারাসমূহকে পাল্টে দিয়ে নতুন বিষয় ও নতুন শব্দে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে করেছেন সমৃদ্ধতর। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া নজরুলের কর্মজীবনও ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। মসজিদের ইমামতি, লেটোর দলে যোগদান, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান, সাম্যবাদী ধারার রাজনীতি, পত্রিকা সম্পাদনা কিংবা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়াসহ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন ছিল পূর্ণ। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এই ঋদ্ধ ও সম্ভাবনাময় জীবন আমৃত্যু নির্বাক হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে নাগরিকত্ব এবং জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে অসুস্থ নজরুলকে সসম্মানে এদেশে বরণ করে নেওয়া হয়। এর কিছুকাল পরে কবির মৃত্যু হলে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়। কবি হলেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যু-ক্ষুধা', 'কুহেলিকা' এবং গল্পগ্রন্থের মধ্যে 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'শিউলিমালা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'যুগ-বাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'রুদ্র-মঙ্গল', 'রাজবন্দির জবানবন্দি' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ আগস্ট (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি– নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়। রাজভয়– লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না– অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে, নিজকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহংকার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদি এটাকে কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো– অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নিচু করে আনে। ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন।

স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, "আমি আছি" এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম "গান্ধীজি আছেন"। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার দম্ভ– আর যাই হোক ভণ্ডামি নয়। এ-দম্ভ শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার'-ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জনা! আমার এমন গুরু কেউ নেই, যার খাতিরে সে আগুন-সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে। আমি সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য বলে মেনে নেব না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ আমি কোনো দিনই করব না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিভাতে পারবে। তাছাড়া কেউ নিভাতে পারবে না।

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।
[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

শব্দার্থ ও টীকা

কর্ণধার	–	নেতৃত্ব প্রদানের সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তি।
কুর্নিশ	–	অভিবাদন। সম্মান প্রদর্শন।
অভিশাপ-রথের সারথি	–	সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে।
মেকি	–	মিথ্যা। কপট।
সম্মার্জনা	–	ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা।
আগুনের ঝান্ডা	–	অগ্নিপতাকা। আগুনে সব শুদ্ধ করে নিয়ে সত্যের পথে ওড়ানো নিশান।

পাঠ-পরিচিতি

প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত হয়েছে। "আমার পথ" প্রবন্ধে নজরুল এমন এক 'আমি'র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ; সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক অসংকোচ। তাঁর এই 'আমি'-ভাবনা বিন্দুতে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস জাগায়। নজরুল প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক 'আমি'র সীমায় ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন; একইসঙ্গে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে 'আমরা' হয়ে উঠতে চেয়েছেন। স্বনির্ধারিত এই জীবন-সংকল্পকে তিনি তাঁর মতো আরও যারা সত্যপথের পথিক হতে আগ্রহী তাদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দিতে চান। এই সত্যের উপলব্ধি কবির প্রাণপ্রাচুর্যের উৎসবিন্দু। তিনি তাই অনায়াসে বলতে পারেন, 'আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।' রুদ্র-তেজে মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আলোয় নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে নজরুলের এই 'আমি' সত্তা। তাঁর পথনির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করে না। সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। নজরুলের কাছে এই ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের গ্লানি গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে তিনি প্রয়োজনে দাম্ভিক হতে চান; কেননা তাঁর বিশ্বাস– সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের পক্ষেই কেবল অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

নজরুল এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, তিনি ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু ভণ্ডামি করতে প্রস্তুত নন। ভুল জেনেও তাকে ঠিক বলে চালিয়ে দেবার কপটতা কিংবা জেদ তাঁর দৃষ্টিতে ভণ্ডামি। এই ভুল ব্যক্তির হতে পারে, সমাজের হতে পারে কিংবা হতে পারে কোনো প্রকার বিশ্বাসের। তবে তা যারই হোক আর যেমনই হোক এর থেকে বেরিয়ে আসাই নজরুলের একান্ত প্রত্যাশা। তিনি জানেন, এই বেরিয়ে আসা সম্ভব হলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের সম্মিলন ঘটানো সম্ভব হবে। মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত হতে পারলেই ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে, এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। সম্ভব হবে গোটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা; আর এই ঐক্যের মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি। এই সম্প্রীতির বন্ধন শক্তিশালী হলে মানুষের মধ্যে সহনশীলতা বাড়ে। ভিন্ন ধর্ম-মত-পথের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে। আর এই সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট মানব সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলাম কোনটিকে নমস্কার জানিয়েছেন?

ক. তারুণ্যকে খ. সত্যকে

গ. রাজভয়কে ঘ.লোকভয়কে

২. ভুলের মধ্য দিয়ে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়?

ক. বার বার ভুল করে খ. ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে

গ. ভুল চেপে রেখে ঘ. ভুল স্বীকার করে

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

৩. "আমার পথ" প্রবন্ধের যে যে বাক্য কবিতাংশের বক্তব্যটির প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো–

i. আমার পথ দেখাবে সত্য

ii. নমস্কার করছি সত্যকে

iii. এই আগুনের ঝান্ডা দুলিয়ে বাহির হলাম

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত প্রতিনিধিত্বের কারণ, সত্যই–

i. সুন্দরতম

ii. মুক্তির পথ

iii. আলোর দিশারী

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুল মালেক সারাটি জীবন শিক্ষকতা করেছেন, গড়েছেন আলোকিত মানুষ। অবসর গ্রহণের পর তিনি গড়ে তুলেছেন 'তারুণ্য' নামে সেবা-সংগঠন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি পথশিশুদের শিক্ষাদান, দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করেন তিনি। অনেকে তাঁর কাজের প্রশংসা করেন আবার নিন্দা ও কটূক্তি করতেও ছাড়েন না কেউ কেউ। তিনি তরুণদের উদ্দেশে বলেন–

মনেরে আজ কহ যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

ক. কাজী নজরুল ইসলামের মতে কোনটি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়?

খ. কবি নিজেকে "অভিশাপ রথের সারথি" বলে অভিহিত করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে আবদুল মালেকের মাধ্যমে "আমার পথ" প্রবন্ধের যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশের বক্তব্য চেতনায় ধারণ করে আলোকিত পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।– প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

জীবন ও বৃক্ষ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে। তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে পরিচিত বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির এক যুগান্তকারী আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি হিসেবে। সাহিত্যের অঙ্গনে ও বাস্তব জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সৌন্দর্যবোধ, মুক্তবুদ্ধি-চেতনা ও মানবপ্রেমের আদর্শের অনুসারী। তিনি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখের সহযোগী। মননশীল, চিন্তা-উদ্দীপক ও পরিশীলিত গদ্যের রচয়িতা হিসেবে বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর গ্রন্থ 'সংস্কৃতি কথা' বাংলাদেশের প্রবন্ধ–সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন। তাঁর প্রকাশিত অন্য দুটি গ্রন্থ হচ্ছে ক্লাইভ বেল-এর 'Civilization' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 'সভ্যতা' এবং বারট্রান্ড রাসেলের 'Conquest of Happiness' গ্রন্থের অনুবাদ 'সুখ'। বাংলা একাডেমি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা রচনাবলি-আকারে প্রকাশ করেছে।

চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার– এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বুলি।

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ– সূক্ষ্মবুদ্ধি উদারহৃদয় গভীরচিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ– যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মনে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধ হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়– তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।

জানি, বলা হবে : নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

উত্তরে বলব : চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনায় যেমন একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এই তো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি তা-ই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ–দুঃখ–বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাই তো আত্মা। এই আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : 'Ripeness is all'– পরিপক্বতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না– জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য–শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এত মূল্য।

ওপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি– জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।

বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়– প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।

শব্দার্থ ও টীকা

স্থূলবুদ্ধি – সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিহীন। অগভীর জ্ঞানসম্পন্ন।

জবরদস্তিপ্রিয় – গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর। বিচার-বিবেচনাহীন।

বিকৃতবুদ্ধি – বুদ্ধির বিকার ঘটেছে এমন। যথাযথ চিন্তাচেতনাহীন।

এদের প্রধান দেবতা অহংকার – যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাচেতনাহীন লোকেরা এত গর্বোদ্ধত হয়ে থাকে যে মনে হয় যেন অহংকারই তাদের প্রধান উপাস্য বা দেবতা।

বুলি	–	এখানে গৎ-বাঁধা কথা হিসেবে ব্যবহৃত। যথাযথ অর্থ বহন করে না এমন কথা যা অভ্যাসের বশে বলা হয়ে থাকে।
মনুষ্যত্ব	–	মানবোচিত সদগুণাবলি। মানুষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য।
তবোপন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ	–	প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অরণ্য ও বৃক্ষপ্রেমিক। তাঁর অনেক কবিতায় বৃক্ষের বন্দনা স্পষ্ট।
তপোবন	–	অরণ্যে ঋষির আশ্রম। মুনি ঋষিরা তপস্যা করেন এমন বন।
অনুভূতির চক্ষু	–	মনের চোখ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতির বা উপলব্ধির ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা।
নতি	–	অবনত ভাব। বিনয়, নম্রতা।
বৃক্ষের প্রাপ্তি ও দান	–	বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে তার ফুল ও ফল। এগুলো সে অন্যের হাতে তুলে দেয়। ফলে বৃক্ষ যুগপৎ প্রাপ্তি ও দানের আদর্শ।
সৃষ্টিধর্ম	–	সৃষ্টি বা সৃজনের বৈশিষ্ট্য।
আত্মিক	–	মনোজাগতিক। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্র।
পরিপক্বতা	–	সুপরিণতিজাত। পরিপূর্ণ বিকাশসাধন।
বস্তুজিজ্ঞাসা	–	বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন-অন্বেষা। বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ।
গূঢ় অর্থ	–	প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য।

পাঠ-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর "জীবন ও বৃক্ষ" প্রবন্ধটি তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। পরার্থে আত্মনিবেদিত সুকৃতিময় সার্থক বিবেকবোধসম্পন্ন মানবজীবনের মহত্তম প্রত্যাশা থেকে লেখক মানুষের জীবনকাঠামোকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন, বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা। বৃক্ষ যেমন করে ফুলে ফলে পরিপূর্ণতা পায়, আর সে সব অন্যকে দান করে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে, মানব-জীবনের সার্থকতার জন্য তার নিজের সাধনাও তেমনি হওয়া উচিত। তাহলেই স্বার্থপর, অহংকারী, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর জবরদস্তিপ্রবণ মানুষের জায়গায় দেখা দেবে প্রেমে, সৌন্দর্যে, সেবায় বিকশিত বিবেকবান পরিপূর্ণ ও সার্থক মানুষ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন?

ক. নদীকে খ. বৃক্ষকে

গ. ধর্মকে ঘ. আত্মাকে

২. 'প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম'–উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পরোপকারিতা খ. সহনশীলতা

গ. উদারতা ঘ. সংবেদনশীলতা

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তমাল মেধাবী। দেশের স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে ফিরে যান নিজ গ্রামে। প্রতিষ্ঠা করেন দাতব্য চিকিৎসালয়। শহরে প্রাকটিস করে অনেক টাকা রোজগারের পরিবর্তে নিজ গ্রামের সাধারণ মানুষের সেবাকে তিনি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন।

৩. উদ্দীপকের তমালের সাথে "জীবন ও বৃক্ষ" প্রবন্ধের কার সাদৃশ্য আছে?

ক. বৃক্ষের খ. জীবনের

গ. লেখকের ঘ. নদীর

৪. উদ্দীপকের ভাবার্থ নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও।

খ. বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়, প্রশান্তিরও ইঙ্গিত।

গ. যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান।

ঘ. নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

এই যে বিটপি শ্রেণি হেরি সারি সারি–
কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি।
কেহবা সরল সাধু হৃদয় যেমন,
ফলভারে নত কেহ গুণীর মতন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চ শির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

ক. মোতাহের হোসের চৌধুরী কোন আন্দোলনের কাণ্ডারি ছিলেন?

খ. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন কেন?

গ. 'বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়'– প্রবন্ধের এ উক্তিটি উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের 'বৃক্ষ' এবং "জীবন ও বৃক্ষ" প্রবন্ধের 'বৃক্ষ' কি একসূত্রে গাঁথা?'– তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

মানব-কল্যাণ

আবুল ফজল

লেখক-পরিচিতি

আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। তাঁর পিতার নাম ফজলুর রহমান। তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। স্কুল শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে প্রায় ত্রিশ বছর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সমাজ ও সমকাল-সচেতন সাহিত্যিক এবং প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাত। ছাত্রজীবনেই যুক্ত হন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে; অন্যদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ। কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন মূলত চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় বিধৃত। আধুনিক অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও শুভবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– উপন্যাস : 'চৌচির', 'রাঙা প্রভাত'; গল্পগ্রন্থ : 'মাটির পৃথিবী', 'মৃতের আত্মহত্যা'; প্রবন্ধ : 'সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা', 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন', 'সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র', 'মানবতন্ত্র', 'একুশ মানে মাথা নত না করা'; দিনলিপি : 'রেখাচিত্র', 'দুর্দিনের দিনলিপি'। সাহিত্যকৃতির জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে চট্টগ্রামে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

মানব-কল্যাণ– এ শিরোনাম আমার দেওয়া নয়। আমাদের প্রচলিত ধারণা আর চলতি কথায় মানব-কল্যাণ কথাটা অনেকখানি সস্তা আর মামুলি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও আমরা মানব-কল্যাণ মনে করে থাকি। মনুষ্যত্ববোধ আর মানব-মর্যাদাকে এতে যে ক্ষুণ্ন করা হয় তা সাধারণত উপলব্ধি করা হয় না।

ইসলামের নবি বলেছেন, ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ। নিচের হাত মানে যে মানুষ হাত পেতে গ্রহণ করে, ওপরের হাত মানে দাতা– যে হাত তুলে ওপর থেকে অনুগ্রহ বর্ষণ করে। দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা তার সর্ব অবয়বে কীভাবে প্রতিফলিত হয় তার বীভৎস দৃশ্য কার না নজরে পড়েছে?

মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগৃহীতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। এ কথা ব্যক্তির বেলায় যেমন সত্য, তেমনি দেশ আর রাষ্ট্রের বেলায় বরং অধিকতর সত্য। কারণ, রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু প্রশাসন চালানোই নয়, জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলাও রাষ্ট্রের এক বৃহত্তর দায়িত্ব। যে রাষ্ট্র হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে দেয় প্রশ্রয়, সে রাষ্ট্র কিছুতেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে না।

তাই মানব-কল্যাণ অর্থে আমি দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে মনে করি না। মনুষ্যত্বের অবমাননা যে ক্রিয়াকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাকে কিছুতেই মানব-কল্যাণ নামে অভিহিত করা যায় না। মানব-কল্যাণের উৎস মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত। একদিন এক ব্যক্তি ইসলামের নবির কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল। নবি তাকে একখানা কুড়াল কিনে দিয়ে বলেছিলেন, এটি দিয়ে তুমি বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা রোজগার করো গে। এভাবে তিনি লোকটিতে শুধু স্বাবলম্বনের পথ দেখাননি, সে সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মর্যাদাবান হওয়ার, মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের উপায়ও।

মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক-বৃত্তির বিকাশের পথেই বেড়ে উঠতে হবে আর তার যথাযথ ক্ষেত্র রচনাই মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান। সে সোপান রচনাই সমাজ আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ বা ইউনিট পরিবার– সে পরিবারকেও পালন করতে হয় এ দায়িত্ব। কারণ, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা সেখান থেকেই। ধীরে ধীরে ব্যাপকতর পরিধিতে যখন মানুষের বিচরণ হয় শুরু, তখন সে পরিধিতে যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে– তা শিক্ষা কিংবা জীবিকা সংক্রান্ত যা হোক না তখন সে দায়িত্ব ঐসব প্রতিষ্ঠানের ওপরও বর্তায়। তবে তা অনেকখানি নির্ভর করে অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র গড়ে তোলার ওপর।

মানব-কল্যাণ স্বয়ম্ভূ, বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক-রহিত হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ যেমন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি তার কল্যাণও সামগ্রিকভাবে সমাজের ভালো-মন্দের সঙ্গে সংযুক্ত। উপলব্ধি ছাড়া মানব-কল্যাণ স্রেফ দান-খয়রাত আর কাঙালি ভোজনের মতো মানব-মর্যাদার অবমাননাকর এক পদ্ধতি না হয়ে যায় না, যা আমাদের দেশ আর সমাজে হয়েছে। এসবকে বাহবা দেওয়ার এবং এসব করে বাহবা কুড়োবার লোকেরও অভাব নেই দেশে।

আসল কথা, মানুষের মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে স্রেফ তার জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল এ ধরনের মানব-কল্যাণ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হতে পারে না। এ হেন মানব-কল্যাণের কুৎসিত ছবি দেখার জন্য দূরদূরান্তে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের আশে-পাশে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই তা দেখা যায়।

বর্তমানে মানব-কল্যাণ অর্থে আমরা যা বুঝি তার প্রধানতম অন্তরায় রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত চেতনা– যা মানুষকে মেলায় না, করে বিভক্ত। বিভক্তিকরণের মনোভাব নিয়ে কারো কল্যাণ করা যায় না। করা যায় একমাত্র সমতা আর সহযোগ-সহযোগিতার পথে।

সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল। বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা আর আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। দুঃখের বিষয়, সে উত্তরাধিকারকে আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে লালন প্রমুখ কবি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সবাইতো মানবিক চেতনার উদাত্ত কণ্ঠস্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক উক্তি : "তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উক্তিটিও স্মরণীয় : "Relationship is the fundamental truth of the world of appearance." কবি এ উক্তিটি করেছিলেন তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায়। অন্তর-জগতের বাইরে যে জগৎকে আমরা অহরহ দেখতে পাই তার মৌলিক সত্য পারস্পরিক সংযোগ-সহযোগিতা, কবি যাকে Relationship বলেছেন। সে সংযোগ বা সম্পর্কের অভাব ঘটলে মানব-কল্যাণ কথাটা স্রেফ ভিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে পরিণত হয়।

মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়– এ এক জাগতিক মানবধর্ম। তাই এর সাথে মানব-মর্যাদার তথা Human dignity-র সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে কী দেখতে পাই? দেখতে পাই দুস্থ, অবহেলিত, বাস্তুহারা, স্বদেশ-বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। সে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে রিলিফ, রিহেবিলিটেশন ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। রেডক্রস ইত্যাদি সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধিই কি প্রমাণ করে না মানব-কল্যাণ কথাটা স্রেফ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে? মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদার স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব-কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত না হয়ে পারে না।

কালের বিবর্তনে আমরা এখন আর tribe বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব নই– বৃহত্তর মানবতার অংশ। তাই Go of humanity-কে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিংবা খণ্ডিতভাবে দেখা বা নেওয়া যায় না। তেমনি নেওয়া যায় না তার কল্যাণকর্মকেও খণ্ডিত করে। দেখতে মানুষও অন্য একটা প্রাণী মাত্র, কিন্তু ভেতরে মানুষের মধ্যে রয়েছে এক

অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। যে সম্ভাবনার স্ফুরণ-স্ফুটনের সুযোগ দেওয়া, ক্ষেত্র রচনা আর তাতে সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠতম মানব-কল্যাণ। সেটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা কোনো রকম অপমান-অবমাননার পথে হতে পারে না। হালে যে দর্শনকে অস্তিত্ববাদ নামে অভিহিত করা হয়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Existentialism তারও মূল কথা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান।

বল প্রয়োগ কিংবা সামরিক শাসন দিয়ে মানুষকে তাঁবেদার কিংবা চাটুকার বানাতে পারা যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা যায় না মানব-মর্যাদার আসনে। সব কর্মের সাথে শুধু যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে তা নয়, তার সামাজিক পরিণতি তথা Social consequence-ও অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু সব মানুষই সমাজের অঙ্গ, তাই সব রকম কল্যাণ-কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি। এ সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়। বিশেষত যখন দৃষ্টি থাকে উর্ধ্ব দিকে তথা পরলোকের পানে।

স্রেফ সদিচ্ছার দ্বারা মানব-কল্যাণ সাধিত হয় না। সব ধর্ম আর ধর্ম-প্রবর্তকেরা বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ-শান্তি দান করো মানুষকে। এমনকি সর্বজীবে হিতের কথাও বলা হয়েছে।

অতএব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। নতুন পদ্ধতিতে– যা হবে বৈজ্ঞানিক, র‍্যাশনাল ও সুবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত। সমস্যা যত বড় আর যত ব্যাপকই হোক না তার মোকাবেলা করতে হবে সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সাথে। এড়িয়ে গিয়ে কিংবা জোড়াতালি দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপরিকল্পিত পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব। একমাত্র মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে করা যায় নিয়োগ। তা করা হলেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-মর্যাদার সহায়ক। *[সংক্ষেপিত]*

শব্দার্থ ও টীকা

অনুগৃহীত	–	অনুগ্রহ বা আনুকূল্য পেয়েছে এমন। উপকৃত।
মনীষা	–	বুদ্ধি। মনন। প্রতিভা। মেধা। প্রজ্ঞা।
র‍্যাশনাল	–	বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। বিচক্ষণ। যুক্তিসম্মত। Rational।
মুক্তবুদ্ধি	–	সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত উদার মানসিকতা।

পাঠ-পরিচিতি

আবুল ফজলের "মানব-কল্যাণ" প্রবন্ধটি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এটি প্রথম 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই রচনায় লেখক মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধারণভাবে অনেকে দুস্থ মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব কল্যাণ মনে করেন। কিন্তু লেখকের মতে, এমন ধারণা খুবই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। তাঁর মতে, মানব-কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস। এ কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো। লেখকের বিশ্বাস, মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামাফিক পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করা সম্ভব।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "মানব-কল্যাণ" প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. চৌচির　　খ. রাঙা প্রভাত

গ. মানবতন্ত্র　　ঘ. মাটির পৃথিবী

২. 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে'– এখানে 'দৃষ্টিভঙ্গি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. মানসিকতার
খ. সংস্কার
গ. দেখার কৌশল
ঘ. দেখার ইচ্ছা

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

৩. উদ্দীপকের ভাবার্থ "মানব-কল্যাণ" প্রবন্ধের যে ভাব নির্দেশ করে তা হলো–

ক. পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্যে মানব-কল্যাণ নিহিত।
খ. মানব-কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
গ. অন্যকে বিপদমুক্ত করলেই মানব-কল্যাণ হয় না।
ঘ. অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমেই মানব-কল্যাণ সম্ভব।

৪. নির্দেশিত ভাবটি নিচের কোন বাক্যে বিদ্যমান?

ক. সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনার ফসল।
খ. মানব-কল্যাণ স্বয়ম্ভূ, বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রহিত হতে পারে না।
গ. মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়–এ কাজ জাগতিক মানবধর্ম।
ঘ. তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বল; ফেলিয়া পশ্চাতে।
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন সুমধুর করি।

ক. 'ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ'– কথাটি কে বলেছেন?
খ. 'রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক'– উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. **কবিতাংশটি** "মানব-কল্যাণ" প্রবন্ধের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. **কবিতাংশটি** "মানব-কল্যাণ" প্রবন্ধের আংশিক প্রতিচ্ছবি– তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

গন্তব্য কাবুল
সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক-পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর পিতার কর্মস্থল আসামের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর সিলেট জেলায়। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিকান্দার আলী। মুজতবা আলীর শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

আফগানিস্তানের কাবুলে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন তিনি। এছাড়াও দেশে-বিদেশে বহুস্থানে তিনি কর্মসূত্রে গমন করেছেন। আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মানসহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর ছিল বিশেষ পাণ্ডিত্য। সাহিত্যিক রসবোধ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার মুখ্য প্রবণতা। তাঁর রচনায় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের নানা অনুষঙ্গ কৌতুক ও ব্যঙ্গে রসাবৃত হয়ে উপস্থাপিত হয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনি', 'শবনম', 'কত না অশ্রুজল' প্রভৃতি।

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

চাঁদনি থেকে নয়সিকে দিয়ে একটা শার্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালির জন্য ইয়োরোপিয়ান থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গি হেঁকে বলল, "এটা ইয়োরোপিয়ানদের জন্য।"

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, "ইয়োরোপিয়ান তো কেউ নেই। চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।"

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, "বাংলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরেজি শব্দের প্রাগদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবি ইংরেজি হয়।" অর্থাৎ পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মতো– সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাংলায় এরই নাম গাঁক গাঁক করে ইংরেজি বলা। ফিরিঙ্গি তালতলার নেটিভ, কাজেই আমার ইংরেজি শুনে ভারি খুশি হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুপসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসত পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হলো সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত– মনে হলো আমি একা।

ফিরিঙ্গিটি লোক ভালো। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, "এত মনমরা হলে কেন? গোয়িং ফার?"

দেখলুম, বিলিতি কায়দা জানে। "হোয়ার আর ইউ গোয়িং?" বলল না।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারিতা আরম্ভ হলো। তাতে লাভও হলো। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে' নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরি করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদস্তুর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিভ বস্তু, হয়ত বড্ড বেশি ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হলো, সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আলাকার্ত ভোজন, যার যা খুশি খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল, আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগি মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে।

এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরোতে লাগল। এমনকি শিককাবাবের জায়গায় শামিকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে কপি-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, "ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে কেনা।"

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গি মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গিকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াঁসের একটা বর্ণনা দিতে, কিন্তু থেমে গেলুম।

ভোর কোথায় হলো মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কী রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়।

গাড়ি যেন কালোয়াত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্দুরের তবলচিকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়।

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনুদুস লালাজিদের মিষ্টি মিষ্টি 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ-ফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া,' পাঞ্জাবিদের 'তুবি, অসি', আর শিখ সর্দারজিদের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার।

সামনের বুড়ো সর্দারজিই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন। 'গোয়িঙ্গ ফার?' নয়, সোজাসুজি 'কহাঁ জাইয়েগা?' আমি ডবল তসলিম করে সবিনয় উত্তর দিলুম– ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতি মিষ্ট মোলায়েম হাসি। জিজ্ঞাসা করলেন, পেশাওয়ারে কাউকে চিনি? না হোটেলে উঠব। বললুম 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কী করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।'

সর্দারজি হেসে বললেন, "কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালি নামে না, আপনি দু-মিনিট সবুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।"

আমি সাহস পেয়ে বললুম, "তা তো বটেই, তবে কিনা শার্ট পরে এসেছি–" সর্দারজি এবার অট্টহাস করে বললেন, "শার্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি?"

আমি আমতা আমতা করে বললুম, "তা নয়, তবে কিনা ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে হয়ত ভালো হতো।"

সর্দারজিকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, "এও তো তাজ্জবকি বাত– পাঞ্জাবি পরলে বাঙালিকে চেনা যায়?"

আমি আর এগলুম না। বাঙালি 'পাঞ্জাবি' ও পাঞ্জাবি কুর্তায় কী তফাত সে সম্বন্ধে সর্দারজিকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরও বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, "সর্দারজি শিলওয়ার বানাতে ক-গজ কাপড় লাগে?"

বললেন, "দিল্লিতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালমুসায় সাড়ে ছয়, রাওলপিণ্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ার এক লম্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুল্লুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।"

'বিশ গজ!'

"হ্যাঁ, তাও আবার খাকি শার্টিং দিয়ে বানানো।"

আমি বললুম, "এ রকম এক বস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কী করে? মারপিট, খুন-রাহাজানির কথা বাদ দিন।"

সর্দারজি বললেন, "আপনি বুঝি কখনো বায়স্কোপ যান না? আমি এই বুড়োবয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি বোঝাবার উপায় নেই– আমার আবার একপাল নাতি-নাতনি। এই সেদিন দেখলুম, দুশো বছরের পুরোনো গল্পে এক মেমসায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন– মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশগজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মদ্দা পাঠান বিশগজি শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?" আমি খানিকটা ভেবে বললুম, "হক কথা; তবে কিনা বাজে খরচ।"

ইতোমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠানমুল্লুকের প্রবাদ, "দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।" শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পৌঁছব তাই মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি; এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল।

২

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম যে ছ-ফুটি পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালিত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে এক হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ– পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে।

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না, জানেন না, আমি বাঙালি তিনি পাঠান। তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয় তা হলে তো আর কথাই নেই।

৩

আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে "ইয়োম উস সফর, নিস্‌ফ উস্ সফ্‌র"– অর্থাৎ কিনা যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ। পূর্ব বাংলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরোতে গিয়ে আমার পাক্কা সাতদিন কেটে গেল। আটদিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হলো 'আমি ভয়ংকর একা'। 'ভয়ংকর একা' এই অর্থে যে নো ম্যানস ল্যান্ডই বলুন আর খাস আফগানিস্তানই বলুন, এসব জায়গায় মানুষ আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত।

সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানিস্তান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুন-খারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাঁদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু-চারটে পুলিশ দু-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফরাসি ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরেজি না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরেজি জানেন না, তখন তিনি ফরাসির যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তার বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারও পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবদে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরি পেয়েছেন।

বাসের পেটে একপাল কাবুলি ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজ-সরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা। পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হলো। তারপর খাইবার গিরিসংকট।

৪

দুদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সংকীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মতো টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে, যে কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডানে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে–তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে।

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজিকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠান্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে। এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজির গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র-গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দামেস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মতো 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম গোলাপি সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা। কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উঠের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলুবুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরিয়ানি পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরও চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের ভাঁজে, পুস্তিনের লাইনিংয়ের ভিতরে আফিং আর হাসিস না ককেনই, না আরও কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে।

পাঠান দু-বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।' কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হলো। কাবুলি তড়িৎ গতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজির দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবার পাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে-আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক- পিঙ্। তারপর কী কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের ওপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবার পাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু-টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদি আফ্রিদিতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর আবার চলল। কাবুলির গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, তার নির্যাস–

কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব– কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্‌ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমি বললুম, "আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

হঠাৎ দেখি সামনে একি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হলো। গেট খুলে গেল। আফগানিস্তানে ঢুকলুম। বড়ো বড়ো হরফে সাইনবোর্ডে লেখা–

কাবুলি বললেন, "দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবারপাস পাস করা। আলহামদুলিল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ)।"

আমি বললুম, "আমেন।"

৫

খাইবার পাস তো দুঃখে-সুখে পেরোলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমলো বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ–ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সংকীর্ণ হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির ওপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের ওপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে– যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোশক না থাকে এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

লান্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দক্কাদুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হলো। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে– ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রং। দেয়ালের ওপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারই ভিতরে দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলি করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে নেওয়া চোখের শূন্য কোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন– ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে।

কাবুলি বললেন, "চলুন দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারি কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তাহলে সন্ধ্যার আগেই জালালাবাদ পৌঁছতে পারব।"

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশি দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্কার মতো জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবত খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুঁজোতে কী করে তৈরি করা সম্ভব হলো বুঝতে পারলুম না।

৬

আফগানিস্তানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পির হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটালো, আর ইঞ্জিন সর্দারজির ওপর গোসা করে দুবার গুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাজি ম্যানন – তদারক করলেন সর্দারজি।

জালালাবাদ পৌঁছবার কয়েক মাইল আগে সর্দারজির কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ কিংবা বেল্ট– যাই বলুন, ছিঁড়ে দুটুকরো হলো। তখন খবর পেলুম সর্দারজিও রাতকানা। রেডিওর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, "অদ্যকার মতো আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হলো। কাল সকাল সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।"

আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সায়েব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল।

সর্দারজি তম্বী করে বললেন, "একটু পা চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।"

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মতো দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। "কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে" বলতে আমাদের চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে উঠে এর সঙ্গে তার কোনো সংশ্রব নেই। ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা– তার ভেতর দিয়ে উট, বাস, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভেতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরোতে হবে না।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা মেরেছিল বলতে পারি নে, কিন্তু মনে হলো আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কী বুঝতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। এলাকাটা মৌসুমি হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না– যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দরশাহি বাজিরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব 'অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচিভেদ্য দুর্গন্ধ শুকলুম।

৭

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। নামাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবি উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে তুর্কিস্তানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কী করে। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, "আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।" আমি বললুম, "কিছু যদি মনে করেন?" আমার এই সংকোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্য দেশে অচেনা-অজানা লোককে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশিই হয়।

মোটরে বসে তারই খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।

চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা– রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "জালালাবাদ"। তখন দুদিকেই সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কী মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জালালাবাদে তার অতি মধুর তসবির। এমনকি যে দু-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হলো। লক্ষ করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের বেপর্দামি নিন্দা করে তারই বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মতো। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতার কর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরিব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্তত আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে কখনো পর্দা মেনে 'ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করে' কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আরবের বেদুইন মেয়েরা"।

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জালালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলিরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভেতর অন্তর্ধান। কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজিকে শুধালাম "বাস আবার ছাড়বে কখন?" সর্দারজি বললেন, আবার যখন সবাই জড়ো হবে। জিজ্ঞেস করলুম সে কবে? সর্দারজি যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি তার কী জানি? সবাই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবে যখন তখন।"

বেতারকর্তা বললেন, "ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কী? আসুন আমার সঙ্গে।" আমি শুধালাম, "আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই বা কখন?"

তিনি বললেন, "ওদের জন্য আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন, আপনি তো ওদের মালজানের জিম্মাদার নন।"

আমি বললুম, "তা তো নই-ই। কিন্তু যেরকম ভাবে হুট করে সবাই নিরুদ্দেশ হলো তাতে তো মনে হলো না যে ওরা শিগগির ফিরবে। আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পৌঁছব কী করে?"

বেতারকর্তা বললেন, 'সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌঁছবার কোনো তাড়া নেই। বাস যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌঁছত পনেরো দিনে, এখন চার দিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। জালালাবাদে পৌঁছেছে এখানে সক্কলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ-না-কেউ আছে, তাদের তত্ত্বতালাশ করবে, খাবে-দাবে, তারপর ফিরে আসবে।'

৮

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছবার আর কোনো ভরসাই রইল না। পেশাওয়ার থেকে জালালাবাদ একশ মাইল, জালালাবাদ থেকে কাবুল আরও একশ মাইল। শাস্ত্রে লেখে, সকলে পেশওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জালালাবাদ পৌঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জালালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নারগিস বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পরে ডাক-বাংলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলুকুলু শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে নাকমুখ ছাপিয়ে কোন অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিঃশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলুকুলু শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্দ্রা টুটে যায়, এখানে তাই হলো কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে । এ সংগীত বহুবার শুনেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলো-অন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে নারগিসের পা ধুয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলুম নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল– ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে– তারই পরশে নারগিস নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে-চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সংগীতে সৌরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে-না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল– পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হলো কার?

ভোরের নামাজ শেষ হতেই সর্দারজি ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হলো তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধ্যায় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

হাওড়া স্টেশন – পশ্চিমবঙ্গের একটি রেলস্টেশন। আয়তনের দিক থেকে এটি ভারতের একটি বৃহত্তর রেলস্টেশন। বর্তমানে এই স্টেশনে ২৬টি প্লাটফর্ম আছে।

প্রাগদেশ – কোনো কিছুর শুরুতে। পূর্বদেশ। পূর্বস্থান।

ফিরিঙ্গি – ফার্সি থেকে আগত শব্দ। এর অর্থ হলো ফরাসি বা ইউরোপিয়ান। তবে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে সাদা চামড়ার বিদেশি মাত্রেই ফিরিঙ্গি বলে অভিহিত হতেন।

নেটিভ – ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের নেটিভ বলে অভিহিত করতেন। এর মানে হলো স্বদেশি। যে ব্যক্তি যে-দেশে বা যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ওই দেশের বা পরিবেশের নেটিভ।

ফিয়াঁসে – ভালোবাসার নারী। প্রাচীন ফরাসি ভাষায় এর অর্থ প্রতিজ্ঞা।

আলাকার্ত – Ala carte। ফরাসি শব্দ। এর অর্থ খাদ্যতালিকা অনুযায়ী।

জাকারিয়া স্ট্রিট – কলকাতার একটি স্থান। হোটেলের জন্য বিখ্যাত। সব ধরনের খাবার পাওয়া যায়।

গৌরচন্দ্রিকা – ভূমিকা। প্রাক্‌কথন।

কালোয়াত – ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি। সংগীতে পারদর্শী শিল্পী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো দ্রুত লয়ে।

পেশোয়ার স্টেশন – পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থিত রেলস্টেশন।

দিল্লি – ভারতের রাজধানী শহর। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর হিসেবে পরিচিত। আয়তনের দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় শহর এবং ভারতের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম।

জলন্ধর – ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অতি প্রাচীন শহর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে পরিচিত।

রাওয়ালপিন্ডি – পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে নয় মাইল দূরের শহর রাওয়ালপিন্ডি। পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর।

পেশোয়ার – পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন প্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর পেশোয়ার। খাইবার পাস-এর শেষ পূর্ব প্রান্তের হ্রদের পাশে শহরটি অবস্থিত। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে শহরটি সমৃদ্ধ।

টাঙা – টাট্টু ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ি।

খাইবার পাস – গিরিপথ। এই গিরিপথের মাধ্যমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম রাস্তার মধ্যে এটি অন্যতম। আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও চেঙ্গিস খান থেকে শুরু করে মুসলিম শাসকগণ তাদের বিশ্ব বিজয়ে খাইবার পাস ব্যবহার করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবে ব্রিটিশরা এই খাইবার পাস দিয়ে একটি ভারি রেলওয়ে নির্মাণ করে। বর্তমানে এই পথ দিয়ে আমেরিকা তাদের সৈন্যদের জন্য আফগানিস্তানে রসদ নিয়ে যায়।

বুখারা – উজবেকিস্তানের পঞ্চম বৃহৎ শহর। প্রাচীন এই শহর ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতিচর্চা ও ধর্মচর্চার জন্য বিখ্যাত। একদিকে প্রচুর স্থাপত্যকর্ম এবং অন্যদিকে মসজিদ-মাদ্‌রাসা এই শহরটিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

জর্মন মাউজার	–	জার্মানের একটি অস্ত্র তৈরির কারখানার নাম মাউজার (Mauser)। পল মাউজার এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৪ সালের ২৩এ মে কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনো এই প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনকৃত রাইফেল ও পিস্তল সারা পৃথিবীতে বিক্রি হয়।
সামোভার	–	গরম পানির পাত্রবিশেষ।
দামেস্ক	–	সিরিয়ার রাজধানী। সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র। চার হাজার বছর আগে শহরটি নির্মিত হয়।
কানজোখা	–	কাঁধ পরিমাণ।
আফ্রিদি	–	পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সাহসী উপজাতি বিশেষ। পশ্চিম পেশোয়ারের প্রায় এক হাজার বর্গমাইলব্যাপী এদের বাস।
লান্ডিকোটাল	–	পাকিস্তানের উপজাতি শাসিত অঞ্চলের একটি শহর। খাইবার পাস-এর পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই শহর অবস্থিত।
পুস্তিন	–	চামড়ার জামা বা কোট
জালালাবাদ	–	আফগানিস্তানের একটি শহর। আদিনাপুর নামে খ্যাত। কাবুল নদী, কুনার নদী ও লাগমান দ্বীপের সংযোগস্থলে শহরটি অবস্থিত। পাকিস্তানের নিকটবর্তী আফগানিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী জালালাবাদ।

পাঠ-পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত "গন্তব্য কাবুল" শীর্ষক ভ্রমণকাহিনিটি তাঁর 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৮) গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রচনাটির মধ্য দিয়ে আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর অসাধারণ ভ্রমণ-সাহিত্যের সঙ্গেই শুধু পরিচিত হই না, অধিকন্তু তাঁর জীবনবোধ, সাহিত্যরুচি ও নিজস্ব শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারি। সৈয়দ মুজতবা আলী বিচিত্র এক জীবন যাপন করেছেন। কত জনপদ, কত মানুষ আর কত ঘটনার সঙ্গে যে তিনি এক জীবনে পরিচিত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর সেই জনপদ, সেই মানুষ আর সেই সব ঘটনাকেও তিনি দেখেছেন কখনো রসিকের চোখে, কখনো ভাবুকের চোখে এবং কখনোবা বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের মনন ও নিষ্ঠার চোখে। ফলে অনিবার্যভাবেই তাঁর সব সৃষ্টির মতো ভ্রমণ-সাহিত্যও হয়ে উঠেছে তুখোড় এক জীবনচাঞ্চল্যে ভরপুর কথামালা। "গন্তব্য কাবুল" তার ব্যতিক্রম নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে কাবুলের উদ্দেশে যে যাত্রাটি তিনি শুরু করেছিলেন তাতে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ রসঘন এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের প্রতিটি পর্বে কত যে কৌতুক, কৌতূহল, হাসি-ঠাট্টা, রম্য-রসিকতা আর প্রজ্ঞা ও মনন পাঠকের জন্য অপেক্ষা করে তার কোনো তুলনা চলে না। যাত্রার শুরুতেই গাড়িতে উঠতে গেলে একজন ইংরেজ হাঁক দিয়ে বলেছিলেন "ওটা ইয়োরোপিয়ানদের জন্য"। এই একটি মাত্র উক্তির মধ্যে ব্রিটিশশাসিত দুইশ বছরের ইতিহাসের একটি মাত্রা অনুভব করা যায়। আবার সেই ফিরিঙ্গির সঙ্গেই যখন শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় আর ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাওয়া হয় নিজেদের সঙ্গে করে আনা বিচিত্র খাবার তখন অন্য এক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। সেই ইতিহাস মানবিকতার, সাম্যের, সৌন্দর্যের। এই বিচিত্র মানুষ-জনের সঙ্গে মিলেমিশে আছে নানা ধরনের প্রকৃতি, ভূগোল, ইতিহাস ও নানা সংস্কৃতি। এই রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লান্ডিকোটাল থেকে দক্কার দূরত্ব কত মাইল?

ক. নয় খ. দশ

গ. এগারো ঘ. বারো

২. "এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে"–উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. গান ও সৌরভ ভিন্নতাসূচক
খ. সুর ও সুগন্ধ একাকার
গ. গান সুগন্ধের সৃষ্টি করে
ঘ. সুর সৌরভের পরিপূরক

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মিথুনের পাহাড় দেখার শখ অনেক দিন থেকেই। তাই এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি গিয়েছিলেন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি। সেখানে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা আর দুইধারে ঘন বন-জঙ্গল দেখে তিনি অভিভূত হন। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা রিসাং ঝরনার সুশীতল জল আর আলুটিলার গুহায় রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের পাহাড়ি অধিবাসীদের সাথে মিশে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়।

৩. "গন্তব্য কাবুল" রচনার কোন বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে?

ক. আন্তরিকতা
খ. দেশপ্রেম
গ. সৌন্দর্যপ্রিয়তা
ঘ. উচ্চাভিলাষ

৪. প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যটি যে যে বাক্যে বিদ্যমান তাহলো—

i. দুইদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়
ii. কত দেশের কত রকমের লোক পণ্য বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে
iii. এর গান ও সৌরভে মিশে গিয়েছে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. iiও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মানুষ যে কেবল নিজেকেই জানিতে চায় তাহাই নহে, বাহিরের জগতের আহ্বানে প্রতিনিয়তই তাহাকে টানিতেছে। এই আহ্বানে প্রলুব্ধ হইয়া অনেক লোক দেশভ্রমণে বহির্গত হয়। নানা দেশ, নানা জাতি, তাহাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়। বাহিরের এই বস্তুসত্তাকে লেখক মানসরসে প্রত্যক্ষ করিয়া তথ্যসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই জাতীয় গ্রন্থে বস্তুসত্তার প্রাধান্য থাকিলেও উহার মধ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকিতে পারে।

ক. ফিরিঙ্গি কী?

খ. সর্দারজিকে লেখকের ভালো লাগার কারণ কী?

গ. "গন্তব্য কাবুল" রচনায় উদ্দীপকের কোন সত্তাটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপর্যুক্ত সত্তাটি "গন্তব্য কাবুল" রচনার শেষ কথা নয়।– বিশ্লেষণ কর।

মাসি-পিসি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম মানিক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন।

মাত্র আটচল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএসসি পড়ার সময়ে মাত্র বিশ বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে তিনি প্রথম গল্প "অতসীমামী" লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর জীবনের বাকি আটাশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে গেছেন। মাঝে বছর তিনেক মাত্র তিনি চাকরি ও ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে জড়ালেও বাকি পুরো সময়টাই তিনি সার্বক্ষণিকভাবে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে মানিক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান। অল্প সময়েই প্রচুর গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি করেন। সেই সঙ্গে লিখেছেন কিছু কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ও ডায়েরি। বিজ্ঞানমনস্ক এই লেখক মানুষের মনোজগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে সমাজবাস্তবতার শিল্পী হিসেবেও স্বাক্ষর রেখেছেন। 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'চিহ্ন' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'কুষ্ঠরোগীর বৌ', 'টিকটিকি', 'হলুদ পোড়া', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি। কলকাতায় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের তেসরা ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দু-হাত চওড়া হয়নি না হয়। দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

"মাসি-পিসি ফিরছে কৈলেশ", বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসি-পিসির সালতি দু-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

"ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।"

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসি-পিসি সালতির গতি ঠেকায়, আহ্লাদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, "বেলা আর নেই কৈলেশ।" পেছনে থেকে পিসি বলে, "অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।"

মাসি-পিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে বলা। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদি যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

"বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি", কৈলাশ শুরু করে, "মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো–"

মাসি বলে, "খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দাকথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে, কী?"

পিসি বলে, "খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।"

মাসি-পিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, "জগুর সাথে দেখা হলো কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এটটু-মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।"

মাসি বলে, "চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী?"

পিসি বলে, "সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?"

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদির দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে, তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসি-পিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, "ওসব একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সেই জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।"

মাসি বলে, "পেট শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে দিনভর রাতভর?"

পিসি-বলে, "মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই-আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?"

মাসি বলে, "ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।"

পিসি বলে, "নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।"

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আহ্লাদির দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোর-জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আহ্লাদির সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদির ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদির দিকে।

কৈলাশ বলে, “তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্য। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জান মাসি, জান পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।”

আহ্লাদি একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কয়েক বার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, “জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?”

বলে মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি!

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদির। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি-পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছু তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন–খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রূপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদির বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসি-পিসির সেবা-যত্নেই আহ্লাদি অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি–বা সম্ভব, অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসি-পিসি আহ্লাদির জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না–পেল যদি তো না–খেয়েই। অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারদিকে না-খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি; একদিন মাসি বলে পিসিকে, “একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতেও তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।”

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয়ত মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসি-পিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসি-পিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখ-দুঃখের কথা তারা কাকেই-বা বলবে, কেই-বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে।

পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদির ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদি আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদিকে হয়ত শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো, মাসি-পিসিও বিশেষ কিছু বলতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসি-পিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আহ্লাদিকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদিকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদিকে বর্তেছে, জগুর বৌ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদিকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদিকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, 'ডরাস্‌নি আহ্লাদি। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয় তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?'

পিসি বলে, 'দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলি নি কৈলেশকে।'

মাসি বলে, 'চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা। মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।' পিসি বলে, 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদি। তোর পিসে ছিল জগুর মতো। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে'।

মাসি বলে, 'তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদি, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।'

পিসি বলে, 'তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের?'

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসি-পিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদির পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসি-পিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসি-পিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসি-পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কি না যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কত রকমের দর

দিয়েছে মাসি-পিসির কাছে। মাসি-পিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসি-পিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসি-পিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদি। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসি-পিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদিকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সহজ হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদির কথা, আহ্লাদির সুখদুঃখ, আহ্লাদির সমস্যা, আহ্লাদির ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসি-পিসি– আহ্লাদিকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসি-পিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিঃশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু-জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসি-পিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসি-পিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।'

মাসি বলে, 'এত রাতে?'

পিসি বলে, 'মরণ নেই?'

কানাই বলে, 'দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবেগো দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

মাসি-পিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসি-পিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটি-বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদিকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, 'মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?'

পিসি বলে, 'আমি যাই চলো?'

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসি-পিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, 'কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।'

পিসি বলে, 'হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।'

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, 'কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাব।'

পিসি বলে, 'এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?'

কানাই ফুঁসে ওঠে, 'না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।'

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, 'বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।'

পিসি বলে, 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।'

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসি-পিসির।

মাসি বলে, 'শোনো কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েনোক পারব না জানি কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জখম করব ঠিক।'

পিসি বলে, 'মোরা নয় মরব।'

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসি-পিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনাদ্দন! ওগো কানুর মা! বিপিন! বংশী ...'

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদিকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসি-পিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসি-পিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হলো সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসি-পিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, 'জানো বেয়াইন, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি।'

পিসি বলে, 'তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।'

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে।

মাসি বলে, 'সজাগ রইতে হবে রাতটা।'

পিসি বলে, 'তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।'

আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদির ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদির বাপের আমলের গোরুটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি। *[সংক্ষেপিত]*

শব্দার্থ ও টীকা

সালতি	–	শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা বা নৌকা।
কদমছাঁট	–	মাথার চুল এমনভাবে ছাঁটা যে তা কদমফুলের আকার ধারণ করে।
লগি	–	হাত ছয়েক লম্বা সরু বাঁশ। নৌকা চালানোর জন্য ব্যবহৃত বাঁশের দণ্ড।
খপর	–	'খবর' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ।
মেয়া	–	'মেয়ে' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ।
সোমত্ত	–	সমর্থ (সংসারধর্ম পালনে), যৌবনপ্রাপ্ত।
খুনসুটি	–	হাসি-তামাশাযুক্ত বিবাদ-বিসম্বাদ বা ঝগড়া।
বেমক্কা	–	স্থান-বহির্ভূত। অসংগত।
পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা	–	পর্যাপ্ত খাবার না-জুগিয়ে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি লাথি ঝাঁটার মাধ্যমে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা।
কলকেপোড়া ছ্যাঁকা	–	তামাকসেবনে ব্যবহৃত হুকার উপরে কলকেতে যে আগুন থাকে তা দিয়ে দগ্ধ করা।
ডালের বড়ি	–	চালকুমড়া ও ডাল পিষে ছোট ছোট আকারে তৈরি করা খাদ্যবস্তু যা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং সবজি-মাছ-মাংসের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়।
পাঁশুটে	–	ছাইবর্ণবিশিষ্ট। পাংশুবর্ণ। পাণ্ডুর। ফ্যাকাশে।
ব্যঞ্জন	–	রান্না-করা তরকারি।
বাজারের তোলা	–	বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায়করা খাজনা।
রসুই চালা	–	যে চালার নিচে রান্না করা হয়। রান্নাঘর।
কাটারি	–	কাটবার অস্ত্র।
এর্কি	–	'ইয়ার্কি' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। হাস্য-পরিহাস বা রসিকতা।

পাঠ-পরিচিতি

"মাসি-পিসি" গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)। পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।

স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে "মাসি-পিসি" গল্প। আহ্লাদি নামক ওই তরুণীর মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। তারা তাদের অস্তিত্বরক্ষার পাশাপাশি বিরূপ বিশ্ব থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য যে বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে সেটাই গল্পটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে অসহায় দুই বিধবার দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ খুবই প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি, জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম, নারী হয়ে নৌকাচালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা প্রভৃতি এ গল্পের বৈচিত্র্যময় দিক।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কানাইয়ের সাথে গোকুলের কতজন পেয়াদা এসেছিলেন?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

২. মাসি-পিসি আহ্লাদিকে জগুর কাছে পাঠাতে চায়নি কেন?

ক. নির্যাতনের ভয়ে খ. স্নেহের আতিশয্যে

গ. দারিদ্র্যের কারণে ঘ. আহ্লাদি যেতে চায়নি বলে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেখি নাই যারে, চিনি নাই যারে
শুনি নাই নাম কভু
তিনিই আজিকে দেবতা আমার
তিনিই আমার প্রভু।

৩. উদ্দীপকের প্রভু 'মাসি-পিসি' রচনার কার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. লেখকের খ. জগুর

গ. কৈলেশের ঘ. গোকুলের

৪. উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো :

ক. আধিপত্য খ. পাণ্ডিত্য

গ. স্বৈরাচারী ঘ. অহংবোধ

সৃজনশীল প্রশ্ন

ষাটোর্ধ্ব বিধবা ফাতেমা বেগম। নিঃসন্তান এ বৃদ্ধার আপন বলতে কেউ নেই। একদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়ে হঠাৎ তিনি একটি মেয়েকে রাস্তায় কাঁদতে দেখেন। বৃত্তান্ত শুনে তিনি মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ মেয়েটিকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দেন। স্বামীপক্ষ খবর পেয়ে তাকে নিয়ে যেতে চান। মেয়েটি কোনোভাবেই যেতে ইচ্ছুক নন। বৃদ্ধাও মেয়েটিকে যেতে দেননি। এতে তাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধা মেয়েটিকে সমুদয় সম্পত্তি দান করে যান।

ক. 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়'– উক্তিটি কার?

খ. 'যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি'– উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মেয়েটি "মাসি-পিসি" গল্পের আহ্লাদির সাথে কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "মাসি-পিসি" গল্পের মাসি-পিসি ও উদ্দীপকের বৃদ্ধা একসূত্রে গাঁথা– মন্তব্যটি যাচাই কর।

কলিমদ্দি দফাদার
আবু জাফর শামসুদ্দীন

লেখক-পরিচিতি

আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম বৃহত্তর ঢাকার গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। প্রতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ না করলেও তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সরকারি চাকরিও করেছেন। সমাজ-সচেতন ও রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, প্রগতিকামী ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন।

বাংলাদেশের অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী ছিলেন। কেবল গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি পরিচিত নন; তিনি নাটক লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত।

তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে বিশেষ পরিচিত ও আলোচিত হন 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' নামের উপন্যাস লিখে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে : 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'সংকর সংকীর্তন', 'প্রপঞ্চ', 'দেয়াল'। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে : 'শেষ রাত্রির তারা', 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য', 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা', 'আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প', ইত্যাদি। তাঁর রচিত 'আত্মস্মৃতি'ও অসামান্য গ্রন্থ।

সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যু ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ আগস্ট ঢাকায়।

ঢাকা জেলার একটি বাৎসরিক প্লাবন অঞ্চল। শীতলক্ষ্যা নদীর দু-তীর ধরে মাইল দু-মাইল ভেতর পর্যন্ত ডোবে না। বর্ষায় আরও ভেতরে প্রবেশ করা মুশকিল। দু-মাইল যেতে পাঁচ মাইল ঘুরতে হয়। কোনো কোনো গ্রাম রীতিমতো দ্বীপ হয়ে যায়। ঢুকতে নাও-কোন্দা লাগে। ছোট পানি পারাপার হওয়ার জন্য কোথাও বাঁশের সাঁকো, কোথাও কাঠের পুল আছে। ওগুলো পারাপার হতে ট্রেনিং আবশ্যক। অনভ্যস্তের জন্য প্রায় ক্ষেত্রে ওগুলো পুলসেরাত। সাঁকোতে ঊর্ধ্বপক্ষে দুটো বাঁশ পাশাপাশি পাতা, নিচে জোড়ায় জোড়ায় আড়াআড়ি পোঁতা বাঁশের খুঁটি। ধরে চলার জন্য পাশে হালকা বাঁশ কখনো থাকেও না। মধ্যপথে যাওয়ার পর হয় দেখা গেল পায়ের নিচে মাত্র একটি বাঁশ, অন্যটি উধাও হয়ে গেছে। চড়ামাত্র সাঁকো মাঝিমাল্লাহীন ডিঙি নৌকার মতো বেসামাল নড়তে থাকে। কাঠের পুলের অবস্থাও প্রায় ওরকম। গরু-ছাগল পারাপার হওয়ার ফলে এক বছরের মধ্যেই পুলের বারোটা বাজে। পায়ের নিচের চার তক্তা ভেঙে দু-তক্তা এমনকি এক তক্তাও হয়ে যায়। কোথাও তক্তা অদৃশ্য হয়ে যায়, পাশাপাশি দু-খণ্ড বাঁশ স্থাপন করে সংযোগ স্থাপন করা হয়। দুর্বল খুঁটির ওপর স্থাপিত এসব কাঠের পুলে চড়ামাত্র বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো খটখট নড়ে। মোটকথা, শতকরা আশিজন গ্রামবাসীর আর্থিক স্থিতির মতো সাঁকোর স্থিতিও বড় নড়বড়ে। পুলের নিচে অথৈ পানির স্রোত। পা ফসকে পড়লে বিপদ। সাঁতার না জানলে আরও বেশি বিপদ।

কলিমদ্দি এলাকার দফাদার। বিশ বাইশ বছর বয়সে ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদারিতে ঢুকেছিল। তখন হতে সে কলিমদ্দি দফাদার নামে পরিচিত। এখন বয়স প্রায় ষাট, চুল দাড়িতে পাক ধরেছে। বয়সকালে সে লাঠি খেলত। এখন সে লাঠি খেলে না, কিন্তু ঐতিহ্যরূপে বাবরি চুল রাখে। চৌকিদারের সর্দার দফাদার। গ্রামাঞ্চলের একটি মর্যাদাবান পদ। মর্যাদা সে পায়ও। লোকেরা তাকে দফাদার সাব ডাকে। কিন্তু পদমর্যাদার

ভার তার বাড় বাড়ায়নি। তার আচার-আচরণ সহজ, সরল। হালকা রসিকতায় রসপটু। যৌবনে রাত জেগে পুঁথি পড়ত। সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে হয়। সেখানেও চৌকিদারের ওপরে তার মানমর্যাদা। বড় দারোগা এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মেম্বাররা তাকে 'তুমি' বলেন, শেষোক্তদের কেউ কেউ আপনি বলেও সম্মান করেন। চৌকিদারদের করেন তুই-তোকারি– এমনকি যাচ্ছেতাই গালিগালাজও।

কলিমদ্দি দফাদারের বাড়ি বলতে একটি ছনের ঘর এবং তালপাতার ছাউনি দেয়া একটি একচালা পাকঘর, সামনে এক ফালি উঠোন। তার সামনে পাঁচ কাঠা পরিমাণ জায়গা। সেটিতে সে 'আগুইনা' চিতার চাষ করে। লতার নিচের মূল কবিরাজি ওষুধের উপাদান। শহরের কারখানায় ভালো দাম পাওয়া যায়। চাষের জমি সামান্য। মাস দু-মাসের খোরাকি হয়। বাকি সংবৎসর কিনে খেতে হয়। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে পাঁচজনের সংসার, বেতন সামান্য। কয়েকটি আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও পেঁপে গাছ অতিরিক্ত আয়ের উৎস। আর আছে একটি ছোট গাভি এবং স্ত্রীর একটি ছাগল ও মোরগ, হাঁস দু-চারটি। বিয়োলে গাভিটি দেড় দু-সের দুধ দেয়। আধ সের রেখে বাকি সে সকালের বাজারে বেচে। এভাবে কায়ক্লেশে সংসার চলে। ধান-চালের দাম বাড়লে উপোস-কপোসও করতে হয়। কিন্তু কারো কাছে ধারকর্জের জন্য হাত পেতে দফাদার তার মর্যাদা খোয়ায় না। চরম দুর্দিনেও যে স্ফূর্তিবাজ মানুষ। বাজারের চা দোকানে বসে সে সকলের মতো রসিকতা করে, রসিকতার জাহাজ তার মস্তিষ্ক।

১৯৭১ সাল। ভাদ্রের শেষ। কানায় কানায় ভরা প্লাবনের পানি। যুদ্ধের প্রথমদিকেই খান সেনারা থানা সদর দখল করে নিয়েছিল। থানার কাছাকাছি ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে। কিছুদিন যেতে নদীর ওপর পুল। অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ওরা ভেতরেও প্রবেশ করেছে। কলিমদ্দি দফাদারের বোর্ড অফিস শীতলক্ষ্যার তীরে, বাজারে। নদীর এপারে-ওপারে বেশ কিছু বড় বড় কল-কারখানা। ওগুলো শাসনের সুবিধার্থে একদল খান সেনা বাজারসংলগ্ন হাইস্কুলটিকে ছাউনি করে নিয়েছে। নদীর ওপারে মিলের রেস্ট হাউসে আর একটি ছাউনি। বাঁধন খুবই শক্ত। তবু কোনো কোনো রাত্রে গুলিবিনিময় হয়। কোথা হতে কোন পথে কেমন করে মুক্তিফৌজ আসে, আক্রমণ করে এবং প্রতি আক্রমণ করলে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়, খান সেনারা তার রহস্য ভেদ করতে পারে না। কখনো কখনো খতরনাক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। হাটবাজারের লোকজন, মিল ফ্যাক্টরির শ্রমিক, দোকানদার, স্কুলমাস্টার, ছাত্র সকলকে কাতারবন্দি করে বন্দুকের নল উঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, 'মুক্তি কিধার হ্যায় বোলো।' এক উত্তর, ওরা জানে না।

অল্পদিন আগেই একটা খতরনাক ঘটনা ঘটেছে। বাজারের পশ্চিম-দক্ষিণে কয়েক ঘর গন্ধবণিক বাড়ুই জাতীয় হিন্দুর বাস। সে গ্রামের লোকেরা নদীর ঘাটে স্নান করে, কাপড় ধোয় এবং ভরা কলসি কাঁখে বাড়ি ফেরে। বাজারের অল্প দক্ষিণে ওদের ঘাট। ছায়াঘন বাঁশঝাড়, সুপারিগাছ, কলাগাছ, পানের বরজ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের অপ্রশস্ত সড়ক এঁকেবেঁকে এসে নদীঘাটে নেমেছে। খান সেনারা বাজারের উত্তরে স্কুল ঘরে। হাট-বাজার এখন আর তেমন জমে না। খান সেনাদের গতিবিধি ও অবস্থানের খোঁজখবর নিয়ে বউঝিরা ঘাটে আসে। খোঁজখবর নিয়েই সেদিন মধ্যাহ্নে ঘাটে এসেছিল গরিব বিধবা হরিমতি এবং তার যুবতী মেয়ে সুমতি। জায়গা-জমি নেই। ওরা রাতভর ঢেঁকিতে চিড়া কোটে, দিনে মুড়ি ভাজে। চিড়া-মুড়ি বেচে ওরা দিন গুজরান করে। অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকিয়ে যায়, এ রকম একটা কথা আছে। দুর্ভাগ্য ওদের; সবে ভরা কলসি কাঁখে আর্দ্র বস্ত্রে নদীর ভাঙ্গনতি ভেঙে ওপরে উঠে বাড়ির পথ ধরেছে ঠিক সে সময়টাতেই পাঁচজন যমদূতের চোখে পড়ে ওরা– মা মেয়ে। বন্দুক কাঁধে পাঁচজন খান সেনা সড়কপথে দক্ষিণ দিক থেকে এসে উপস্থিত হয় চৌরাস্তার সংযোগস্থলে।

হরিমতি ও সুমতি মাটির কলসি কাঁখ থেকে ফেলে পশ্চিম দিকে দৌড়! দৌড়! ছায়াঘন আঁকাবাঁকা পথে ওরা জীবনপণ দৌড়োচ্ছে তো দৌড়োচ্ছেই। আত্মরক্ষা করতেই হবে।

বন্দুক কাঁধে নিয়েই খান সেনারা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে। হরিমতি ও সুমতি একনজর পশ্চাদ্দিকে তাকিয়ে আরও বেগে দৌড়ায়। আশপাশের লোকজন ওই দৃশ্য দেখে বাড়িঘর ছেড়ে ঝোপে জঙ্গলে আত্মগোপন করে। পোয়াতি মেয়েরা ক্রন্দনরত শিশুর মুখ চেপে ধরে। আর্দ্র বস্ত্রে মাইলখানেক দৌড়োবার পর মা মেয়ে দু-জনের একজনও আর দৌড়োতে পারে না। রাস্তার ডান দিকে প্রাইমারি স্কুল। আশ্রয়ের আশায় ওরা স্কুলঘরে প্রবেশ করে।

স্কুলঘর জনপ্রাণীশূন্য। দেয়ালে টাঙানো ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি মাটিতে কষা একটা অর্ধসমাপ্ত অঙ্ক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। একটা ছুঁচো ইঁদুর ওদের দেখে পালিয়ে যায়। চার চারটা দরজা এবং সবগুলো জানালা খোলা। হরিমতি, সুমতি ঢুকে দম নেয়ার আগেই খান সেনাদের বুটের দাপট শুনতে পায়। ওরাও কিছুক্ষণ দম নেয়। চারিদিকে প্রাচীর। সশস্ত্র শিকারি এবং শিকার দুটোই ভেতরে। কিছুক্ষণ মা মেয়ের আর্তনাদ ওঠে। পরে নিঃশব্দ হয়ে যায় স্কুলঘর। হরিমতি সুমতিকে ওরা হত্যা করে না। রক্তাক্ত অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে খান সেনারা রাইফেল কাঁধে স্কুলঘর ত্যাগ করে।

রাস্তায় পড়ে কয়েক পা এগোতেই গুলির শব্দ হয়। কোন দিক থেকে আসছে ঠাহর করার আগেই একজনের মাথার খুলি উঠে যায়। 'মুক্তি আ গিয়া, ইয়া আলী' চিৎকার করতে করতে বাকি চারজন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়। আরও একজনের ঊরুর মাংস ছিঁড়ে গুলি বেরিয়ে যায়। নিহত সঙ্গীকে পশ্চাতে ফেলে রেখে বাকি চারজন কোনোক্রমে ছাউনিতে ফিরে আসে।

সেদিন থেকে এলাকায় মুক্তিফৌজ নিধন কাজ শুরু হয়। রোজ দল বেঁধে বেরোয় খান সেনারা। বাজারে মিলিটারি ঢোকার পর থেকেই কলিমদ্দি দফাদারের ওপর বোর্ড অফিস খোলার ভার পড়েছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান মিলিটারির ভয়ে পারতপক্ষে এদিকে আসেন না। মেম্বারগণও আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু বোর্ড অফিস নিয়মিত খোলা রাখার হুকুম জারি আছে। কলিমদ্দি এ কাজ করার জন্য বাজারে আসে। খান সেনারা ওকেই ওদের অভিযানের সঙ্গী করে নেয়। সে সরকারি লোক, নিয়মিত নামাজ পড়ে এবং যা হুকুম হয় তা পালন করে। সুতরাং সন্দেহের কারণ নেই।

সেদিন থেকে দফাদার দিনের বেলা বাড়ি যেতে পারে না। বাজারেই খেতে হয় তাকে। খাওয়ার জন্য রোজ তিন টাকা পায় সে। খান সেনারা কি তাকে রাজাকারে ভর্তি করে নিয়েছে? কলিমদ্দি তার কিছু জানে না। সে তার স্বাভাবিক হাসিমুখে খান সেনাদের সঙ্গী হয়ে যেদিক যেতে বলে যায়। সে আড়-কাঠি, আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া তার ডিউটি। বাজারের লোকজন কখনো কখনো তাকে অনুযোগ দেয়, দফাদার ভাই আপনেও?

কলিমদ্দি স্মিত হেসে সহজ উত্তর দেয়, আমি ভাই সরকারি লোক, যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি। এর বেশি একটি কথাও তার মুখ থেকে বের করা যায় না।

বুধবার। আশপাশে কোথাও হাটবার নেই। সকাল দশটায় কলিমদ্দি দফাদারের ডিউটি পড়ে। আজ ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা সড়কপথে পশ্চিম দিকে মুক্তিবিরোধী অভিযান। আট-দশজন সশস্ত্র খান সেনা। কলিমদ্দি আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যস্থান গ্রাম। সেখানে নাকি বহু হিন্দুর বাস, আরও হিন্দু বাইরে থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুসলমানগুলোও ভারতীয় চর– কাফেরদের সঙ্গে এক জোট। আজ ওই গ্রামটা শায়েস্তা করতে হবে। আগুন দেয়ার মালমসলা, অস্ত্রও সঙ্গে আছে।

বেলা এগারোটা। মাঠের ওপর দিয়ে অপ্রশস্ত মেটে সড়ক। মাঠ পেরিয়ে একটি ছোট গ্রাম। তারপরেই লক্ষ্যস্থল।

চকচকে রোদ। সড়কের উত্তরে রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে গামছা-পরা এক কিশোর তিন চারটে গরু খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় ছালা বোঝাই ঘাস। কাঁধে লাঙল-জোয়াল। সম্ভবত সে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। 'মুক্তি! মুক্তি!' একজন সৈনিক চিৎকার করে ওঠে।

'কাঁহা? কাঁহা?'– অপরেরা প্রশ্ন করে।

'ডাহনা তরফ দেখো।'

কলিমদ্দি দফাদার সবিনয়ে বলতে চায়, 'মুক্তি নেহি ক্যাপ্টিন সাব, উয়ো রাখাল হ্যায়, মেরা চেনাজানা হ্যায়।' 'চুপ রাও সালে কাফের কা বাচ্চা কাফের। মুক্তি, আলবৎ মুক্তি।' বলেই সকলে একসঙ্গে গুলি ছোড়ে। এলাকা কেঁপে ওঠে। ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

কলিমদ্দি দফাদারের বাল্যকালের পাতানো দোস্ত সাইজদ্দি খলিফার ষোল বছরের ছেলে একবার মাত্র 'মা' বলে। ধরাশায়ী দেহটা থেকে আর কোন ধ্বনি কানে আসে না।

'এক মুক্তি খতম। আভি সামনে চলো দফাদার।'

'জি, হুজুর,' বলে সে হুকুম পালন করে।

ইতোমধ্যে খান সেনাদের পশ্চিমমুখী অভিযানের সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। গোলাগুলির শব্দ শোনার পর আশপাশের লোকজন ঘরবাড়ি ফেলে যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করে। মাঠ পাড়ি দেয়ার আগেই সামনের গ্রাম সাফ হয়ে যায়।

পরের গ্রামে সেদিনের মূল যুদ্ধক্ষেত্র। সে গ্রামের পশ্চিমে অথই জলের বিস্তীর্ণ মাঠ। পানির ওপর বাওয়া ধানের সবুজ শীষ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্য ধান-ক্ষেতের ওপর দিয়ে নাওদাঁড়া। গ্রামবাসীরা উঠিপড়ি নাও–কোন্দা বেয়ে অথই পানিতে ভাসমান উদ্ধত ধানের শীষের আড়ালে আত্মগোপন করে। যারা নাও-কোন্দা পায় না তারা বিলে নামে এবং মাথার ওপরে কচুরিপানা চাপিয়ে নাক জাগিয়ে ডুবে থাকে।

মুক্তি নিধন অভিযান এগিয়ে চলে। সামনে একটি লোকও পড়ে না। বাড়িঘর জনশূন্য, কলেরা মহামারীতে বিরল জায়গার মতো মনে হয় পল্লি। হাঁস-মোরগ কুকুর-বিড়ালও গোলাগুলির শব্দ শুনে আত্মগোপন করেছে। দড়িতে বাঁধা ছাগল-গোরু দু-চারটা দেখা যায়।

'ইয়ে বকরি বহুত খুবসুরত আওর তাজা, ওয়াপস জানে কে ওয়াকত... সমজে ...' খান সেনাদের একজন সঙ্গীদের বলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক ফিস্ট হু জায়েগা,' অন্যেরা হেসে সমর্থন জানায়। ওরা পথের দু-ধারের বাড়িঘরে উঁকিঝুঁকি এবং ঝোপে জঙ্গলে গুলি ছুড়ে হদ্দ হয়। একজন মুক্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না।

বেলা তখন বারোটা, হঠাৎ কমান্ডার নির্দেশ দেয়, 'হল্ট! এক, দো!'

সামনে কাঠের পুল। দু-দিক থেকে তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে খাড়া হয়ে কিছু দূরে ওঠার পর মাঝভাবে সমতল, নিচে প্লাবিত খাল এবং দু-দিকের বাওয়া ধানের ক্ষেত, উদ্ধত ধানের শিষ পানির সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলছে। পুলের উত্তর-দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় খাল এবং প্লাবিত ধানক্ষেত এঁকেবেঁকে স্থানে স্থানে অশ্বখুরের আকারে ভিতরে প্রবেশ করে এগিয়ে চলেছে। পুলের ওপর দিয়ে মানুষ এবং ছাগল-গরু পারাপার হয়, নিচ দিয়ে চলে নাও-কোন্দা। ঘন গাছপালা-বেষ্টিত দু-পারের গ্রাম বেশ উঁচুতে। নবাগতের কাছে পার্বত্য অঞ্চল মনে হতে পারে। আসলে এটাই ভাওয়াল পরগনার ভূমিবিন্যাস বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় লোকদের কাছে উঁচু টিলাগুলো টেক নামে পরিচিত।

যুদ্ধস্থলরূপে নির্দিষ্ট সামনের গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরবাড়ি এপারে দাঁড়িয়েও দেখা যায়। চৌচালা টিনের ঘরের টুয়া সুস্পষ্ট। পুলটা না পেরিয়ে ওগ্রামে প্রবেশ করার কোনো উপায় নেই। বর্ষাকালে গ্রামটা জলবেষ্টিত দ্বীপ। 'চলিয়ে হুজুর!' কলিমদ্দি দফাদার বলে।

'মগর! আওর কুই রাস্তা নেহি দফাদার?' কমান্ডার জিজ্ঞাসা করে।

'নেহি হুজুর! সেরেফ একহি রাস্তা। বাকি চারো তরফ পানি।' দফাদার জানায়। 'ইয়ে পুল আচ্ছা হ্যায়!'

'জি, হ্যাঁ, হুজুর, বহুত আচ্ছা হ্যায়। মানুষ গরু হামেশা পার হোতা হ্যায়।'

'মালুম হোতা পুলসেরাত। ঠিক হ্যায়; তুম আগে চলো দফাদার।'

'বহুত আচ্ছা হুজুর।'

কলিমদ্দি দফাদার পুলের ওপর ওঠে। দু-তিন বছর আগে কিছু ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে, কিছু গ্রামবাসীর চাঁদায় তৈরি তিন তক্তার পুল। প্রায় জায়গায় নাট-বল্টু ঢিলা হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় গায়েবও হয়ে গেছে। ধরে চলার জন্য দু-দিকে বাঁশের ধরনি নেই। কাঠের খুঁটির গোড়ায় পচন ধরায় স্থানে স্থানে বাঁশের ঠিকা দেয়া হয়েছে। ওর ওপর বিছানো তক্তাও নরম, পচেও গেছে দু-এক জায়গায়, কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে বিপজ্জনক নয়, আর যদি কখনও তক্তাসুদ্ধ নিচে পড়েই যায় কেউ সাঁতার কেটে পাড়ে উঠবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পুলের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে খালের জলে ঝাঁপুড়ি খেলে। আসলে পুলটা তেমন একটা নড়বড়ে নয়, মানুষ গরু ওপরে উঠলে কিছু কাঁপে– কাঁপালে আরও বেশি কাঁপে– কাঁপনি একটা সংক্রামক ব্যাধি কিনা তাই।

কলিমদ্দি এক-পা দু-পা করে অতি সাবধানে এগিয়ে যায় এবং পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আইয়েন হুজুর। হুজুরেরা ওপরে ওঠেন না, পুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কলিমদ্দির পা দু-টোর দিকে মনোযোগ দেয়। কলিমদ্দি দফাদার যত এগিয়ে যায়, তার পদযুগল নিপুণ অভিনেতার পদযুগলের মতো ঠকঠক কাঁপে, পুল কাঁপে দ্বিগুণ তালে।

ঊর্ধ্বারোহণ শেষে ওপরের সমতল জায়গাটুকু। সেখানকার তিন তক্তার একপাশেরটি পচে গেছে। তার একটি নাট-বল্টুও নেই। নিচের বরগাটির কানা জায়গাটাও ফেটে গেছে।

কলিমদ্দি দফাদার কী ভেবে নিচের দিকে একনজর তাকায়– খালের তীব্র স্রোত ছাড়া আর কোনো ঝামেলা নেই সেখানে। পরমুহূর্তে আর্তনাদের মতো কণ্ঠস্বরে 'মুক্তি মুক্তি' বলতে বলতে পচা তক্তাসমেত নিচে পড়ে যায়। খালের জলে একটা ঝুপ শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। পজিশন নিয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণের আগেই ধরাশায়ী হয় দু-তিনজন। তারপরেও কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, পলায়ন পথের দু-দিকে এলোপাতাড়ি। যে কজন যুদ্ধ করতে গিয়েছিল ছাউনিতে সে কজন অক্ষত ফেরে না।

কলিমদ্দিকে আবার দেখা যায় ষোলই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বাজারের চা স্টলে। তার সঙ্গীরা সবাই মুক্তি, সে-ই শুধু তার পুরনো সরকারি পোশাকে সকলের পরিচিত কলিমদ্দি দফাদার।

শব্দার্থ ও টীকা

কোন্দা – তালগাছ দিয়ে তৈরি নৌকা।

পুলসেরাত – ইসলামি ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পরকালের বিপজ্জনক সাঁকোবিশেষ।

দফাদার	–	গ্রামে পাহারায় নিয়োজিত চৌকিদারের সরদার।
বাড় বাড়া	–	ঔদ্ধত্য। বাড়াবাড়ি। স্পর্ধা।
‘আগুইনা’ চিতা	–	ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ।
খতরনাক	–	বিপজ্জনক। মারাত্মক।
গন্ধবণিক	–	মশলা-ব্যবসায়ী।
বাড়ুই	–	ঘরের চাল ছাওয়া মিস্ত্রি।
খান সেনা	–	খান পদবিধারী সেনা অর্থাৎ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।
ভাঙ্গুনতি	–	নদীর পাড়ের ভাঙনশীল অংশ।
মুক্তি আ গিয়া	–	মুক্তিবাহিনী এসে পড়েছে।
রাইফেল রেঞ্জ	–	রাইফেলের গুলিবিদ্ধ করার আওতা।
কাঁহা? কাঁহা?	–	কোথায়? কোথায়?
ডাইনা তরফ দেখো	–	ডান দিকে দেখ।
উয়ো রাখাল হ্যায়	–	ও হচ্ছে রাখাল।
মেরা চেনাজানা হ্যায়	–	আমার পরিচিত (আছে)।
আভি	–	এখন।
নাওদাঁড়া	–	নৌকা চলার ছোট খালের মতো পথ।
ইয়ে বকরি বহুত খুবসুরত আওর তাজা, ওয়াপস জানে কে ওয়াকত... সমজে...	–	এই বকরি ভারি সুন্দর আর তাজা, ফেরার সময়ে... বুঝেছ...।
এক ফিস্ট হু জায়েগা	–	একটা ভালো ভোজ হয়ে যাবে।
টুয়া	–	ঘরের চালের শীর্ষ।
মগর! আওর কুই রাস্তা নেহি দফাদার?	–	কিন্তু, অন্য কোনো রাস্তা কি নেই, দফাদার?
নেহি হুজুর! সেরেফ একহি রাস্তা। বাকি চারো তরফ পানি	–	না হুজুর! কেবল একটিই রাস্তা। বাকি চারপাশে পানি।
ইয়ে পুল আচ্ছা হ্যায়?	–	এই পুল কি ঠিক আছে?
মালুম হো পুলসেরাত	–	মনে হচ্ছে যেন পুলসেরাত।
ধরনি	–	ধরার অবলম্বন।
বরগার কানা জায়গা	–	আড়াআড়ি লাগানো কাঠের ভাঙা মুখ।

পাঠ-পরিচিতি

আবু জাফর শামসুদ্দীনের "কলিমদ্দি দফাদার" গল্পটি সংকলিত হয়েছে আবুল হাসনাত সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প-সংকলন 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' থেকে। এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ছবি এই গল্পে বর্ণিত না হলেও তাদের দুর্বার প্রতিরোধমূলক তৎপরতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম এলাকার আনসার, চৌকিদার-দফাদাররাও যে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ কৌশলে অত্যন্ত গোপনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল, সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে "কলিমদ্দি দফাদার" গল্পে। গ্রামবাংলার একজন সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় গল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আগুইনা চিতা কী?

ক. ঔষধ খ. উদ্ভিদ

গ. প্রাণী ঘ. ফল

২. খান সেনারা কলিমদ্দি দফাদারকে তাদের অভিযানের সঙ্গী করে নেওয়ার কারণ তার—

i. সাহসিকতা

ii. বিশ্বস্ততা

iii. ধর্মানুভূতি

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নূরুল আমিনের নির্দেশে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালায়। নূরুল আমিন ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তিনি এ দেশ ও জাতির বিপক্ষে ছিলেন।

৩. নিচের কোন চরিত্রটিতে নূরুল আমিন চরিত্রের বিপরীত মানসিকতা খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. সাইজদ্দি খলিফা খ. কলিমদ্দি দফাদার

গ. হরিমতি ঘ. কমান্ডার

৪. ৩ নং প্রশ্নে বিপরীত মানসিকতা বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. অন্ধবিশ্বাস খ. আনুগত্য

গ. দেশপ্রেম ঘ. দায়িত্বহীনতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘাঁটি বাঁধে গৌরনদী উপজেলা সদরে। রাজাকার আহাদ মোড়লের সহায়তায় তারা প্রায়ই গ্রামে হানা দেয়। গণহত্যা, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন ইত্যাদি হয়ে ওঠে নিত্যদিনের ঘটনা। বিষয়টি গভীরভাবে নাড়া দেয় কিশোর রাজুকে। সে সুযোগ খুঁজছিল প্রতিশোধ নেওয়ার। তাই সুযোগমতো একদিন সে মিশে যায় ওদের জন্য বাংকার খোঁড়ার দলে, অত্যন্ত গোপনে সেখানে পুঁতে রাখে একটি মাইন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বাংকারে ঢুকলে বিকট শব্দে সেটি বিস্ফোরিত হয়। দূর থেকে শোনা যায় ওদের আর্ত চিৎকার।

ক. কলিমদ্দি দফাদার লাঠি খেলার ঐতিহ্যস্বরূপ কোনটি ধারণ করে আছেন?

খ. কলিমদ্দি দফাদারকে নিপুণ অভিনেতা বলা হয়েছে কেন?

গ. কিশোর রাজুর কার্যক্রমে "কলিমদ্দি দফাদার" গল্পের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে জনতার অংশগ্রহণের যে চিত্র শিল্প-সত্য রূপে ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপক ও "কলিমদ্দি দফাদার" গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সৌদামিনী মালো
শওকত ওসমান

লেখক-পরিচিতি

শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যিক নাম। তাঁর জন্ম ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবল সিংহপুরে।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক শওকত ওসমানের সাহিত্যকর্ম তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন ও প্রগতিশীল ভাবধারার শৈল্পিক ফসল। শওকত ওসমান দীর্ঘদিন সরকারি কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষকতার আগে তিনি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

শওকত ওসমান গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, অনুবাদ ও শিশুতোষ রচনা মিলে আশিটিরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'বনি আদম', 'জননী', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'চৌরসন্ধি', 'রাজা উপাখ্যান', 'নেকড়ে অরণ্য', 'পতঙ্গ পিঞ্জর', 'জাহান্নম হইতে বিদায়' ইত্যাদি উপন্যাস; 'পিঁজরাপোল', 'প্রস্তর ফলক', 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' ইত্যাদি ছোটগল্পগ্রন্থ। 'ক্রীতদাসের হাসি' তাঁর ব্যাপক আলোচিত একটি উপন্যাস। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ফিলিপ্‌স সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

একটু দাঁড়াও।

আমার বন্ধু নাসির মোল্লা কোর্টের প্রাঙ্গণে হাঁটতে হাঁটতে হাতে হেঁচকা টান দিয়ে বললে।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার আছে। কোর্টের পেছনে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসা যাক।

আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা। খাজনাসংক্রান্ত একটা মামলা ছিল, তার পরের দিন। নচেৎ এখানে এই টন্নি-দালাল উকিল-মোক্তারের দঙ্গলে আর এক তিল দাঁড়াতে মন চায় না। কিন্তু আমার মামলায় তদবির, যুক্তি-পরামর্শ উকিলের দরদস্তুর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়ায় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হয়।

আমার আরও আপত্তি ছিল অন্য কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতটা বিলাত ঘুরে মক্কা আসার মতো। কোর্ট টিলার ওপর। পেছনে যেতে হলে এক ধাপ নিচে নেমে আবার ওপরে উঠতে উঠতে জান খারাপ। রীতিমতো হাঁপানি ধরে যায়।

তবু নাসিরের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমরা দুজনেই চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। এখনও সংসারের গেরো কাটেনি। আর সময় কাটবে কী করে? কিছু না কিছু কাজে লেগে থাকতেই হয়। নাসির পাকাপোক্ত লোক। তার হাতে হাত সঁপেই আমি নিশ্চিন্ত। এই ক্ষেত্রে আর ঘাড় বাঁকিয়ে জোয়ালের ভার আরও বাড়াতে রাজি নই।

কিন্তু টিলাপথে যথারীতি নেমে আবার ওপরে ওঠার সময় তামাশা দেখা গেল। আদালতের পেছনে এক ফালি মাঠের ওপর বেশ ভিড় জমে গেছে একটা পাদ্রিকে ঘিরে। যিশুখ্রিষ্টের সেবকটিকে আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সামনে টাক-পড়া মাথা, ফরসা লম্বাটে চেহারা। গলায় ক্রস ঝুলছে।

এ তো আমার চেনা লোক! ব্রাদার জন। নাসির হঠাৎ বলে উঠল।

আমরা ক্রমশ ওপরে উঠছি। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে নাসির উচ্চারণ করে, আরে তুমি চিনবে না। এ হচ্ছে ব্রাদার জন। একবার কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেট করার অপরাধে আমার কোর্টে ব্যাটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরে সে কাহিনি বলব। এখন পা চালাও, দুজনে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বৃদ্ধকালে পাহাড়-চড়া অত সহজ নয়।

অকুস্থলে দেখা গেল, লোকজন কম জমেনি। ব্যাপার কী? ব্রাদার জন তখন চিৎকার করছে, এই সম্পত্তি খুব ভালো আছে। Very good ভেরি গুড।

আমরা দুই কৌতূহলী দর্শক। গিজগিজ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

পাদ্রি হাঁকছে, দর্শকমণ্ডলী। আমি তখন নাসিরকে বললাম, বেশ বাংলা বলে তো।

বহুদিন এই দেশে আছে, বলবে না কেন? নাসির জবাব দিয়েই আবার পাদ্রির ওপর চোখ ফেলল। পাদ্রি হাঁকতে লাগল, দর্শকমণ্ডলী! এই সম্পত্তি খুব ভালো সম্পত্তি আছে। এক প্লটে বারো 'কানি' জমি। পুকুর। আরও আছে তিন একর জমির ওপর বসতবাড়ি, পুকুর, গাছপালা, দশটা নারিকেল গাছ, লিচুগাছ পাঁচটা আরও ফ্রুট-ফলের গাছ আছে। এখন নিলাম ডাকা হবে। প্রস্তুত–। ব্রাদার জন দম নিল।

কৌতূহলী শ্রোতা দর্শক এবার উৎকর্ণ। একজন নেপথ্যে জানতে চাইল, সম্পত্তি কার?

এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সৌদামিনী মালো সিস্‌টার।

আজব নাম!

পাদ্রি ব্যঙ্গ স্বর শুনে আরও বিনয় সহকারে ঈষৎ জোর-গলায় বলে উঠল, সৌদামিনী মালো চার্চের সিস্‌টার– বহেন, ভগ্নী ছিল। তিনি এক মাস হয় মারা গেছেন। চার্চ তার সম্পত্তি নিলাম করছে। শ্রোতাদের মধ্যে এবার একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, কারণ আকাশের রোদ্দুর বেশ নির্দয়। হঠাৎ গরম পড়ছে। নেপথ্যে একজন বললে, সাহেব জলদি করো।

অলরাইট উচ্চারণের পর ব্রাদার জন হেঁকে উঠল, সৌদামিনী মালো, সৌদামিনী মালো, তারই সম্পত্তি এবার নিলাম শুরু হবে। আমাদের পয়লা ডাক পাঁচ হাজার। তারপর আপনারা বিডিং করুন। 'হায়েস্ট বিডার' উচ্চতম মূল্যে যিনি ডাকবেন, তিনিই পাবেন।

পাদ্রির সঙ্গে দুজন কুলি শ্রেণির যুবক ছিল। তাদের দিকে চোখ ইশারামতো একজন হেঁকে উঠল, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার।

তার ডাকের মধ্যে জনান্তিকে একজন ডাক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ। পাদ্রির সহকারী হাঁকলে পাঁচ হাজার পাঁচশ। আর কেউ ডাকবেন। কিন্তু আর কারো হাঁকডাক শোনা যায় না। অবিশ্যি দর্শক-মধ্যে গুজগুজুনি চলছে নানা কথা। পাদ্রি-সহকারী আবার হাঁক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ-এক-পাঁচ হাজার পাঁচশ – দুই–। হঠাৎ একজন ডাক বাড়ালে, ছ-হাজার।

ভেরি গুড, ব্রাদার জন বলে উঠল। তার সহকারী ছ-হাজার ছ-হাজার রবে আরও কয়েকবার হাঁক দিলে। শেষে আর একজন ডাকিয়ে বাড়াল। সে সাত হাজার দাম তুলে দিলে।

আমরা বেশ মজা দেখছিলাম। কিন্তু বাড়তি টাকা তো নেই। পেনশনে যে কটা টাকা পাই তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। নচেৎ এত বড় সম্পত্তি পাওয়া যেত। বড় আফসোস হতে লাগল। দাঁড়িয়ে ছিলাম, সম্পত্তি কোন ভাগ্যবানের পাতে যায় তা দেখার জন্যে।

নিলাম জমে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু ন-হাজারের পর আর দাম শতে শতে লাফ দিয়ে যায় না। একজন ডাকলে ন-হাজার ন-শ পঞ্চাশ। আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়ল। দশ হাজার।

পাদ্রি-সহকারী হাঁক দিতে লাগল দশ হাজার এক – দশ হাজার দুই –। তারপর সে স্তব্ধ। জনতা নীরব। তিন বলার আগে একজন মাত্র পঁচিশ টাকা যোগ দিলে। দশ হাজার পঁচিশ।

ওদিকে রোদ্দুর বাড়ছে। বৃদ্ধকালে তবু কেন দাঁড়িয়েছিলাম? আজ বলতে লজ্জা নেই। হয়ত সম্পত্তির লোভে। ক্ষুধার্ত কালেভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত আরও পঁচাত্তর টাকা দাম বাড়ল। অর্থাৎ দশ হাজার একশ। বোঝা গেল, নিলাম ডাকিয়েদের পকেট শুকিয়ে যাচ্ছে। রস নাদারাৎ। যিনি শেষ পঁচিশ টাকা বাড়িয়েছিলেন, ভিড়ে তাঁকে দেখা গেল না। তবে হাত নাড়ছিল সে অপরের কাঁধের ওপর দিয়ে।

পাদ্রি-সহকারী হাঁক দিলে, দশ হাজার একশ–এক, – দশ হাজার একশ–দুই–। সে থামলে তারপর। পাঁচ ছ-মিনিট কেটে গেল। আর তিন উচ্চারণ করে না সে। এবার লোকটাকে দেখলাম, যে দশ হাজারের ওপর একশ বাড়িয়েছিল। মাঝবয়সী লোক, কিন্তু বুড়োবুড়ো ঠেকে। প্যান্ট-কোট-টাই সমন্বিত। মাথায় মখমলের টুপি। বাজি মেরে দিয়েছে, এই ভাব চোখেমুখে। কতক্ষণ আর নিলাম–ঘর চুপ থাকতে পারে? কিন্তু 'তিন' আর উচ্চারিত হয় না। দর্শক অধৈর্য। সেও জবাব চেয়ে বসল।

এখন বেশ মজা বেধে গেছে। কৌতূহলী দর্শক তাই দাঁড়িয়ে থাকে। রোদ্দুর সত্ত্বেও নড়ে না। ব্রাদার জনের মুখের দিকে তাকাই। সেখানে কালো আর ফিকে সবুজ রং খেলা করছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু একটা কাশি দিয়ে হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে উঠে সে হাঁক মারলে, দর্শকমণ্ডলী।

কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। নিলামদাতা এবার কী করবে।

ব্রাদার জন মুখ খুললে, যেন গির্জার পুলপিট অর্থাৎ প্রচারবেদি থেকে সার্মান দিচ্ছে এমনই কণ্ঠস্বর : ভ্রাতৃগণ, আজ নিলাম এখানেই রহিত থাকবে। আগামীকল্য পুনরায় ডাকা হবে। আজ লোক খুবই কম। কাল দশ হাজার এক শ হইতেই আরম্ভ হইবেক। আমেন।

দর্শকদের মধ্যে অনেক গুলতানি শুরু হলো। আর টুপিপরা সেই শেষ পোঁচ-মারা নিলাম-শিল্পী তো রেগেই খুন। ব্রাদার জনের চারদিকে জটলা পেকে গেছে। সেখানে ভদ্রলোক জোর গলায় বলছে, This is sheer hypocrisy এটা জোচ্চুরি... ইত্যাদি। আমার কৌতূহলের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ভিড়ের সান্নিধ্য এই ক্ষেত্রে আরামদায়ক। আমি তাই পা বাড়াই। নাসির আমার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললে, আরে ভিড়ে সেঁধিও না।

একটু মজা দেখে যাই।

–মজা দেখে আর কাজ নেই। যা গরম সর্দিগর্মি হয়ে মরব, চলো বাড়ি যাই।

–একটু দেখে যাই না।

–দেখে কাজ নেই। আমার কাছ থেকেই সব বৃত্তান্ত শুনে নিও। আকাশ সূর্য তখন দোজখের পিণ্ড বললেই চলে। আমি নাসিরের কথা মেনে নিলুম।

আবার চড়াই-উৎরাই। ওঠানামার ব্যাপারটা এমন কষ্টকর। নাসির হেসে বললেন, আরও মজা দেখতে গেলে আমাদের মাজা ভেঙে যেত।

রসিকতার দিকে আমার খেয়াল ছিল না। আমি বললাম, নাসির, ব্যাপার কী?

সে বেশ মাথা দুলিয়ে হঠাৎ ব্যঙ্গ আর ক্রূরতা-মাখানো এক রকমের হাসি ছাড়িয়ে শেষে মুখ খুলল, বাবা, এর নাম ব্রাদার জন।

জন?

হাঁ, ও এক জন বটে। আমার কোর্টে কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, What have you to say তোমার কী বলার? জন জবাব দিল End justifies the means. উদ্দেশ্য দিয়েই উপায়ের বিচার করা উচিত। আমি ব্ল্যাকমার্কেট করিয়াছি ভিক্ষুকদের লঙ্গরখানায় ভাত প্রদানের জন্য।

–অপরাধ স্বীকার করলে?

–হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাটা পাকা বদমাশ। আজ দেখলে না, কীভাবে ম্যানেজ করলে।

–কী ম্যানেজ?

–ওই সম্পত্তির দাম কমসে কম পঁচিশ হাজার। দশ হাজারে ছাড়তেই পারে না।

নাসির আমার দিকে মুখ কুঁচকে চোখ নাচিয়ে, জনের বাহাদুরির অবস্থাটা ফোটাতে চাইলে।

–কিন্তু সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি, আর নিলাম করছে ব্রাদার জন? এ ব্যাটারটা কী?

নাসির তার সাদাচুল মাথা দুলিয়ে চোখের কোনায় হাসি মাখিয়ে জবাব দিলে, সেটাই তো মজা।

–মজা?

–শোনো। সে অনেক কথা। ব্রাদার জনের মত চিজকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক বয়ান প্রয়োজন।

–তো বয়ান করো।

বেলার দিকে খেয়াল আছে? খেয়েদেয়ে এসো সন্ধ্যায় আমার বাড়ি, তখন সব সবিস্তার বলব ব্রাদার জন-সৌদামিনী মালো উপাখ্যান।

–না, অত দেরি করতে পারব না। খেয়ে একটু জিরিয়েই বিকেলে আসছি। বিকেলের চা তোমার ওখানেই খাব।

–বেশ।

কথায় কথায় আমরা রাস্তায় এসে পড়েছি। উৎরাই শেষ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাতে লাগলুম।

জানো সাজ্জাদ, ভাবছি কোথা থেকে আরম্ভ করব। ব্যাপারটা বেশ জটিল। নাসির মোল্লা এখন বুড়ো হয়ে এসেছে বলতে পারো। তাই ভয় পাচ্ছে। তবে শুরু করতে হয়।

সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধিবাসিনী। নবীগঞ্জে যে ব্যাপটিস্ট মিশন আছে, তারই কাছাকাছি। তুমি ওই অঞ্চলে কত দিন সার্কেল অফিসার ছিলে, জায়গাটা তো চেনই। অবিশ্যি তখন ওখানে মিশনের পাদ্রি ছিল ফাদার জনসন। লোকটা ভালোই। এদের আবার ভালোমন্দ কী? ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত পাকা করতে এদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, যেন দরকার মতো আউটপোস্টের কাজ করতে পারে। গরিব দেশে এখানে-ওখানে দু-চারটে দাতব্য ডিসপেন্সারি কি এক আধটা স্কুল চালায়। লোকেরা ভাবে, আহা কী সব দয়ার প্রাণ; ব্রিটিশরা ভালোই জানত, The nearest way to poor man’s heart is down their throat– ইংরেজরই প্রবাদ। ওরা এইভাবে কিছু কিছু খ্রিষ্টানও বানায়। তারা তো ইংরেজের খয়ের খাঁ বনে যেত। বলতে পারো– ইংরেজ বাহাদুর এমনভাবে কিছু দেশি বাচ্চা তৈরি করত। নদীয়ার কাছে তো কত মুসলমানকে ওরা এইভাবে খ্রিষ্টান করে ফেলে। পড়োনি নজরুলের ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’? আসলে এরা কেউ যিশুখ্রিষ্টের ভৃত্য নয়, এরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভৃত্য। হ্যাঁ, কোথা থেকে কোথা এসে পড়লাম। একটু ধৈর্য ধরে শোনো। বৃদ্ধকালে তাল রাখা দায়। কথায় কথায় অনেক দূর চলে গেছি।

হ্যাঁ, সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো ছিল পেশায় আরদালি। কিন্তু বেজায় তুখোড় লোক। প্রভুর মন জুগিয়ে চলা শিল্প সে বেশ রপ্ত করেছিল। যে কোনো অফিসারকেই খুশি করার পন্থা আবিষ্কারে দক্ষ জগদীশ মালো। ফলে, কলা-মুলো ভালোই পেত। বখ্‌শিসে মোটা পেট, এমন আরদালি তুমি দুটি খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি অবশ্যি তাকে দেখিনি। আমারও শোনা কথা। সস্তার বাজার। পুরা বেতন বাঁচল, তার ওপর উপরি ইনকাম। আর সে তো মিশরের সম্রাট হতে চায়নি। চেয়েছিল, গ্রামে দু-চার বিঘে জমি-জিরেত, একটু অনটন-মুক্ত দিন-যাপন। পনের-বিশ বছরের চাকরিতে জগদীশ তা পুষিয়ে নিলে। কিন্তু বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলেপুলে নেই। সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে, আর একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত; অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক। বংশ তো গুম করে দেওয়া চলে না? কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায়নি। হঠাৎ মরে গেল।

অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে। কু-লোকেরা রটিয়ে দিলে সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়েছে। বংশ রক্ষা হোক, কিন্তু অপরের সন্তানে নয়। সৌদামিনী ভিতরে ভিতরে হয়ত এমন একটা দুর্জয় পণ করে বসেছিল। এসব খোদাকেই মালুম। এসব ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে কী করে, বোঝা দায়। কিন্তু তুমি বলছ, স্বামীকে হত্যা করবে– তা অনুমান করা মুশকিল। মুশকিল কিছুই নয়। এমন হতে তো পারে। আমিও বলছি, গুজবের কথা। কারণ, এসব নিয়ে আর কোনো তদারক হয়নি। তখন সৌদামিনীর বয়স চল্লিশ পার। জগদীশ পঞ্চাশের সামান্য এদিক কি ওদিক। হয়ত যৌবনের খাঁই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে– তা সৌদামিনী মনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি। অতএব 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল' আচ্ছা। আমিও বলছি, অনুমানের কথা। যাক, ও-পাট চুকল। সৌদামিনী তখন একা। কিন্তু সেও হুঁশিয়ার মেয়ে। আর রবদব ছিল জোর। তখনও দেহ আছে, তার ওপর সম্পত্তি। গ্রামের দু-চার জন ছুঁচোর মতো হয়ত হোঁ হোঁ শব্দে ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু সৌদামিনী গোপনেও জগদীশেরই বউ হয়ে থাকল। অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। অবিশ্যি জগদীশ একটা কাজ করে যেতে পারত। কোনো আত্মীয়ের নামে সম্পত্তি লিখে পড়ে সৌদামিনীকে জীবনস্বত্বের অধিকারিণী করে দিতে পারত।

কিন্তু তা হওয়ার জো ছিল না। এক নিকট আত্মীয় ছিল জেঠতুতো দাদা। সে স্বদেশি করত। জগদীশ সরকারের পেয়ারের লোক। অন্য দিকে স্বদেশি বাবু। সাপে-নেউলে আর কী দিয়ে বন্ধুত্ব হবে। এসব কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে সব বুঝতে পারবে। জগদীশ তো মরল। কিন্তু জের কাটল না। বিধবার সম্পত্তির দিকে ওই আত্মীয়ের লোভ সহজে কি মেটে! অবশিষ্ট আট দশ বছর এইভাবে কেটে গেছে। স্বদেশি বাবুর নাম মনোরঞ্জন মালো। তারও বয়স হয়ে গিয়েছিল। ছেলেপুলে আছে। জেল-টেল খেটে গ্রামে ফিরে সে নামে স্বদেশি বাবু রইল। সাদা টুপিটা পকেটে গুঁজে অথবা দরকার হলে মাথায় দিয়ে সেও মন দিলে সংসার গোছাতে। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলান এবং তৎ-মত্ততার দুচার পয়সার দালালি বা টন্নিগিরি কমিশনে একটা আয়ের পথ তো খোলা যায়। এককথায়, স্বদেশি বাবুর শুভ্রতা তার টুপির মধ্যেই নিবদ্ধ রইল। পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং বিধবা বৌদির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। ভুল বললাম, বৌদি নয়, সম্পত্তির দিকে। কিন্তু সৌদামিনীর শরীর গৌর আর মুখ সুন্দর হলেও, কঠোর হওয়ার মতো যথেষ্ট তেজ ছিল। অবরে-সবরে এই মানুষ আবার হীরার চেয়ে শক্ত হতে পারে। যত বাগড়া তো সেইখানে। নচেৎ মনোরঞ্জন মালো কবে দুর্গ ফতে করে ফেলত। মনোরঞ্জন মালো প্রথম প্রথম কতগুলো স্ট্র্যাটেজি– পাঁয়তারা কষে নিলে। একদিন হয়ত সকালে দেখা গেল, সৌদামিনীর কলাবাগান থেকে কয়েক কাঁদি পাকা ফল গায়েব। কিছু চারাগাছ মাড়ানো। কিন্তু বিধবা পাড়াপড়শিদের খুব মিষ্ট ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে এল। আর কিছু না। তারপর মাঝে মাঝে রাত্রে সে বন্দুক ছুড়ত। কমিশনার সাহেব জগদীশকে নিজের বন্দুক দিয়েছিলেন বখশিসরূপে। অস্ত্রখানা তখনও সৌদামিনীর কাছে আছে। তাছাড়া তার তাক আশ্চর্য। বাড়ির উঠানে চিল ঢুকতে সাহস পায় না। মনোরঞ্জন ফেল মারলে। বৌদির চেহারা সুন্দর, কিন্তু তেজ তেমনি অপর্যাপ্ত। অবিশ্যি সৌদামিনীর হাতে কয়েকটা লোক ছিল। তার জমিনের চাষি, কয়েকজন। তারা বলত, মায়ের অন্নে প্রতিপালিত, মার তো অপমান হতে দিতে পারি নে। স্বদেশি বাবুর সেও একটা ভয়। ছোটো লোকগুলো কখন কী করে বসে, বলা যায় না। আর সৌদামিনীর অন্তর ছিল। বিপদে-আপদে সে বহু মানুষকেই সাহায্য করত। বেড়ার মধ্যে গেরস্থর মুরগি দেখলে জিভে জল-সরা শেয়াল যেমন ঘন ঘন তাকায় আর লোভের চোটে ছটফট করে, মনোরঞ্জন মালো সেই রকম অবস্থায় নতুন পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়। অবিশ্যি সময়ও এদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা মনে রেখো। বছর যাচ্ছে বছর আসছে। সৌদামিনীর চুল ক্রমশ সাদা, দেহে প্রৌঢ়ত্বের রেখা। কিন্তু আদাওতি ঠিক চলছে। সৌদামিনী বনাম স্বদেশি বাবু।

ঠিক এই পর্যায়ে দেখা দিল ব্রাদার জন। সে তো পরকালের চেয়ে ইহকালের খবর ঢের বেশি রাখে। তারপর মিশনের অবস্থা ভালো নয়। ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছিল। ফলে ডোনাররা আর খাত-মতো চাঁদা পাঠায় না বা হার দিয়েছে কমিয়ে। সুতরাং আয়বৃদ্ধির উপায় একটা করতেই হয়। ব্রাদার জন এলাকার খবর জানত।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কারণ, বাবু এলাকার সবচেয়ে ভালো ইংরেজি কইয়ে–বলিয়ে। ভাষা মারফত একটা অদৃশ্য যোগসূত্র গড়ে ওঠে। অবিশ্যি তখন পাদ্রির ভূমিকা তত প্রকট হয়নি। আর বাবুর সঙ্গে কী কথাবার্তা হতো তা খোদাকেই মালুম।

কিন্তু সৌদামিনী সকলের মুখে ছাই দিয়ে বসল।

ব্যাপারটা বলছি। সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আট-দশ-বিশ-মাইল দূরে দূরে তার মাতৃকুলের কিছু ভাইবোন কুটুম আছে। এক জায়গায় থেকে থেকে মানুষের প্রাণ তো হাঁপিয়ে ওঠে। সৌদামিনী বছরে এমন দু-একবার দম ফেলতে বেরুত। তখন ঘর পাহারা দিত তার চাষি এবং কামিনেরা। সৌদামিনী এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, ওরা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে আর কোনো আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এবার সে শুধু বেড়িয়ে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা বছর দুয়েকের শিশু। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আনা। পোষ্যপুত্র রাখবে সৌদামিনী। পোষ্যপুত্র? সম্পত্তির দিকে যারা চোখ রাখছিল, তারা এবার আকাশের দিকে চোখ তুললে। সম্পত্তির নতুন মালিক জুটে গেছে। আর শুধু মালিক নয়, চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারী। সৌদামিনী তাকে মানুষ করে তুলতে নিজের সামান্যতম আরাম পর্যন্ত বিলিয়ে দিলে। এবার সৌদামিনী জননী; যেন সদ্য আঁতুড়ঘর-ছাড়া। চব্বিশ প্রহর চোখে চোখে রাখতে লাগল ছেলেটাকে। নাম রাখলে হরিদাস। হরিদাস বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারাটা ফরসা, বেশ খাড়া নাক। আর চোখ দুটো ঝিলিকে ঠাসা। সৌদামিনী হরিদাসের মধ্যে জীবনের সমস্ত পূর্ণতার একটা প্রতীক খুঁজে পেলে যেন। বেশি বাইরে যেতে দিত না তাকে। কারণ, পাড়াপড়শির চক্ষুশূল। ওর জন্যে আলাদা একটা শিক্ষকই রেখে দিলো বাড়ি এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। আরও পাঁচ-ছ বছর এভাবেই কেটে গেল। সৌদামিনীর অবিশ্যি চুল পেকে গেছে। চেহারা নিষ্প্রভ। কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। সেই মুখের দিকে তাকালে তোমার চোখ খুঁজে পাবে স্নিগ্ধতা, দয়াসঞ্জাত এক রকমের তাপহর স্পর্শ। অবিশ্যি মনোরঞ্জন বসে নেই। তারও বয়স বাড়ছে। আর তৎসঙ্গে সংসার। অর্থাৎ সর্ব রকমের বোঝা। সম্পত্তির দিকে চাইলে এখন চোখ পুড়ে যায়। নতুন শরিক এসে জুটেছে। হরিদাসের বয়স বারো। একটা মেয়ে মানুষের কাছে হেরে যাবে মনোরঞ্জন মালো? একটা কিছু করতে হয়। ব্রাদার জনের মিশন চলছে না ঠিকমতো। রুজি-রোজগার প্রয়োজন। একদিন ওদিকে গেলে কিছু একটা যুক্তি করা যায়। মনোরঞ্জন মনে মনে এসব লঙ্কাভাগ করেছিল নিশ্চয়। আঁচ করতে পারো সাজ্জাদ। ... হ্যাঁ, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু। মনোরঞ্জন মালো এবার একটা বোম ফাটালে, স্বদেশি আমলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে থেকেও যা সে করতে সাহস পায়নি।

সে গ্রামময় প্রচার করে দিলে সৌদামিনীর পোষ্যপুত্র জাতে নমশূদ্র নয়, ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ। কী ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপকর্ম। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে এক শূদ্রাণী। রাম, রাম। মনোরঞ্জন এই ঢিলে পাখিকে কাত করে ছাড়লে। আগে শত্রুতা বা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গ্রামে দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ-কায়েত-মাহিষ্য ছিল, তারা দাঁতে আঙুল কাটলে। ছি ছি, এমন কথা কে কোনদিন শুনেছে। যাদের বয়স বেশি তারা মন্তব্য করল : কলি কাল। সৌদামিনীকে গ্রাম্য-সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। সে বেশ জোর দিয়ে হলপ্ করে বললে, হরিদাস শূদ্র– তার দূরসম্পর্কীয় এক গরিব আত্মীয়ের ছেলে। পরিস্থিতি আপাতত এখানে চুকল। কিন্তু সৌদামিনীর বিরুদ্ধে তো মনোরঞ্জন একা নয়। আরও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আছে। সুতরাং গ্রামের অচল নিষ্কর্মা প্রহর তারা সহজে যেতে দিলে না। খোঁজ নিয়েই দেখা যাক। যদিও বিশ মাইল দূরে, কিছু রাহা খরচ যাবে, যাক। আহা, ভগবান যাকে ডাক দেয় সে তো হেঁটে হেঁটে বারানসী চলে যায় তীর্থ করতে। এই দশ ক্রোশ পথ আর তারা সামাল দিতে পারবে না? বোঝা গেল ওদের সেবার ভগবান ডাক দিয়েছিল। একজন দেব-উৎসর্গিত প্রাণ বারোয়ারি রাহা–খরচে সৌদামিনীর সেই আত্মীয় বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে ফিরল। বাজিমাতা মজকুর ব্যক্তির কোনো ছেলেই নেই। সব মেয়ে। সৌদামিনী ঝুট বলেছে, মিথ্যাবাদিনী। সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে চায়। তো নচেৎ কল তো ভেঙে যেতে পারে। সৌদামিনী এবার তো বেশ রোয়াবের সঙ্গে জবাব দিলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করলে না। সমস্ত গ্রাম তার বিরুদ্ধে। আর জুলুম

শুরু হলো। তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না, দুধেল দুটো গাই হারিয়ে গেল। এমন ছোটোখাটো নিত্য নির্যাতন। একদিন ব্রাদার জন এই সময় গ্রামে এল। ইহকালের খবর সে পরকালের চেয়ে কম রাখে না, আগেই বলেছি। ব্রাদার জন সব শুনে গ্রামবাসীদের মিটিয়ে ফেলতে বলল ব্যাপারটা, সৌদামিনীর সামনেই। একটা ছেলে মানুষ করছে ... মানুষ ... সে শূদ্র আছে না কায়েস্ত আছে গড এসব দেখিতে বারণ করিয়াছে ... এই জাতীয় নানা বাণী ছাড়লে। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে ব্রাদার জনকে উকিল পাকড়ালে একটা মিটমাটের জন্যে। মনোরঞ্জন মালোর সঙ্গেও একপাশে চুপি চুপি কী কথা হলো তা ব্রাদার জনের গডই জানে। বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কিন্তু মনোরঞ্জন মালো তো সম্পত্তি নিষ্পত্তি চায়। ব্রাদার জন বললে, দুদিন সবুর করো, আমি ফয়সালা করিয়ে দিবে। আর মনে রেখ, সৌদামিনী এখন কোণঠাসা। এক হপ্তায় তার চুল শন হয়ে গেছে। আগে তো বুড়ি মনে হতো না, এখন তো শ্মশানযাত্রীর শামিল ধরে নিতে পার। বুড়ি সেই অবস্থায় ওকে যারা দেখেছিল, তাদের কাছেই শুনেছি। হরিদাস আর বাড়ির বাইরে যেত না। যেতে চাইলে সৌদামিনী কেঁদেকেটে বাধা দিত। চতুর্দিকে ঘোলাটে আবহাওয়া। ব্রাদার জন এই গ্রামে আসে কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করে না। শেষে কয়েকজন মরিয়া-ধর্মপুত্র তো একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল। কিন্তু শান্ত প্রকৃতির বুড়ো মানুষ এই ঈশ্বর-প্রাণ ব্যক্তিদের থামাল। সৌদামিনী বাপের বেটি। বাঘের দুধ খেয়েই বোধ হয় মানুষ– বেরিয়ে এল একদম নিরস্ত্র, যদিও বাড়িতে বন্দুক আছে। ক্ষিপ্ত জান্তার সামনে সে এবার বোমা ফাটাল। বোমাও বোধ হয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনী চোখ থেকে শিবের মতো আগুন ছড়িয়ে বললে... কী বললে শোন। তার কথাটাই মুখজবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর ওপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।

–শোন আভাগির ব্যাটারা, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের দল ... আমার হরিদাস শূদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন, কী। তোরা তো জানিস। আমি বছরে একবার-দুবার আত্মীয়বাড়ি যাই। তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, একদম পুরো কোটাল। গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার দু-হাজার লোক মরছে হপ্তায়। আমি ফিরছিলাম হরিশ্চক থেকে ... আলোকডাঙার কাছাকাছি আসতে বেহারাদের তেষ্টা লাগল। একটা আমগাছের তলায় পালকি রেখে ওরা গেল খেতে। পুকুর আছে, বিঘে দুই জমি দূরে। আমার সামনে আবার একটা ধানক্ষেত, ধান পেকে গেছে। আর পনের দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজের ক্ষেতের চাল খেয়ে; কিন্তু তা আর হলো কই। হঠাৎ শুনলাম, ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে। মুখে দাড়ি। তার পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে বসে মরা মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে; আবার উঠে বসছে। কিন্তু সেও চিঁচিঁ করছে। ধুঁকছে। ছেলেটার পানে চাইতে আমার দিকে হাত বাড়াল। চোখের চাউনি কী করুণ। আমিও অজানিতে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বছর তিনেকের ছেলে, কিন্তু অনাহারে অনাহারে দেড় বছরের বেশি দেখায় না। কোলে তুলে নিলাম ... নিয়ে এলাম ... পালকির ভেতরে লুকিয়ে রাখলাম ... আফিম খাই, সঙ্গে দুধ ছিল ... দুধ দিতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। বেহারারা টের পেলে না। এক আত্মীয়ের কাছে তিন মাসের জন্যে রেখে এলাম দুশ টাকা দিয়ে। ভালো খাওয়া দাওয়ায় ছেলেটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। তার পর নিয়ে এলাম। ওর আসল বাবা সেই মুসলমান চাষি ... আমার হরিদাস মুসলমান ... যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার ওপর।

রেশ কাটল কয়েক মুহূর্ত পর। কিন্তু সৌদামিনীকে কেউ একটা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেল না। তামাশা দেখতে দু-চার জন মুসলমান পর্যন্ত জুটেছিল। এখন ব্যাপার আরও গন্ডগোলে গড়াতে পারে, তাই ধর্মপুত্ররা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে। বুঝল আর গোলমাল বিধেয় নয়। ব্যাপার আরও থিতিয়ে দেখা যাবে।

মনোরঞ্জন অন্তত তা-ই ভেবেছিল। তাই ভেগেছিল।

সেই রাত্রে হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডাকিয়ে আনলে এক হপ্তা অপেক্ষার পর। সে খ্রিষ্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে, উপদেশ দিলে, ধর্ম ত্যাগ ভালো নয়। শোনা কথা বলছি। ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে 'আজ থাকলে হতো' বলার মতো।

সৌদামিনী খ্রিষ্টান হয়ে গেল। তিন চার দিনের মধ্যে তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখেপড়ে দিলে পর্যন্ত। নিজে উঠে গেল মিশনের বাড়িতে। ব্রাদার জন সম্পত্তি দেখার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ করলে। সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। বদলি হওয়ার আগে এক সিস্টারের মুখে শুনেছিলাম, সৌদামিনী কাঁদত আর চিৎকার দিত :

... আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে– হে যিশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার যবন হরিদাসকে ফিরিয়ে দে– ফিরিয়ে দে– ফিরিয়ে দে–

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

গেরো	– বন্ধন। বাঁধন।
টন্নি	– এটর্নি। আমমোক্তার।
মোগলের সাথে খানা খেতে হয়	– বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করতে হয়। পরিস্থিতির চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি দিতে হয়। ‘পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে’ – প্রবাদটির অনুসরণে রচিত বাক্যবন্ধ।
অকুস্থল	– ঘটনাস্থল।
উৎকর্ণ	– কান খাড়া করে আছে এমন।
বিডিং	– নিলামে দাম হাঁকা।
হায়েস্ট বিডার	– সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকিয়ে।
জনান্তিকে	– সংগোপনে। জনগণের আড়ালে।
গুজগুজুনি	– গুঞ্জন।
নাদারাৎ	– বিহীন। শূন্য। অভাব। নাই।
সার্মান	– গির্জার বেদি থেকে প্রদত্ত ধর্মীয় বা নৈতিক অভিভাষণ।
sheer	– পুরোদস্তুর। নির্ভেজাল।
hypocrisy	– কথায় এক কাজে আরেক। ভণ্ডামি। মোনাফেকি।
লঙ্গরখানা	– বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের স্থান। অন্নসত্র।
বয়ান	– বিবরণ। বর্ণনা।
ব্যাপটিস্ট মিশন	– খ্রিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচার ও দীক্ষা কেন্দ্র। baptist mission.
সার্কেল অফিসার	– কার্যক্রম পরিমণ্ডলের কর্মকর্তা। circle officer.
খাঁই	– কামনা-বাসনা। উচ্চাভিলাষ। চাহিদা।
রবদব	– জাঁকজমক।
অবরে-সবরে	– সময়ে-অসময়ে।
ফতে	– জয়।
স্ট্র্যাটেজি	– লক্ষ্য ও সাফল্য অর্জনের কৌশল বা নীতি। strategy.

আদাওতি	–	শত্রুতা। বিদ্বেষ।
ডোনার	–	দাতা। donor.
মালুম	–	অনুভূত। বোধগম্য। আগত।
কামিন	–	নারী শ্রমিক।
তাপহর	–	উত্তাপ দূর করে এমন।
মাহিষ্য	–	কৈবর্ত জাতি।
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির	–	ব্যঙ্গ অর্থে সত্যবাদিতার ভানকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদী বা রটনাকারী।
বারোয়ারি রাহা খরচে	–	সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে সংগৃহীত পথ খরচে।
মজকুর	–	পূর্ববর্ণিত।
রোয়াব	–	সম্ভ্রম।
কায়েত	–	কায়স্থ।
জান্তা	–	জোর করে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক চক্র। এখানে আক্রমণকারী।
মুখজবানি	–	মুখের ভাষায়।
কোটাল	–	অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সমুদ্র বা নদীতে জলস্ফীতি। ভরা জোয়ার। এখানে সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত।

পাঠ-পরিচিতি

"সৌদামিনী মালো" গল্পটি শওকত ওসমানের 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৪) থেকে সংকলিত হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ত মানবাত্মার যে অবমাননা চলছে তারই একটি দিক ফুটে উঠেছে শওকত ওসমানের "সৌদামিনী মালো" গল্পে। অর্থ সম্পদ লালসা যে মানুষকে কীভাবে অন্যায় ও দুষ্কর্মের পথে চালিত করে, হীন উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করতে তাড়িত করে, এমনকী সাধারণ মানুষের ধর্মবোধকে প্ররোচিত করে মানবতার বিরুদ্ধে তারই অন্যতম রূপচিত্র ফুটে উঠেছে এই গল্পের কাহিনিতে। বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি মালো সম্প্রদায়ের নিঃসন্তান বিধবা সৌদামিনী স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে ধানি জমি, বসতবাড়ি, পুকুর, ফলের বাগানসহ কয়েক একর সম্পত্তির মালিক হয়। এই সম্পত্তির ওপর নজর পড়ে সৌদামিনীর জ্ঞাতি দেবর মনোরঞ্জনের। মনোরঞ্জন ছলে-বলে কৌশলে সম্পত্তি নিজের হস্তগত করার চেষ্টা করলেও দৃঢ়চিত্ত সৌদামিনীর সাহস ও লোকপ্রীতির কারণে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সন্তানহীনা প্রৌঢ়া সৌদামিনী তার মাতৃহৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য দূর কোন দেশ থেকে যখন একটি শিশুকে এনে সন্তানবৎ পালন করতে থাকে তখন মনোরঞ্জন নমশূদ্রর ঘরে ব্রাহ্মণ সন্তান পালিত হচ্ছে এই মিথ্যা বক্তব্য প্রচার করে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজের ধর্মানুভূতির ধুয়া তুলে সৌদামিনীকে সমাজচ্যুত করার উদ্যোগ নেয়। সমাজপতিদের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত সৌদামিনী তার পালিত পুত্র যে মুসলমানের ঔরসজাত এ সত্য প্রকাশ করতে এবং স্বধর্মত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সৌদামিনীর জীবনে গভীর ট্র্যাজেডি নেমে আসে, যখন তার পালিত পুত্র হরিদাস জানতে পারে যে সৌদামিনী তার মা নয়। আর এ কথা জেনেই সে নিরুদ্দিষ্ট হয়। অচিরেই সৌদামিনীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। মানুষের লোভ ও ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয় বলিপ্রাপ্ত হলেও তার মাতৃহৃদয়ের হাহাকারের মধ্যেও ধ্বনিত হতে থাকে মানবতার জয়গান; তার মাতৃত্বের কাছে ধর্ম, অর্থ ও অপর সকলের পরাভব ঘটে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আদালত কোন জায়গায় অবস্থিত?

ক. পাহাড়ের ওপর খ. টিলার ওপর

গ. সমতল ভূমিতে ঘ. নদীর ধারে

২. 'অগত্যা মোগলের সাথে খানা খেতে হবে'– এখানে কাকে মোগল বলা হয়েছে?

ক. উকিলকে খ. নাসিরকে

গ. ব্রাদার জনকে ঘ. কৌতূহলী শ্রোতাকে

নিচের গল্পাংশ পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

গফুর মিয়া কাতর স্বরে তর্করত্নকে বলেছিল, অবলা জীব মহেশ আমার না খেয়ে মরে যাচ্ছে। দিন না কাহন দুই খড়। যেভাবে পারি শুধব বাবা। একথা বলে সে তর্করত্নের পায়ের কাছে দপ করে বসে পড়ল। তর্করত্ন তিরবৎ দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বলল– আ মর! ছুঁয়ে ফেলবি নাকি।

৩. গল্পাংশে গফুরের সাথে "সৌদামিনী মালো" গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে–

ক. হরিদাসের খ. জগদীশের

গ. সৌদামিনীর ঘ. মনোরঞ্জনের

৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

i. অসহায়ত্ব

ii. বাৎসল্য

iii. প্রতিকূলতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বর্গাচাষি মনিরের সামান্য জমিটুকুও কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছে জাগে প্রভাবশালী রশিদের। তাই তা কেনার প্রস্তাব দিলে মনির তার পৈতৃক এ সম্পত্তি বিক্রি করতে অসম্মতি জানান। সেদিন থেকে রশিদ তাকে কারণে-অকারণে নাজেহাল করেন। তার ছেলেকে স্কুল থেকে বের করে দেন। এমনকি মিথ্যা দেনার দায়ে তাকে ভিটেছাড়া করেন। চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে অবশেষে মনির সবই ফিরে পান।

ক. ব্রাদার জন-এর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর কারণ কী?

খ. "ইংরেজ বাহাদুর এমনভাবে কিছু দেশি বাচ্চা তৈরি করত"– বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ. রশিদের আচরণে "সৌদামিনী মালো" গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে "সৌদামিনী মালো" গল্পের একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র, সমগ্রতা প্রকাশ পায়নি —মন্তব্যের যথার্থ্য যাচাই কর।

চেতনার অ্যালবাম
আবদুল হক

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ আবদুল হক। বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার উদয়নগর গ্রামে ১৯১৮ সালের ১০ই অক্টোবর মাসে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম সহিমুদ্দিন বিশ্বাস এবং মাতার নাম সায়েমা খাতুন। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁকে শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে হয়েছে। তিনি কানসাট, টাঙ্গাইল, রাজশাহী ও কলকাতায় পড়াশোনা করেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পর তিনি সবশেষে বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান-পর্বে আবদুল হক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে ক্ষুরধার লেখা লিখে 'কলম-সৈনিক' উপাধি লাভ করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ১৯৪৭-পূর্বকালেই তিনি কলম ধরেন এবং এ বিষয়ক প্রথম লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান। সরকারি কর্মচারী হয়েও বেনামে সরকারবিরোধী লেখায় তিনি যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেন তা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মুক্তবুদ্ধি, বিজ্ঞানমনস্কতা, শানিত যুক্তি, বক্তব্যের সাবলীল উপস্থাপন প্রভৃতি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের তিনি এক যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত হন। প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি লিখেছেন কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক। ইবসেনের নাটক অনুবাদেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে আছে: 'ক্রান্তিকাল', 'সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা', 'ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব', 'নিঃসঙ্গচেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'চেতনার অ্যালবাম ও বিবিধ প্রসঙ্গ'। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্যক্তির চেতনা এই জীবনকালেই প্রথম আর শেষ কথা, কিন্তু সমগ্র মানবীয় চেতনা নয়। মানবীয় চেতনা ব্যক্তিমানুষের তুলনায় ছোটখাটো বিষয় নয়, বেশ দীর্ঘকালীন ব্যাপার। ব্যক্তির মধ্যে এই চেতনার প্রকাশ ঘটলেও মানবসমাজে এর ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। নানারূপ মহাজাগতিক কারণে একদিন গোটা মানবজাতিরই বিলুপ্তি ঘটবে; দৈব দুর্ঘটনায় অকালে না ঘটলেও স্বাভাবিকভাবে একদিন ঘটবেই, বৈজ্ঞানিকগণ এ-রকম কথা বলে থাকেন। এই পৃথিবীতে প্রাণীর এমন অনেক প্রজাতি ছিল যা এখন বিলুপ্ত; কোনো কোনো প্রজাতি কোটি বছর এবং তারও অধিককাল যাবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়িয়েছে তবু তারা আর নেই, কঙ্কাল দেখে তাদের অস্তিত্বের কথা জানতে হয়। একদিন তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তেমনি মানবজাতির ভাগ্যেও ঘটবে। কিন্তু এত দীর্ঘদিন পরে ঘটবে যে সেজন্য আজই মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষেরই একদিন মৃত্যু ঘটবে আর সেটা সবাই জানে, কিন্তু সেজন্য কয়জন মানুষ মন খারাপ করে বসে থাকে? সীমাবদ্ধ কালের প্রাণী সে, যে-অর্থেই ধরা যাক : তথাপি অনন্তকালের কথা সে ভাবে। ভাবে, কেননা ওটা তার নিয়তির সঙ্গে বাঁধা।

এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো। প্রবীণতার পথে ব্যক্তি-মানুষের যেমন একদিন স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, তেমনি প্রবীণতার পথে নবপ্রজাতিরও একদিন বিলোপ ঘটতে পারে; তবে অধুনা এটাও মনে হচ্ছে সে অকস্মাৎ আত্মহত্যাও করে বসতে পারে হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা অথবা আরও বিধ্বংসী কোনো মারণাস্ত্র প্রয়োগে। অধুনা এই পথে মানবপ্রজাতির বিলোপের আশঙ্কা বিলক্ষণ বিদ্যমান, সেই আশঙ্কার কথা বাদ দিয়েই আমার এই প্রসঙ্গ।

ধরা যাক, যেমন করেই হোক সব দুর্ঘটনা এড়িয়ে মানুষ বেঁচে-বর্তে রইল। কিন্তু তখন যে-সমস্যা দেখা দেবে তা হচ্ছে মানুষের বহুবিচিত্রমুখী জ্ঞানভাণ্ডারের সমন্বয় সাধন। মানুষ ক্রমাগত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান (শিল্প-সাহিত্যসহ) সৃষ্টি করে চলেছে। যে-কোনো বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানের আবার ইতিহাসও আছে। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গেও তার সম্পর্ক থাকে, অনেক সময় সে-সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটি জানতে হলে আরেকটির অন্তত কিছু অংশ জানতে হয়। এ নিয়ে সমস্যা হয়ত এখনও দেখা দেয়নি; যদিও সম্ভব তবু ধরা যাক একুশ অথবা বাইশ শতকেও সমস্যা হয়ত দেখা দিল না, কিন্তু মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার শনৈঃ শনৈঃ যে হারে বাড়ছে তাতে কয়েক হাজার বছর পরে একদিন সমস্যা

দেখা দেবেই : সেটা হচ্ছে স্মৃতির সমস্যা। স্মৃতি দিয়েই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা। সাধারণ মানুষ আজ পর্যন্ত মোটামুটি যে-ইতিহাস জানে–সব কথা নয়, মানুষের মোটামুটি যে ইতিহাস জানে–তা হচ্ছে পাঁচ-ছয় হাজার বছরের ইতিহাস। আরও জানে তার আগেকার মানুষের ইতিহাসের কয়েকটি রেখার পরিচয় মাত্র। মানুষ তখন ঘর-সংসার শুধু করেনি, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। তারপর গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে অনেক হাজার বছর ধরে। অলিখিত সে ইতিহাস। নানা সূত্রে সে-ইতিহাসের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েক হাজার বছর থেকে মানুষের সে-ইতিহাস তা ক্রমেই বর্ধিত পরিমাণে লিখিত ইতিহাস; যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস শুধু নয়, মানুষের সবরকম জ্ঞান ও সংস্কৃতির ইতিহাস। আর এই লিখিত ইতিহাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় জ্যামিতিক হারে। একজন মানুষের পক্ষে সারাজীবনে এই ইতিহাস জানাই দুরূহ হয়ে উঠেছে, মানুষ তাই এখন জানছে শুধু বিশেষীকৃত ইতিহাস। এক হিসাবে বলা চলে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে এসে ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং একটা বিশ্বসংস্কৃতি রূপলাভ করছে, তার নতুন-নতুন রূপলাভ ঘটছে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায়। অন্য হিসাবে বলা চলে মানুষের জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ ক্রমেই বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং যতদিন যাবে ততই অপরিমিতরূপে বিভক্ত হয়ে যাবে। সব স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের ক্ষেত্রেই এটা ঘটছে, কোনো সমাজই তার সংস্কৃতিসহ একই রকম চিরদিন থাকছে না। সেই সঙ্গে সমাজের মানসিক সম্পদ–তার সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি একই রকম থাকছে না। জীবন্ত সংস্কৃতির সব ধারা জীবন্ত থাকছে না, অনেক ধারার মৃত্যু ঘটছে, এমনকি এক সংস্কৃতির বিলুপ্তির পর আরেক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটছে। যেমন ব্যক্তির তেমনি এক-একটি সমাজের মৃত্যু ঘটছে, জাতির মৃত্যু ঘটছে, কিন্তু মানবীয় ধারা বেঁচে থাকছে, মানবীয় সংস্কৃতি বেঁচে থাকছে। কিন্তু যে-সব সংস্কৃতি, সমাজ অথবা জাতির মৃত্যু ঘটছে তারা মৃত্যুর পর ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে এবং শুধু ইতিহাস হিসাবেই বেঁচে থাকছে।

এই ইতিহাসের স্মৃতির ভার একদিন মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠবে মনে হয়। দীর্ঘ দীর্ঘকাল পরে এই ইতিহাসকে জানতে হলে সব জ্ঞানার্থীকে একদিন ছবির অ্যালবামের মতো দ্রুত পাতা উল্টিয়ে যেতে হবে শুধু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে দেখার অবসর থাকবে না। এক-এক রকম জ্ঞানের জন্য থাকবে এক-এক রকম অ্যালবাম। কিন্তু এই উপমার মধ্যে কিছু ফাঁকি আছে। অ্যালবাম তো শুধু দেখার জন্য, কিন্তু অ্যালবাম বলে বর্ণিত মানুষের এই ইতিহাস দেখার জন্য নয়, পড়ার জন্য; কেননা না পড়লে অতীতের কিছুই জানা যায় না। অতীতের যা-কিছু বেঁচে থাকে তাকে ভালো করে জানতে হলে শুধু দেখলে চলে না, অথবা দেখার বিশেষ কিছু থাকে না, পড়তে হয়। কিন্তু কী পড়বে তখনকার মানুষ? গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, না এইসবের ইতিহাস? কোনো ভাষার কীর্তিমালার ইতিহাস? আমরা এখন একটি অথবা দুটি অথবা কয়েকটি ভাষার কয়েকটি কীর্তিমালার কথা ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারি মাত্র। কিন্তু আমাদের নিজেদেরই ভাষার অন্তর্গত সাহিত্যের একটা বড় অংশকে আমরা প্রায় জানি না, কেবল রুচির জন্য অথবা কালের দূরত্বের জন্য। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে নিয়ে সেই কথা। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এমনই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে, একদিন কোনো একজন মানুষ হয়ত অনেক বিষয়েই সাধারণ জ্ঞানও রাখতে পারবেন না, একটি বিষয়ে সুপণ্ডিত হলেও অন্য বিষয়ে তিনি নিতান্ত অজ্ঞ থেকে যাবেন। এমন দিনও আসতে পারে যখন মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না। এখনই তো কোনো উচ্চশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আইনস্টাইন অথবা অ্যাস্ট্রোনমির সর্বশেষজ্ঞাত জ্ঞানের সঙ্গে চিন্তার সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারেন না।

এদিক দিয়ে অশিক্ষিত অসংস্কৃত মানুষদের সুবিধা। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, উৎপাদন এবং প্রজননের মধ্যেই তাদের জীবন, তারা স্মৃতির ভারে পীড়িত নয়, কৌতূহলের উত্তেজনায় চঞ্চল নয়, নতুন নতুন আবিষ্কারের কৃতিত্বে উচ্চকিত নয়। স্থান কাল চেতনা ঈশ্বর–এইসব প্রশ্ন তাদের কাছে কিছুই নয়, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, জন্ম-মৃত্যু–এইসবই তাদের কাছে জ্বলন্ত সমস্যা। এই নিয়ে তাদের জীবনমরণ। কিন্তু শুধু তাদের নিয়ে তো পৃথিবী নয় এবং ইতিহাস নয়। ইতিহাস তাদের কাছে কিংবদন্তি, অথবা কিংবদন্তিই তাদের কাছে ইতিহাস? শুধু তাদেরকে নিয়ে মহাজগতে মহামানুষের জীবন নয়, কেননা তাদের চেতনা খণ্ডিত। ঐ সব প্রশ্ন তাদের কাছে কোনো প্রশ্নই নয়। ইতিহাস সৃষ্টিতে তারা সহায়তা করে কিন্তু ইতিহাস তারা লিপিবদ্ধ করে না, কেননা স্মৃতির ভারে তারা পীড়িত নয়।

স্মৃতির ভারে যে পীড়িত, সমস্যাটা তার। তার কাছে স্থান কাল চেতনা এবং এইসবের ধারাবাহিকতা সত্য এবং এই সত্যের মধ্যেই সে অমর–অর্থাৎ আজ পর্যন্ত। ভবিষ্যতেও সে অমর থাকবে, কিন্তু কতদিন? প্রশ্ন হচ্ছে, সে নিজেই

অমর হতে চাইবে কি না, ঐ অপরিসীম স্মৃতির বোঝা নিয়ে। যা স্মৃতির বস্তু তা স্মৃতিতে থাকলেই তার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, কিন্তু সৃষ্টির ভার একদিন অসহনীয় হয়ে উঠলে সেই ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইতিহাসের প্রকৃত চেতনা কি সেদিন মানবসমাজে থাকবে? আগামী দু-এক লক্ষ বছরের মধ্যে একদিন এ-সমস্যা দেখা দেবে, মনে হয়। আগামী কোটি বছরে তো মানুষের অবস্থা অকল্পনীয়। গত কোটি বছরের ইতিহাসের সমস্যা অনুরূপ। সে-ইতিহাসকে নানা জটিল পন্থায় আবিষ্কার করে নিতে হয়, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ঘটনার যেমন ভিড় তাতে আগামী কোটি বছর কি মানুষ বাঁচবে? দু-চার লাখ বছর পরেই সে ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর কথাটা হচ্ছে এই যে, নতুন-নতুন মারণাস্ত্র যে-হারে উদ্ভাবিত হচ্ছে, এই মারণাস্ত্র ব্যবহার করা যে উচিত নয় সে-জ্ঞান এবং নৈতিকতার বিকাশ কি সেই হারে বাড়ছে? রণনীতি এখন এই পর্যায়ে উঠেছে যে যুদ্ধে প্রতিপক্ষের যে-সব মানুষ মরে তারা আর মানুষ নয়, সংখ্যা মাত্র। এমন দিন হয়ত আসছে যখন যে-কোনো সংখ্যার পর দু-চারটে শূন্য শুধু শূন্য ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এখনি তো পূর্ব-পশ্চিমের মহাশক্তিদের ভাণ্ডারে যে-পরিমাণ মারণাস্ত্র মজুদ আছে তাই দিয়ে মানবপ্রজাতির দশ-বিশ বার আত্মহত্যা করা সম্ভব। সুতরাং এমন ভয়াবহ পরিণাম এড়াতে হলে শুভবোধ, নৈতিকতাবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের বিপুল জাগরণ ভিন্ন কোনো বিকল্প নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

চেতনা	–	চৈতন্য। বোধ। জ্ঞান।
অ্যালবাম	–	আলোকচিত্র, ডাকটিকেট প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য এক প্রকার খাতা।
প্রজাতি	–	ইংরেজিতে স্পেসিস। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের শ্রেণিবিশেষ। প্রাণিজগতে মানুষ একটি প্রজাতি।
বহুবিচিত্রমুখী জ্ঞানভাণ্ডার	–	মানুষের জ্ঞানের বহু শাখা। যেমন : দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রকৌশলবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি।
বিশেষীকৃত ইতিহাস	–	বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ইতিহাস।
মানসিক সম্পদ	–	সাহিত্য-সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞান—যাকে আত্মিক সম্পদও বলা যায়। বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদের বিপরীত। মূলত চিন্তন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা সৃষ্ট।
মানবীয় ধারা	–	মানবজাতির বা মানবের ধারা। নিরবচ্ছিন্ন মানবপ্রবাহ। ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু ঘটলেও মানবপ্রজাতি ধারাবাহিকভাবে প্রবহমান।
কিংবদন্তি	–	লোকপরম্পরায় প্রচলিত কথা। জনশ্রুতি।
এই সত্যের মধ্যেই সে অমর	–	মানবজাতির সামষ্টিক চেতনার প্রবহমান রূপের যে সত্য সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে। ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টির মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতা পরিপুষ্ট হচ্ছে আর ওই সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই ব্যক্তি মানুষ বেঁচে থাকছে।
রণনীতি	–	যুদ্ধের কৌশল।
পূর্ব-পশ্চিমের মহাশক্তি	–	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ। বিশেষভাবে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৮১ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি লেখকের 'চেতনার অ্যালবাম এবং বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে প্রথম রচনা হিসেবে সংকলিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে।

এ প্রবন্ধে লেখক মানবসভ্যতার একটি সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। এই সংকটের দুটি দিক রয়েছে। একটি দিক হলো, বিভিন্ন শাখায় মানুষের জ্ঞানচর্চা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এখনই একজন মানুষের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ অসম্ভব। জ্ঞানচর্চার ধারা যেরূপ সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে তাতে ভবিষ্যতে এর একটি শাখা সম্পর্কেও পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা লাভের মাধ্যমে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ফলে মানুষকে ইতিহাস জানতে হলে একদিন ছবির অ্যালবামের মতো জ্ঞানরাজ্যের পাতা দ্রুত উল্টিয়ে যেতে হবে শুধু। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখারও অবসর মানুষ পাবে না। আর এককে রকম জ্ঞানশাখার জন্য থাকবে এককে রকম অ্যালবাম। লেখকের মতে, এটা কেবল জ্ঞানার্থীদেরই সমস্যা। জ্ঞানচর্চায় বিমুখ অশিক্ষিত অসংস্কৃত মানুষের জন্য এটা কোনো সমস্যা নয়। লেখক সমস্যার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তা হলো, মানুষ তার জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই যে মারণাস্ত্র তৈরি করেছে তা ব্যবহৃত হলে যে কোনো সময় পৃথিবী থেকে মানবজাতির বিনাশ ঘটতে পারে। এমন ভয়ানক পরিণাম থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে শুভবুদ্ধির প্রসার ঘটানো খুবই জরুরি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন চেতনা দীর্ঘকালীন ব্যাপার?

ক. ব্যক্তিক　　খ. মানবীয়
গ. জাতীয়　　ঘ. মহাজাগতিক

২. 'প্রবীণতার পথে নবপ্রজাতির একদিন বিলোপ ঘটতে পারে'—লেখকের এরূপ আশঙ্কার কারণ কী?

ক. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ　　খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
গ. সভ্যতার বিবর্তন　　ঘ. স্বাভাবিক নিয়ম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

রোগ-ব্যাধি নির্ণয়, নিরাময়, বিনোদন, যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি আজ বিপ্লব এনে দিয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্যে মুহূর্তেই সব সমস্যার সমাধান মেলে। আবার দুষ্টলোকের হাতে পড়লে প্রযুক্তি হয়ে উঠতে পারে মানববিধ্বংসী।

৩. উদ্দীপকটি "চেতনার অ্যালবাম" প্রবন্ধের যে দিকগুলোকে ইঙ্গিত করে তা হলো–

i. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ
ii. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ
iii. চেতনার নেতিবাচক দিক

কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. ইঙ্গিতপূর্ণ দিকটি থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে আলোচ্য প্রবন্ধে কোনটিকে নির্দেশ করা হয়েছে?

ক. শুভবুদ্ধির প্রসার　　খ. দেশপ্রেম
গ. গণজাগরণ　　ঘ. প্রকৃত জ্ঞানচর্চা

সৃজনশীল প্রশ্ন

আমরা একবিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতের মানুষ। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগকে নিয়ে আমরা অনেক বেশি গর্ববোধ করি। পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয় যেন একটি গ্রামের মতো। মুহূর্তে তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে আসি মোবাইল কিংবা ইন্টারনেটের সাহায্যে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে Genetically modified food বা GM food। ফলে এ শতাব্দীর মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু কিছু অসৎ লোক খাদ্যদ্রব্যে মাত্রাতিরিক্ত ফরমালিন, কার্বাইড, সিসা ইত্যাদি মেশানোর ফলে জনস্বাস্থ্য আজ হুমকির সম্মুখীন।

ক. লেখকের মতে হাজার বছর পর মানুষের জীবনে কোন সমস্যা দেখা দেবে?
খ. প্রাবন্ধিক আব্দুল হক 'বিশ্বসংস্কৃতি' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের প্রথমার্ধে "চেতনার অ্যালবাম" প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয়ার্ধের নেতিবাচকতা দূর করতে "চেতনার অ্যালবাম" প্রবন্ধে লেখক যে আবেদন জানিয়েছেন তা বিশ্লেষণ কর।

বায়ান্নর দিনগুলো
শেখ মুজিবুর রহমান

লেখক-পরিচিতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও জাতির জনক। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ববাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে দেশব্যাপী সফরের মাধ্যমে মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেন। বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে পরিচিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে এক সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে অসহযোগের ডাক দেন তিনি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন : "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্যে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পরে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি দেশে ফেরেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে ব্রতী হন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবদ্দশায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৭২ সালে তিনি 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাঁদের বললাম, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই। আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে, সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কী? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে

পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে! প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে দেখেই বলে বসল, ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে। আমি বললাম, কিসমত। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না। যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। ওপরওলাদের টেলিফোন করল এবং হুকুম নিল থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, "জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে।"

জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, জাহাজে অনশন করি কী করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না। আমরা দুইজনে জেল সিপাহিদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম। সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম, "জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, চলেন কিছু নাশতা করে আসি।" নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মীরা জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি। আধাঘণ্টা দেরি করলাম, কাউকেও দেখিনা—চায়ের দোকানের মালিক এসেছে, তাকে আমি আমার নাম বললাম এবং খবর দিতে বললাম আমার সহকর্মীদের। আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি, এমন সময় আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন—সকলে মহি বলে ডাকে, তার সঙ্গে দেখা। আমি যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলাম, তখন আমার সাথে সাথে কাজ করেছে। মহি সাইকেলে যাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ডাক দিলাম নাম ধরে, সে সাইকেল থেকে আমাকে দেখে এগিয়ে আসল। আইবি নিষেধ করছিল। আমি শুনলাম না, তাকে এক ধমক দিলাম এবং মহিকে বললাম, আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি সকলকে এ খবর দিতে।

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছেন। আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করবার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের দুইজনেরই শরীর খারাপ। মহিউদ্দিন ভুগছে প্লুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে। চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপদ! নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে। সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে

খাবার তৈরি করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয়। এদের কথা হলো, "মরতে দেব না।"

আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই-তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। রক্ত আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপত্তি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভেতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদের শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ-ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দিয়ে খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জন সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছিলেন। বার বার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার ও মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই। আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হয় ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই। একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু-একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ, ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' বললেই তো হতো। রাতে যখন ঢাকার খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। তবে অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম।

২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এক জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়। ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। দু-একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃদ্ধ খান সাহেব ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর জেলখানার বাইরে নাই।

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি-ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে

পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, "এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।" আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, "অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।" ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?" বললাম, "দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।" আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হার্টের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না। একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত-পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না, কারণ প্লুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বার বার আব্বা, মা, ভাইবোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত।

মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দুজনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময়-অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বোধহয় আর দু-একদিন বাঁচতে পারি।

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, "আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?" বললাম, "মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।" ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে, চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।" তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, "তোমার অর্ডার এসেছে।" আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন, "আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই; আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে।" ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছেন। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, "তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব।" দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল।

সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্যশক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে, দুই দিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না, তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ, আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কি না! আজই টেলিগ্রাম করব, তারা

যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব, বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, "আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।" আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।

পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা।

পাঁচদিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।" একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী উপায় হতো? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কী হতো? তুমি বলবা, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো হতো না? মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা?' আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। শুধু বললাম, "উপায় ছিল না।" বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ-আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিনও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনালেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাক্তার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিন দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেলবেলা। আমাকে দেখতে রোজই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।" কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছু আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে।

১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং ছোট ছোট হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে। মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। তাঁরাও ভয় পেয়ে গেছেন। এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

অনশন ধর্মঘট	–	কোনো ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে একটানা আহার বর্জনের সংকল্প।
সুপারিনটেনডেন্ট	–	তত্ত্বাবধায়ক (superintendent)।
মহিউদ্দিন	–	মহিউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭)। রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ও পরে প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন তিনি। ১৯৭৯-১৯৮১ কালপর্বে তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ছিলেন।
বেলুচি	–	পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোক।
‘ইয়ে কেয়া বাত... মে’	–	এ কেমন কথা, আপনি জেলখানায়।
ভিক্টোরিয়া পার্ক	–	ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার নামে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত উদ্যান। বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ্ পার্ক।
প্লুরিসিস	–	বক্ষব্যাধি।
রেণু	–	বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও দুঃসময়ের অবিচল সাথি।
নূরুল আমিন	–	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রজনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নূরুল আমিন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।
আমলাতন্ত্র	–	রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা।
আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ	–	গণআজাদী লীগ নেতা। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখেছেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

খয়রাত হোসেন – রাজনীতিবিদ। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দীন সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

খান সাহেব ওসমান আলী – নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা। তিনি আইন সভার সদস্য (এমএলএ) ছিলেন।

খোন্দকার মোশতাক আহমেদ – বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংগঠক। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে মর্মান্তিক হত্যায় ষড়যন্ত্র, গোপন সমর্থন ও সহায়তার জন্য নিন্দিত।

ছোট ভাই – বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের।

হাচিনা, হাচু – বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা।

কামাল – বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল।

রেডিওগ্রাম – বেতারবার্তা (radiogram)।

প্রকোষ্ঠ – ঘর বা কুঠরি।

পাঠ-পরিচিতি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "বায়ান্নর দিনগুলো" তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও সহধর্মিণীর অনুরোধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় এই আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে আটক থাকায় জীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়। জীবনীটিতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। যৌবনের অধিকাংশ সময় কারা প্রকোষ্ঠের নির্জনে কাটলেও জনগণ-অন্তপ্রাণ এ মানুষটি ছিলেন আপসহীন, নির্ভীক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তিনি এ গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

"বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে বৎসরের পর বৎসর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে লেখক অনশন ধর্মঘট করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি। স্মৃতিচারণে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্রজনতার মিছিলে গুলির খবর। সেই সঙ্গে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনে পিতামাতা-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা এবং অবশেষে মুক্তি পেয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসার স্মৃতির হৃদয়স্পর্শী বিবরণও পরিস্ফুট হয়েছে সংকলিত অংশে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভাষাসৈনিকদের শহিদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে পেয়েছিলেন?

ক. সিপাহিদের মাধ্যমে খ. প্রহরীদের সহায়তায়

গ. রেডিও শুনে ঘ. বন্দিদের কাছ থেকে

২. 'আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল'– নূরুল আমিনের কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে বঙ্গবন্ধু এরূপ মন্তব্য করেছেন?

ক. একগুঁয়েমি খ. নির্বুদ্ধিতা

গ. বিচারবুদ্ধিহীনতা ঘ. অদূরদর্শিতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মানুষ এক সময় ফুঁসে ওঠেন। কালক্রমে তা বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয়। এক সময় এ দেশের সিপাহিরাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শাসকগোষ্ঠী এ আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেন। আন্দোলনকারীদের জনসমক্ষে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

৩. উদ্দীপকে শাসকগোষ্ঠীর যে যে মনোভাব ফুটে উঠেছে সেটিকে "বায়ান্নর দিনগুলো" শীর্ষক স্মৃতিকথার আলোকে বলা যায়–

i. অপশাসন

ii. নির্মমতা

iii. অত্যাচার

কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. শাসকগোষ্ঠীর উল্লিখিত মনোভাবের খেসারত কাকে দিতে হয়েছিল?

ক. আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে　　খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

গ. নূরুল আমিনকে　　ঘ. খান সাহেব ওসমান আলীকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

বর্ণবাদ, বৈষম্য আর নিপীড়নের কারণে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক সময় ফুঁসে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলো। এদের পুরোধা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। আন্দোলন নস্যাৎ করতে শুরু হয় নির্যাতন। তাঁকে পুরে দেওয়া হয় জেলে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাঁকে। পাথর ভাঙার মতো সীমাহীন পরিশ্রমের কাজ করতে গিয়ে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু এ সময় এ পাষাণ হৃদয়ের মানুষগুলোর পাশাপাশি কিছু ভালো মনের মানুষও ছিলেন সেখানে যাদের ভালোবাসা, মমত্ববোধ আর সেবায় সিক্ত হয়েছেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর তাঁর মুক্তি মেলে।

ক. "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব কোন রোগে ভুগছিলেন?

খ. 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'– কোন প্রসঙ্গে লেখক এ কথা বলেছিলেন?

গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চেতনাগত ঐক্যই নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একসূত্রে গেঁথেছে– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

একটি তুলসী গাছের কাহিনি
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

লেখক-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আহমদউল্লাহ্। তাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল নোয়াখালী। কলকাতা ও ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। দেশে-বিদেশে সরকারের বিভিন্ন উচ্চতর পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার, জীবনসন্ধানী ও সমাজ-সচেতন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র রচনায় উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মীয় সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। বাংলাদেশের কথাশিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছেন তিনি। ‘লালসালু’, ‘চাঁদের অমাবস্যা’ ও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে- গল্পগ্রন্থ : ‘নয়নচারা’ এবং ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’; নাটক : ‘বহিপীর’, ‘তরঙ্গভঙ্গ’ ও ‘সুড়ঙ্গ’। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক (মরণোত্তর) পেয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ১০ই অক্টোবর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠোন। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঁঠাল গাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকে ও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছায় আবৃত মাটিতে ভ্যাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হতো?

সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিতো। যত্ন করে লাগাতো মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহেনা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসতো। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হাল্কা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিতো। তারপর গা ঢেলে বসে গল্প-গুজব করতো। আমজাদের হুকোর অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো। কাদের গল্প-প্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনিময় হয়ে উঠতো। কিংবা পুষ্পসৌরভে মদির জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই বা কী এসে যেতো? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করতো তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হলো না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। সে ভয় কাটতে দেরি হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রই-রই আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা

তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোনো অপরাধের চেতনা যদি বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাশ্রিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোটো ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুট চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কণ্ঠে বলে,

—আপনাদের তক্‌লিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সেই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা ভরা উক্তিতে।

—ঐ ঘরটা?

নিচের তলার রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভালো করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্জিতে বাঁধা দুটি বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হলো অ্যাকাউন্টস-এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানাপত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ির বারান্দায় আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হতো।

নেহাত কপালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘণ্টা দুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনোদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে-আলোতেই দিব্যি চলে যাবে। বা কিপ্পনতা যদি করতে চায়—

অবশ্য এ-সব পরাহত বাড়ি-সন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বেআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমতো মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না দু-দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময় মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকারস্বত্ব এক কথা, অন্যায়ের ওপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা। হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত-তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রুখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইন-কানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর রব তোলে! যাবো কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি? সদলবলে সাব-ইন্সপেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না বে-হক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়ত ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে, এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইন্সপেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বলো না কাউকে কিন্তু।

কথাটা অবশ্য কারোরই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটির গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উস্‌কানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে, কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। —শুধু এ বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলামেলা ঝরঝরে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন-সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তুলনায় এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে মস্ত মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠোন, আরও পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান—এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মতো একখানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো-বাতাস কখনো তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে ধমনীতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দুহাজারওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জৌলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপট্‌কা ইউনুস ইতোমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকাল বেলার আবর্জনা-ভরা ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁৎসেঁতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকতো যে রাস্তার ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছতো না, ঘরের কোণে ইঁদুর-বেড়াল মরে পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউনুসের জ্বরজারি লেগেই থাকতো, থেকে থেকে শেষ রাতে কাশির ধমক উঠতো। তবু পাড়াটি ছাড়ে নি এক কারণে। কে তাকে বলেছিল, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য তো করতোই, সময় সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিশ্ছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নিতো। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মোগলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেরই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানির হাতে শেখা বিশেষ পিঠা তৈরির কৌশলটি শেষ পর্যন্ত অখাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে। গানের আসরও বসে কোনো কোনো সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লা কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীথ রাত পর্যন্ত একটি অবক্তব্য সংগীতসমস্যা সৃষ্টি করে।

এ সময়ে একদিন উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোনা আধ হাত উঁচু ইটের তৈরি একটি মঞ্চের ওপর তুলসী গাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠোনে পায়চারি করছিল, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রই-রই আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্রই কেউ কেউ ছুটে আসে উঠানে।

—কী ব্যাপার?

—চোখ খুলে দেখ!

—কী? কী দেখবো?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথমে তুলসী গাছটা নজরে পড়ে না তাদের। দেখছো না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছো না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে। গাঢ় সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। নিচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়ত বহুদিন তাতে পানি পড়েনি।

—কী দেখছো? মোদাব্বের হুংকার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল!

এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। আকস্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা ক-টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসী গাছটি হঠাৎ সে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ করে মোদাব্বের আবার হুংকার ছাড়ে।

—ভাবছো কী অত? উপড়ে ফেলো বলছি!

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নেই। তবুও কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটা শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়ত কারো জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই।

যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে-পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়ত আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়ত সে শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্নভাবে সে শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়ত তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়ত ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে বলে,

—থাক না ওটা। আমরা তো তা পুজো করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাব্বের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলভি ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আছে, সকালে নিয়মিতভাবে কোরান-তেলাওয়াত করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসী গাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পর মুহূর্তেই অসচেতনতায় নিমজ্জিত হয় তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছ-পা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই ফলে সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাকবিতণ্ডার স্রোতে মনের সে দুর্বলতা অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্যান্য দিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

—ওরাই তো সবকিছুর মূলে, মোদাব্বের বলে। উলঙ্গ বালব্-এর আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে। তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হলো।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে উক্তিতে নতুন একটা ঝাঁঝ। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।

দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ করে। বলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী? মোদাব্বেরের ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থি মকসুদ আজ একা। তাই হয়ত তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসী গাছটা মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার তলে যে আগাছা জন্মেছিল সে আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে। মোদাব্বেরের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি সাঁ করে কচুকাটার কায়দায় সে তুলসী গাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসী গাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসী গাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসী পাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্লকম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো-হাওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানিই দেরি হয় যতখানি দরকার, সে বিশ্বাস দৃঢ় প্রমাণিত হবার জন্যে। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদারুণই মনে হয়।

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে, এমন সময় বাইরে সিঁড়িতে ভারি জুতার মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উঁকি দিয়ে মোদাব্বের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়ত রাস্তা থেকে ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে এবং তারই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্পের মতো ঠেকে। শিকারির সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুজে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সব জেনেও তারাই কি সত্য কথাটা স্বীকার না করে এ বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্য?

পুলিশ দলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটিকেও মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন কড়িকাঠ গোনে। ওপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়ত তারা কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট করে উত্তর দেয়। আপনারা বেআইনিভাবে এ বাড়িটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতূহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিকে চেয়ে থাকে।

—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে মোদাব্বের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে, কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?

অ্যাকউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনস্টেবল দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

—কোথায় বাড়িওয়ালা? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশ দলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয় যেন।

—তবে?

—গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।

এবার হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোনো কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়। আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?

এবার কনস্টেবল দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।

তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ্ড সে বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেমে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে; যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাব্বের যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে সাতদিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেও সে-ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার কাদের পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে থাকে খবরে কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয়নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারও মনে পড়েনি।

কেন পড়েনি সে কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

শব্দার্থ ও টীকা

কংক্রিটের পুল	–	চুন-বালি-সিমেন্ট ও চুনাপাথরের মিশ্রণে তৈরি পাকা সেতু।
ক্যানভাস	–	মজবুত মোটা কাপড় বিশেষ।
ডেক চেয়ার	–	ঘরের বাইরে ব্যবহারের জন্য কাঠ বা ধাতুর কাঠামোর ওপর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি সংকোচনযোগ্য আসন।
গুড়গুড়ি	–	আলবোলা। ফরসি। নলযুক্ত হুঁকা।
মদির	–	মত্ততা জাগায় বা সৃষ্টি করে এমন।
দেশভঙ্গের হুজুগে	–	১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আবেগবশত।
ডেরা	–	অস্থায়ী বাসস্থান। আস্তানা।
পরাহত	–	ব্যাহত। বাধাগ্রস্ত। পরাজিত।
ফিকির	–	ফন্দি। মতলব। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।

না-হক	–	ন্যায়সঙ্গত নয় এমন।
না-বেহক	–	অন্যায় নয় এমন।
ঘোর-ঘোরালো	–	খুবই জটিল। অত্যন্ত প্যাঁচালো।
লাটবেলাট	–	গভর্নর বা অনুরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ।
কচ্ছদেশীয়	–	গুজরাটের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী স্থান।
ইয়ার্ড	–	স্টেশনসংলগ্ন চত্বর।
সাম্প্রদায়িকতা	–	সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিকতা ও ক্রিয়াকলাপ।
বামপন্থি	–	সাম্যবাদী। প্রগতিবাদী। বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী।
রিকুইজিশন	–	কোনো কিছু চেয়ে লিখিত ফরমাশ। তলব করা। Requisition।
কড়িকাঠ	–	ছাদের তলায় দেওয়া আড়াআড়ি লম্বা কাঠ।
ভদ্রতার বালাই	–	সাধারণ সৌজন্যবোধ।
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	–	পালানো।
দিনে দুপুরে ডাকাতি	–	প্রকাশ্য প্রতারণা ও মিথ্যাচার। ডাকাতির মতো দুঃসাহসিক কাজ।
তুলোধুনো হওয়া	–	ধুনা তুলোর মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়া।
কলা দেখানো	–	আলংকারিক অর্থে ফাঁকি দেওয়া।
মগের মুল্লুক	–	আলংকারিক অর্থে অরাজক দেশ বা রাজ্য।

উৎস ও পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র "একটি তুলসী গাছের কাহিনি" গল্পটি ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। গল্পের সীমিত পরিসরে জীবনের গভীর কোনো তাৎপর্যকে ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মুন্সিয়ানা রয়েছে। "একটি তুলসী গাছের কাহিনি"তেও এ গুণটি লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই ঢাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন উদ্বাস্তু কর্মচারী। কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় কোনোরকমে মাথা গুঁজে দুর্বিষহ জীবনযাপন করলেও নিরাশ্রিত উদ্বাস্তু জীবনের যে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা এতদিন তাদের গ্রাস করেছিল কলকাতার তুলনায় অনেক অনেক খোলামেলা বাড়ি পেয়ে তারা কেবল যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তা নয়, বরং বাড়িটিকে তাদের কাছে মনে হলো বেহেশ্‌ত। অচিরেই বাড়ির উঠানে আগাছার মধ্যে তারা আবিষ্কার করল একটি তুলসী গাছ। সবাই প্রথমে গাছটাকে উপড়ে ফেলার জন্য হইচই করলেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দ্বিধাও জাগে এবং শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় তুলসী গাছটা। দেখা গেল সকলের অজান্তে কেউ একজন গাছটার পরিচর্যা করতে শুরু করেছে। তারপর একদিন সরকারি নির্দেশে বেআইনি দখল থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হলো। শূন্য বাড়িটাতে রইল কেবল ছড়ানো পরিত্যক্ত আবর্জনা আর সেই তুলসী গাছটা। যত্নের অভাবে তুলসী গাছটা অচিরেই আবার শুষ্কপ্রায় হয়ে উঠল। যে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয়েছে অসংখ্য মানুষের শান্ত জীবন তুলসী গাছটাও যে তারই শিকার অসহায় গাছটা তা জানবে কী করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "একটি তুলসী গাছের কাহিনি" গল্পে গল্পপ্রেমিক কে?

ক. মকসুদ খ. কাদের

গ. ইউনুস ঘ. মোদাব্বের

২. 'অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা' বলতে গল্পকার যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো-

i. পরশ্রীকাতরতা
ii. হুজুগে মেতে ওঠা
iii. হিংসাপরায়ণতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পে দেখা যায়– গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে চারদিক ফেটে চৌচির হয়ে গেলে মানুষের পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। তখন গ্রামবাসীর একমাত্র অবলম্বন হয় জমিদার শিবচরণের পুকুর। কিন্তু দরিদ্র কৃষক গফুরের মেয়ে আমিনা মুসলমানের মেয়ে বলে সে পুকুরঘাটে নামতে পারে না। এছাড়া গফুরের পুত্রতুল্য ষাঁড় মহেশ ঘাস খায় বলে শ্মশানের ধারের গোচারণ ভূমিটুকুও জমিদার বিক্রি করে দেন।

৩. উদ্দীপকের শিবচরণ "একটি তুলসী গাছের কাহিনি" গল্পে কার প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. মোদাব্বেরের খ. ইউনুসের
গ. মকসুদের ঘ. মতিনের

৪. **উদ্দীপকে** "একটি তুলসী গাছের কাহিনি" গল্পের যে দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো–

i. অসহায়ত্ব
ii. ধর্মনিরপেক্ষতা
iii. জাতিভেদ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি-ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিরে একশ খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।

ক. ইউনুস কলকাতার কোথায় থাকত?
খ. "মকসুদের বিশ্বাসের কাঁটাটি দুলে দুলে থেমে যায়"– কেন, ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশের 'জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া', "একটি তুলসী গাছের কাহিনি" গল্পে যেভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সেই প্রতিধ্বনি বন্ধ করতে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে মানুষ?— মন্তব্যটি বিচার কর।

মানুষ
মুনীর চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম রূপকার মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর পিতার কর্মস্থল মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে বরেণ্য শিক্ষাবিদ, অসাধারণ বক্তা, সৃজনশীল নাট্যকার, তীক্ষ্ণধী সমালোচক ও সফল অনুবাদক। সাহিত্য ও ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণা ও তুলনামূলক সমালোচনায় তিনি রেখে গেছেন অনন্য পাণ্ডিত্য ও উৎকর্ষের ছাপ। মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের আধুনিক নাটক ও নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর নাটক মনন ও নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা অসাধারণ নাটক 'কবর' তিনি রচনা করেছিলেন জেলখানায় বসে। তাঁর অন্যান্য মৌলিক নাটক হচ্ছে : 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'দণ্ডকারণ্য', 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য'। তাঁর অনুবাদ নাটকের মধ্যে রয়েছে : 'কেউ কিছু বলতে পারে না', 'রূপার কৌটা', 'মুখরা রমণী বশীকরণ'। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'মীর-মানস', 'তুলনামূলক সমালোচনা', 'বাংলা গদ্যরীতি' ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মাত্র ৪৬ বছর বয়সে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক-দালালদের হাতে তিনি অপহৃত ও পরে নিহত হন।

	বাবা	শিশু
চরিত্র	আম্মা	লোকটা
	ফরিদ	এবং একজন।
	জুলেখা	

বড় শোবার ঘর। ডানদিকে একটা খাট একটু কোনাকুনি করে রাখা। মশারি ওঠানো। বামে মাঝারি রকমের টেবিল, তাতে শেড দেয়া ল্যাম্প, পাশে টেলিফোন। দু-একটা অতিরিক্ত বসবার জায়গা। একদিকে গোসলখানার দরজা, অন্য পাশে গরাদহীন কাচের বড় জানালা।

পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় দূরে, বহু কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি বন্দে মাতরম। এবং একটু কাছে প্রচণ্ড আল্লাহু আকবর রব! এই দুই চিৎকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে দেখা দেবে, বন্ধ জানালার কাচের মধ্য দিয়ে দূরে লকলকে আগুনের শিখা, নীল আকাশকে রক্তিমাভ করে কাঁপছে।

ঘরের মধ্যে চারজন লোক ও একজন অসুস্থ শিশু। খাটের ওপর বর্ষীয়সী আম্মাজান আধশোয়া অবস্থায় শিশুকে আস্তে আস্তে বাতাস করছেন। আবছা আলোতে আম্মাজানের ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখ এক অদ্ভুত বিষাদ-ভরা গাম্ভীর্যে স্তব্ধ। শিশুর অন্য পাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কিশোরী জুলেখা। মাথার ওড়নার এক অংশ ঝুলে মাটিতে পড়ে গেছে, ঘামে কপালের গুঁড়ো চুল গালে গলায় লেপ্টে আছে। অসহনীয় আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে ভয়ার্ত অর্থহীন চাহনি। টেবিলের সামনে খাটের দিক পেছন ফিরে, কোমরের পেছনে দুহাত মুঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন আব্বাজান। নিশ্চল নীরব। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টেবিলের ল্যাম্পের সহস্র আলোকরশ্মির কেন্দ্রস্থলে। যেন ভেতরের কোনো অশান্তি বিক্ষুব্ধ হিংস্র অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিষ্পেষিত করে তবে তিনি সুস্থরূপ ধারণ করবেন। টেবিল ল্যাম্পের সংকীর্ণ আলো-পরিসীমার মধ্যে ফাঁপানো সাদা দাঁড়ি আর কপালের গভীর রেখা জ্বলজ্বল করছে। দ্বিতীয় ছেলে ফরিদ নিশাচর কোনো পশুর মতো সন্তর্পণে সামনে পায়চারি করছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে। চোখে মুখে প্রতিহিংসার ছায়াবাজি।

দূরে ধ্বনি উঠল বন্দে মাতরম, তিনবার। হাজার কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো হুংকার। তারপরই, তীব্র অন্ধকার আকাশ ছিন্নভিন্ন করে পাল্টা আহ্বান, আল্লাহু আকবর! কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ।

আব্বা। আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর!

জুলেখা। আব্বাজান! আব্বাজান!

আব্বা। কী! ভয় পেয়েছিস, না! ভীরু কোথাকার! ইমানের ডাক শুনে আঁৎকে উঠেছিস? চুপ। কাঁদিস না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শোন আবার। আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর। বল, ভয় লাগে এখনো!

জুলেখা। না।

আব্বা। ভেবেছিলি আমি পাগল হয়ে গেছি, না? কেন? জীবনে অনেক লোককে মরতে দেখেছি, চোখের সামনে। শ্বাস বন্ধ হয়ে, চোখ উল্টে দিয়ে, জিব বার করে, গলগল করে রক্ত বমি করে কত সুস্থ মানুষকে মরতে দেখেছি। কই কোনোদিন তো উন্মাদ হয়ে যাইনি।

আম্মা। (ফরিদকে) হাসপাতালে আরেকবার ফোন করে দেখবি?

ফরিদ। লাভ নেই। ওরা মোর্শেদ ভাইয়ের বর্ণনা টুকে রেখেছে। কোনো সংবাদ পেলে আমাদের ফোন করে জানাবে বলেছে।

জুলেখা। মোর্শেদ ভাই আমার জন্য বই কিনতে বেরিয়েছিল। মোর্শেদ ভাইকে আমি কেন যেতে বললাম।

আব্বা। চুপ, চুপ নালায়েক মেয়ে! আদরের দেমাক করিস না অত। তুই, তুই কে? মোর্শেদকে বাইরে পাঠাবার না পাঠাবার তুই কে? যিনি পাঠাবার তিনিই পাঠিয়েছেন। মালাউনের ছুরির খোঁচায় মরণ, ওর তকদিরে লেখা ছিল এমনি মওত! আজ হবে জানলেই যেন তুই সব রাখতে পারতি!

ফরিদ। আব্বা!

আব্বা। কী, তোমারও ভয় হচ্ছে, আমি উন্মাদ হয়ে গেছি! আমি ভুলে গেছি বাপ হয়ে মেয়ের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়।

ফরিদ। হাসপাতাল থেকে ওরা এখনও কোনো খবর দেয় নি, আপনি মিছেমিছি ওসব কথা কেন ভাবছেন?

আব্বা। হাসপাতাল! ওরা তোমার ভাইকে ছুরি মেরে কোলে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে, না? ওগো শুনেছ, তোমার ছেলের কথা? আমি জানি মোর্শেদকে এতক্ষণে ওরা কী করেছে। আমি জানি।

ফরিদ। আব্বাজান, আপনি আর কথা বলবেন না। চুপ করে শুয়ে পড়ুন।

আব্বা। চুপ করে শুয়ে থাকব? কেন? ওরা আমার ছেলেকে কেটে, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, শরীর থেকে গলা কেটে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে। মোর্শেদের কালো কোঁকড়া চুল চাক-বাঁধা রক্তের দলার সঙ্গে লেপ্টে ওর গাঢ় মরা চোখ ঢেকে রেখেছে।

জুলেখা। ভাইয়া, আব্বাকে চুপ করতে বল।

আব্বা। কে, কে আমাকে চুপ করাবে? তোরা মরে গেছিস। তোরা চুপ করে থাক। তোরা ওর ভাই নয়, বোন নয়। তোরা ওর কেউ নস। তাই তোরা চুপ করে আছিস। আমি ওর বাপ–

আম্মা। জুলেখা!

জুলেখা। আম্মা।

আব্বা। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওরা ওর কাটা মুণ্ডুকে কাঁসার থালায় সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে, ওরা সবাই তাই দেখে বাহবা দিচ্ছে–ফুর্তির খাতিরে মুঠো মুঠো টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের নরম সাদা গলাকাটা লাশের–

আম্মা। খো দা আ!

আব্বা। কে, কে খোদাকে ডাকল?

ফরিদ। আম্মা, আম্মা, কথা বলছ না কেন? খোকার দিকে আঙুল দিয়ে কী দেখাচ্ছ?

জুলেখা। ভাইয়া, খোকা যেন কেমন হয়ে গেছে। নড়ছে না। মুখের শিরাগুলো কী রকম নীল হয়ে ফুটে উঠেছে।

আব্বা। দেখি, দেখি। আমায় দেখতে দাও। জুলি অমন ঝুঁকে পড়ে রইলি কেন! পানি, একটু পানি নিয়ে আয়। (জুলি গ্লাস থেকে চামচে পানি ঢালে)

ফরিদ, তুমি একবার হাসপাতালে, ডাক্তার যে-কোনো ডাক্তারকে একবার খবর দাও। যত টাকা লাগে দেবো, সে যেন দেরি না করে সোজা এখানে চলে আসে।

ফরিদ। তাতে কোনো ফল হবে না আব্বা। আরও দুবার ফোন করেছি, এই দাঙ্গার ভেতর জীবন বিপণ্ন করে কোনো ডাক্তার আসতে রাজি নয়।

আব্বা। কেউ আসবে না? কেউ নয়? সবার জীবনের মূল্য আছে, শুধু আমার ছেলেটার নেই?

জুলেখা। আব্বা, খোকা পানি খাচ্ছে না। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে সব গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

ফরিদ। আব্বা আমি যাই।

আব্বা। কোথায়?

ফরিদ। ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

আব্বা। না না। তুই যেতে পারবি না। তুই আমার চোখের সামনে থাকবি। কোথ্থাও যাবি না। আমি 'বুঝেছি' ওরা আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার পাঁজরের হাড় একটা একটা করে খুলে নিয়ে আমাকে যন্ত্রণায় উন্মাদ করে মেরে ফেলতে চায়। আমি দেবো না। আমি তোমাদের কাউকে হারাব না। বুনো চিতার মত ওরা নিঃশব্দে ওত পেতে ছিল। আমার মোর্শেদ, অসহায়, নির্দোষ, শক্তিহীন–

(টিনের দরজায় ঘা পড়ে)

কে, কে, দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে? তাহলে মোর্শেদকে ওরা মেরে ফেলতে পারে নি! মোর্শেদ ফিরে এসেছে, আমার মোর্শেদ বেঁচে আছে, সে আমায় ডাকছে। তোমরা কেউ ওকে, মোর্শেদ, মোর্শেদ–

(দরজায় আরও জোরে আঘাত)

ফরিদ। আপনি অত উত্তেজিত হবেন না। স্থির হয়ে বসুন। আমি দরজা খুলে দেখছি কে এসেছে। জুলেখা তুই আব্বার কাছে এসে বোস। আমি এক্ষুণি দেখে আসছি।

(প্রস্থান)

আব্বা। জানিস জুলি, খোদার রহমত আছে আমার ওপর। এখনি দেখবি মোর্শেদ ছুটে ওপরে আসবে। ওর হাসির শব্দে এ ঘর কলকল করে উঠবে। খোকার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, সমস্ত পৃথিবী শান্ত সুন্দর হয়ে চারদিক আলোকিত করে রাখবে।

(ফরিদের প্রবেশ)

ওকি, তুই একলা কেন? মোর্শেদ, মোর্শেদ কোথায়?

ফরিদ। মোর্শেদ ভাই নয়, পাড়ারই একটি লোক এসেছিল খবর দেয়ার জন্য। আমাদের এলাকায় একটা হিন্দু গুণ্ডা নাকি ঢুকেছে, সাবধানে থাকতে বলল। একটু আগে বশির উকিলের ছাদে কে ওকে দেখেছে। অন্ধকারে ছাদ টপকে কোথায় পালাল কেউ ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

আব্বা। বশির উকিলের বাড়ির ছাদে?

ফরিদ। হ্যাঁ। আমি বাইরে যাচ্ছি। দলবল নিয়ে সবাই খুঁজতে বার হবে। আমিও যাচ্ছি।

আব্বা। তুই যাবি?

ফরিদ। চুপ করে বসে থাকব? আমি যাচ্ছি। (ড্রয়ারে হাত দেয়) পিস্তলটা রইল। হাতের কাছে রাখবেন। আমি এই ছোরাটা সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

জুলেখা। ভাইয়া, তুমি যেও না।

আব্বা। ছোরা? ছোরা কেন? ছোরা দিয়ে তুই কী করবি?

ফরিদ। আমার ভাইয়ের কাটা মাথা যারা ফেরি করে বেড়াতে পারে তাদের বিরুদ্ধে ছোরা তুলতে আপনি আমায় নিষেধ করেন আব্বাজান? দুধের কচি শিশুকে যারা হত্যা করতে হাতিয়ার তুলে ধরেছে, সে সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে ছোরা হাতে নিয়েছে বলে আপনি শিউরে উঠলেন? আপনার সম্ভ্রান্ত বনেদি রুচিকে কদমবুছি। আমি যাই, দোয়া করবেন।

(প্রস্থান)

(আব্বাজান নিশ্চল। জুলেখা আব্বাজানকে আঁকড়ে ধরে থাকে।
আম্মা খোকাকে বাতাস করছেন। হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর শিশুর কণ্ঠরুদ্ধ আর্তনাদ।)

জুলেখা। আম্মা, আম্মা, খোকা অমন ছটফট করছে কেন? খোকার কী হয়েছে আম্মাজান?

আব্বা। আমি অনেক গুনাহ করেছি খোদা, আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও। যত খুশি যন্ত্রণা আমায় দাও আমি কোনো নালিশ জানাবো না। মোর্শেদ যদি তোমার কাছে কোনো দোষ করে থাকে, তাকে শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে নেবো, একটু প্রতিবাদ জানাবো না। কিন্তু ঐ কচি শিশু নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, মায়ের কোল থেকে এখনও পৃথিবীতে নাবে নি, ও তো কোনো অপরাধ করে নি, তুমি কোন ইনসাফে ওকে শ্বাস বন্ধ করে মারতে চাও! ওকে মুক্তি দাও, শান্তি দাও, রেহাই দাও–বাঁচাও, বাঁচাও, ওকে তুমি বাঁচাও খোদা!

(দুহাতে মুখ গুঁজে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। আম্মাজান নিশ্চল। জুলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদে। হঠাৎ পেছনের কাচের জানালার ওপর, বাইরে থেকে কোনো ভারি জিনিসের কয়েকটা আঘাত পড়ে। একটা কাচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল।)

আব্বা। কে? (হাত দিয়ে পিস্তল চেপে ধরেন)

(ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ছিটকিনি খুলে, জানালা টপকে ঘরে প্রবেশ করে এক যুবক। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্পের স্বল্পালোকে দেখা গেল লোকটার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ, গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি, পরনে ধূতি।)

আব্বা। (কাঁপা হাতে পিস্তল তুলে) কে, কে তুমি?

লোকটা। আমি–মানুষ?

আব্বা। মানুষ?

লোকটা। মানুষ, হিন্দু!

আব্বা। বশির উকিলের বাড়ির ছাদে ওরা, তাহলে তোমাকেই দেখেছিল?

লোকটা। হয়ত। হঠাৎ দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে ভাবিনি। বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, প্রয়োজনে। গিয়ে আর বেরুতে পারিনি।

আব্বা। এখন বেরুলে কোন সাহসে?

লোকটা। আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না। বেরিয়েছি বাধ্য হয়ে। বন্ধুর সাহসে কুলোলো না, আমায় জায়গা দেয়। বন্ধুকে ছেড়ে তাই ছাদ টপকে বেরিয়ে পড়লাম, নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

আব্বা। বন্ধুর বাড়ির চেয়ে এটা বেশি নিরাপদ এ আশ্বাস তোমায় কে দিয়েছে!

লোকটা। আমি আশ্রয় দাবি করছি না, প্রার্থনা করছি। অন্য উপায় নেই।

আব্বা। বাইরে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলে, এ ভুল তুমি করতে না।

জুলেখা। আব্বা, আব্বা, তোমার হাত কাঁপছে। গুলি ছুটে যেতে পারে!

আব্বা। (একটু একটু করে এগুতে থাকে) যখন তুমি হয়ত জানালা ভেঙে প্রাণ বাঁচাতে আমার ঘরে ঢুকেছো, ঠিক তখনই হয়ত তোমার কোনো পরম আত্মীয় আমার বড় আদরের ছেলে মোর্শেদকে ছুরির মাথায় গেঁথে নাচাচ্ছে, বিলাসী বেড়াল যেমন অসহায় ইঁদুরকে নখের আঁচড়ে একটু একটু করে কুরে কুরে মারে। আর আমার খোকা–

(খোকা ও মায়ের আর্তনাদ। বেদনাযুক্ত, ভয়ার্ত।)

লোকটা। ওকি? উনি ও–রকম করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লেন কেন?

জুলেখা। আব্বা, আব্বা, খোকা জানি কেমন করছে?

লোকটা। খোকার কী হয়েছে? অসুখ?

আব্বা। হ্যাঁ, অসুখ। মরণ-অসুখ! গত আধ ঘণ্টা থেকে ছটফট করছিল, এখন হয়ত শান্তি লাভ করল।

লোকটা। কী করছেন আপনি? দেখি, জায়গা ছাড়ুন, পিস্তলটা সরিয়ে একটু পথ দিন। আমি দেখছি।

আব্বা। তুমি, তুমি? তুমি কী দেখবে? ওহ্ বুঝেছি, তোমাদের এখনও আঁশ মেটেনি। আমার খোকাকে বুঝি নিজ হাতে নিয়ে যেতে ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।

লোকটা। আপনি অপ্রকৃতিস্থ। সরে দাঁড়ান।

(সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে নীরবে এগিয়ে গিয়ে লোকটা খোকার পাশে বসে। হাতের কালো ব্যাগটা খুলে ডাক্তারি সরঞ্জাম বার করে পরীক্ষা করতে থাকে।)

ভয়ের কোনো কারণ নেই, মা। খুব সময়মত এসে পড়েছি। কণ্ঠনালির উদ্বৃত্ত মাংসপিণ্ড হঠাৎ ফুলে গিয়ে মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইছে। আমি একটা উত্তেজক ওষুধ দিচ্ছি। আর একটা ইনজেকশন দেব। সব এক্ষুনি ভালো হয়ে যাবে। কিছু ভাববেন না।

আব্বা। ইনজেকশান?

(লোকটা চামচ দিয়ে ওষুধ খাওয়াবে। স্পিরিট দিয়ে তুলো ভিজিয়ে সূচ সেঁকে নেয়। সংলাপ চলতে থাকে, কখনও জুলেখা, কখনও আব্বা, কখনও আম্মা লোকটাকে টুকটাক সাহায্য করে)।

লোকটা। এই যন্ত্রগুলো দেখে অন্তত আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি এখনও পুরোদস্তুর পেশাদার ডাক্তার হইনি। সবেমাত্র পাস করেছি। বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম, রোগী দেখতে। আশা করিনি এক রাতের মধ্যেই দু'জন রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। (ইনজেকশন ঠিক করে নেয়) এখন আর কোনো ভয় নেই মা। দেখবেন ভাইটি আমার এখনই খলখল করে হেসে উঠবে।

আব্বা। বাঁচবে, না? কোনো ভয় নেই, না? খোদা, অপরিসীম তোমার করুণা, তুমি এ গুনাহ্গারের ডাক শুনেছ! অবুঝ শিশুর ওপর কি আর তুমি ইনসাফ না করে পার? তোমার শোকর গুজারি করি!

লোকটা। আমায় একটু হাত ধোয়ার সাবান–জল দিতে হবে।

আব্বা। এস, আমার সঙ্গে এস। এই দিকে বাথরুমে চল।

(আব্বা ও লোকটার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় দ্রুত করাঘাত ও ফরিদের চিৎকার : জুলেখা, জুলেখা!)

জুলেখা। আসছি ভাইয়া।

ফরিদ। (নেপথ্যে), শিগ্গির, দরজা খোল শিগ্গির।

জুলেখা। আম্মা, ভাইয়া যদি–

আম্মা। কোনো ভয় নেই। তুই দরজা খুলে দে।

(জুলেখা বেরিয়ে যায় ও একটু পরেই উত্তেজিত ফরিদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

ফরিদ। আম্মা, আব্বাজান কোথায় গেলেন?

আম্মা। গোসলখানায়। কেন, কী হয়েছে?

ফরিদ। সে হিন্দুটাকে নাকি আমাদের বাড়ির ছাদের খুব কাছেই কোথাও একবার দেখা গিয়েছিল। সবাই সন্দেহ করছে, ও নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আম্মা। বলে দাও, নেই!

ফরিদ। ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। আমার হাতের ছুরি ওদের দেখিয়েছি–কসম কেটে বলেছি, আমি মোর্শেদ ভাইয়ের ছোট ভাই। তার রক্তক্ষরণের জবাব দিতে আমি কসুর করব না।

আম্মা। আমার ঘরের জিনিস লণ্ডভণ্ড করে বাইরের লোককে এখানে খানাতল্লাশি চালাতে আমি কখনও অনুমতি দেবো না। বলে দাও, আমরা পাহারা দিচ্ছি, এ বাড়িতে কেউ ঢোকেনি।

ফরিদ। ওরা নিজেরা না দেখে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। ভদ্রলোকের কথা ওরা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। ওদের বাড়ি তল্লাশি করতে না দিলে ওরা গোলমাল বাধাবে। বিপদ ঘটবে। সব বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আম্মা। বেশ। ওদের ডেকে নিয়ে এস। খুঁজে দেখে যাক কাউকে বার করতে পারে কিনা!

ফরিদ। আপনি তাহলে একবার অন্য ঘরে–

আম্মা। না, পর্দা করার জন্য আমি অন্য ঘরে যেতে পারব না। এখানেই থাকব। মশারিটা ফেলে দাও। আমি ভেতরে থাকব। আমি ছোট খোকার কাছে থাকব।

ফরিদ। (গোসলখানার পথে পা বাড়িয়ে) আমি তাহলে আব্বাকে ডেকে নিয়ে আসি।

আম্মা। না, না। তুমি বাইরে যাও। একটু পরে ওদের ভেতরে নিয়ে আসবে। আমরা ততক্ষণে ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি। যত খুশি এসে দেখে যাক, হিন্দু খুঁজে পায় কিনা। জুলেখা তোমার আব্বাকে ডেকে দেবে। তুমি বাইরে যাও।

(বলতে বলতে আম্মা নিরুদ্বেগ চিত্তে মশারি ফেলছেন। গোসলখানার দরজা দিয়ে, লোকটার হাত ধরে, উত্তেজিত ভয়ার্ত আব্বাজানের প্রবেশ।)।

আব্বা। আমরা সব শুনেছি। এ তুমি কী করলে? কেটে কুচি-কুচি করে ফেলবে। একে আমি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি! কিন্তু, কিন্তু–একে আমি রক্ষা করবই। এঁকে আমি মরতে দেবে না। একে বাঁচাব। বাঁচাব হ্যাঁ! এই ধরো আমার পিস্তল মুঠো করে ধরো। যে তোমাকে মারতে চাইবে তাকে মারবার অধিকার তোমারও আছে। না লড়ে মরবে কেন!

আম্মা। (ভালো করে চারপাশে মশারি গুঁজে দেয়।) অত উত্তেজিত হয়ো না তুমি। আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি। (হাত দিয়ে নেড়ে টেবিল ল্যাম্পটির শেডটা ঠিক করে নেয়।) ডাক্তার, তুমি আমার সঙ্গে এস। এই মশারির মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্প এই আলোর জন্য বার থেকে মশারির ভেতরের কিছুই স্পষ্ট দেখা যাবে না। শরিফ খান্দানের পর্দানশীল মহিলা আমি, মশারির ভেতর থেকে একবার কথা বললেই যথেষ্ট, কেউ মশারি তুলে উঁকি দিয়ে দেখার প্রস্তাব করতে সাহস করবে না।

লোকটা। মা!

আম্মা। দেরি করো না। ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠে এস শিগ্‌গরি! (প্রথমে আম্মাজান, পরে লোকটা, মশারির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবে। আব্বা ও জুলেখা বাক্যহীন। ঘরে প্রবেশ করল ফরিদ। অনুসরণ করে আরও কয়েকজন লোক। ঘরে ঢুকেই তারা বিনা ভূমিকায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এ দরজা দিয়ে যায়, ও দরজা দিয়ে আসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। কিন্তু সেই শব্দ এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মানুষগুলোকে যেন একটু সচকিত করে তুলছে না)।

আম্মা। (মশারির ভেতর থেকে) তোমরা কেউ ফোনটা ধরছ না কেন? দেখ কে ডাকছে? কী বলছে? তোমরা ফোনটা ধর, হয়ত কেউ মোর্শেদের কোনো খবর জানাতে চাইছে।

আব্বা। ধরছি, আমি ধরছি! হ্যালো, ইয়েস হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, আমি মোর্শেদের বাবা।

(কী যেন শুনলেন। চোখমুখ হঠাৎ শিটিয়ে পাথরের মূর্তির মত নিথর হয়ে গেল। ফোনটা নামিয়ে রেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ততক্ষণে পাড়ার লোকেরা গৃহতল্লাশ শেষ করে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময়–)

একজন। সব ঠিক আছে। কেউ নেই। সালাম সাহেব।

(সকালের প্রস্থান)

জুলেখা। –আব্বা! তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? আব্বা, কিছু বল। অমন করে চেয়ে থেকো না, আমার ভয় করছে। আব্বাজান, ফোনে কে ডেকিছিল? কী বলল?

আব্বা। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল।

ফরিদ। জুলি, আমার কাছে আয়। ভয় পাস নে, আব্বাজানকে অমনি থাকতে দে!

(আম্মাজান বেরিয়ে আসেন। মশারি তুলতে থাকেন।)

ফরিদ। আম্মা! এ কে?

লোকটা। আমায় বলছ ভাই? আমি মানুষ (আম্মাকে) ছোট খোকার আর কোনো ভয় নেই মা। দেখুন খেলতে শুরু করেছে। খোকাকে আমি দেখছি। আপনি (আব্বার দিকে ইঙ্গিত করে) ওঁকে দেখুন।

(জুলেখা তখন ফরিদের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কাঁদছে। আব্বাজান তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি! আম্মাজানের শান্ত কালো চোখ আব্বার মুখের ওপর ন্যস্ত। একটু একটু করে তা পানিতে ভরে উঠেছে। লোকটা ছোট খোকার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত রাখে। মঞ্চ আস্তে আস্তে অন্ধকার হতে থাকে ও ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।)

(য ব নি কা)

শব্দার্থ ও টীকা

বন্দে মাতরম	–	মাকে (দেশমাতাকে) বন্দনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত দেশাত্মবোধক সংগীতধ্বনি।
আল্লাহু আকবর	–	আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
বর্ষীয়সী	–	অতিশয় বৃদ্ধা। পুরুষবাচকরূপ বর্ষীয়ান।
ইমান	–	শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহর একত্ব ও মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ– এই বিশ্বাসই মূলত একজন মুসলমানের ইমান।
নালায়েক	–	লায়েক নয় এমন। অপ্রাপ্তবয়স্ক। অনুপযুক্ত। বাচ্চা।
দেমাক	–	অহংকার। গর্ব।
তকদির	–	ভাগ্য।
রায়ট	–	দাঙ্গা। মারামারি। riot
ঠাহর	–	অনুমান। আন্দাজ।
বনেদি	–	প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত।
ইনসাফ	–	সুবিচার। ন্যায়। ন্যায়বিচার।
অপ্রকৃতিস্থ	–	মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন।
গুনাহ্গার	–	পাপী।
লণ্ডভণ্ড	–	তছনছ। এলোমেলো। বিপর্যস্ত।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যসাহিত্যের পুরোধা-ব্যক্তিত্ব শহিদ মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকা "মানুষ" অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল শিল্পরূপ। মানুষের মৌলিক মানবিক চেতনা দয়া-মায়া-মমতা-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি যে জাতি-ধর্ম-বর্ণের অনেক ওপরে স্থিত– এই মৌল সত্যটিকে নাট্যকার একটি দাঙ্গা কবলিত শহরে একটি পরিবারের চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে অভিব্যক্তি দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত শহরে পরিস্থিতির চাপে ও প্রতিক্রিয়ায় ধর্মপ্রবণ মানুষের মনেও কীভাবে ধর্মীয় উন্মত্ততার সৃষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে হলেও মন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তার উদাহরণ নাটকের চরিত্র– আব্বা, ফরিদ ও এলাকার লোকজন। অন্যদিকে ধর্মীয় উন্মত্ততার মধ্যেও যে কোনো কোনো মানুষের মন মানবতাবোধ ও শুভবুদ্ধি হারায় না তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নাটকে বর্ণিত আম্মা ও তরুণ ডাক্তারের চরিত্র। নাটকটির পাঠ শেষ হলে পাঠকের মন পূর্ণ হয় অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। ধর্মীয় অন্ধ আক্রোশ ছাপিয়ে মানুষের মহিমাই বড় হয়ে উঠেছে একাঙ্কিকাটিতে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আপনি অত উত্তেজিত হবেন না' –উক্তিটি কার?

ক. আব্বার
খ. আম্মার
গ. ফরিদের
ঘ. জুলেখার

২. 'তোরা মরে গেছিস, তোরা চুপ করে থাক। তোরা ওর ভাই নয়, বোন নয়' –আব্বার এই বিলাপে প্রকাশ পেয়েছে–

i. অসাম্প্রদায়িকতা
ii. পুত্রস্নেহের উন্মত্ততা
iii. সন্তান বাৎসল্য

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁয়াছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল!

৩. কবিতাংশে 'মানুষ' একাঙ্কিকার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো–

i. অসাম্প্রদায়িকতা
ii. ধর্মের উদারতা
iii. উদার মানবিকতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত ভাবের মধ্য দিয়ে কোন শিক্ষা গ্রহণ করা যায়?

ক. বর্ণবৈষম্য না করা
খ. মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন করা
গ. আর্তের সেবা করা
ঘ. অসহায়কে সাহায্য করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

ক. 'মানুষ' একাঙ্কিকায় কার কোনো ভয় নেই?

খ. আব্বার "চোখ মুখ হঠাৎ শিটিয়ে পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে গেল"– কেন?

গ. কবিতাংশের শেষ দুই চরণে 'মানুষ' একাঙ্কিকার যে ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত চেতনাই গড়তে পারে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুখী-সমৃদ্ধ পৃথিবী'– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

মৌসুম

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম

লেখক-পরিচিতি

বাংলা কথাসাহিত্যে শামসুদ্দীন আবুল কালাম একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর জন্ম ১৯২৫ সালে বরিশাল জেলার নলছিটি থানার কামদেবপুর গ্রামে। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল কালাম শামসুদ্দীন। প্রথমে এই নামেই তিনি লিখতেন। কিন্তু এই নামে বাংলা সাহিত্যে আরও একজন খ্যাতিমান লেখক থাকায় তিনি পরবর্তীকালে নিজের লেখক-নাম পরিবর্তন করেন। তিনি বরিশাল ও কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি ঢাকায় সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের শেষে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনপ্রবাহকে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর সাহিত্যে প্রাণবন্তরূপে পরিবেশন করেছেন। গ্রামীণ মানুষের ভাষাভঙ্গি, মনোভঙ্গি ও রুচিকে তিনি যথাযথভাবে সাহিত্যরূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। একটি জনপদ, তার জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও জীবনদর্শনের সারসত্যকে তিনি রূপায়ণ করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় সহানুভূতি। তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমকালীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট চিত্রিত হয়েছে। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'শাহেরবানু', 'পথ জানা নেই', 'অনেক দিনের আশা', 'দুই হৃদয়ের তীর' প্রভৃতি। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হলো : 'কাশবনের কন্যা', 'কাঞ্চনমালা', 'সমুদ্রবাসর', 'কাঞ্চনগ্রাম' ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯৭ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি ইতালির রোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একটানা খররৌদ্রে ক্ষেত-মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। চৈত্রমাস শেষ হয়ে গেল, তবু একফোঁটা জল নেই। এখনো দক্ষিণা হাওয়া কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে মৃদু মর্মর তুলে ঝিরঝিরিয়ে বয়, উদ্দাম হয়ে মৌসুমি সংবাদ আনে না। সময় সময় এমনও হয় যে নারকেল গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। পত্রঝরা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এত তীব্র রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে হঠাৎ বুঝি তা শুকনো ডালে আগুন ধরে যাবে।

প্রকৃতির এই রুক্ষতা নবাগত দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর মেয়ে অনসূয়ার শহুরে প্রাণ উদাসীন করে তোলে; সে প্রেরণা পায় বটে রবি ঠাকুরের গান গাইবার, কিন্তু চাষিদের মুখ ক্রমান্বয়ে আমসি হয়ে আসে। তাদের ঘরে ঘরে মনে মনে নামে দুর্ভাবনার অন্ধকার।

শুরু হয় জলের জন্যে কত রকম কান্নাকাটি। ধুমধাম করে এই সেদিন নীলপুজো করেছে, এবার মানে পিরের দরগায় সিন্নি, জনে জনে মানত করে, বাড়ি বাড়ি কীর্তন দেয়, এমনকি মৌলভি ডেকে দল বেঁধে শুকনো ক্ষেতে নেমে মিলাদও পড়ে। কিন্তু কোথায় দেয়ার গুরগুর ডাক!

দেখে দেখে অনসূয়ার তো আর হাসি থামে না। ওমনি করে বুঝি জল নামাবে! তাহলে আর মেঘমাল্লার রাগ তৈরি হয়েছিল কেন?

মা একরকম গাঁয়েরি মেয়ে, শহুরে বনতে পারেননি, তাছাড়া ঠাকুর-দেবতা নিয়ে হাসা-হাসি তাঁর ভালো লাগে না, তাড়া দিয়ে বলে ওঠেন : ওই-ই ওদের মেঘমল্লার তা বেশ তো যা না, তুই-ই যেয়ে নামা না জল!

অনসূয়া ঠোঁট ওলটাতো : আমার বয়ে গেছে। জল নামলেই তো কাদা। হোক গরম, তবু এই-ই বেশ আছি বাবা!

সত্যি বেশ আছে, অসুবিধা তো নেই-ই, ফুর্তিরও কমতি নেই অনসূয়ার। পাঁচ বছর বয়সে গ্রাম ছাড়ার পর এই আঠারো বছরে গ্রামে এসেছে সে। দিগন্ত বিস্তারিত খটখটে খোলা মাঠ।

সকালে বিকেলে ভাই বোনসহ মাঠে-ঘাটে নেমে ছুটোছুটি করে লুকোচুরি খেলে সে যেন এক নতুন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু গাঁয়ের হাওয়া বড় অস্বস্তি বোধ করে। বুড়োরা আমল না দেয়ার ভান করে, ঝি বউ মাতারিরা গালে হাত লাগিয়ে অবাক হয়ে থাকে, আর জোয়ানদের কেবল চোখ টাটায়। ওরা যখন হালকা খুশিতে মাঠে মাঠে ছুটোছুটি করে হেসে হেসে লুটোপুটি খায়, ওদের চিন্তাক্লিষ্ট মনে তখন কেমন ঈর্ষার জ্বালা লাগে। মনে মনে বলে : সবুর, নামুক না দেয়াই! দেখবো তখন এতো ফুর্তি কোথায় থাকে!

বুড়ো সখানাথ একদিন ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে শোনে, দত্ত চৌধুরীর মেয়ে বলছে : আহা আরও কিছুকাল যদি এমনি থাকে! জামাই বাবু আর দিদি এলে আরও মজা করে বেড়ানো যাবে।

কথাটা শুনে সখানাথের কেমন খারাপ লাগে। স্পষ্ট কথা বলা তার স্বভাব, তাই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে : ছিঃ ছিঃ কও কী সর্বনাশ্যা কতা!

দত্ত চৌধুরীর মেয়ে ভ্রু কোচকায়। মুখ লাল হয়ে ওঠে।

এবার সখানাথ একটু হাসে। দুপা এগিয়ে এসে আবার বলে : ছিঃ না, অমন কতা কইতে নাই। খরা থাকলে তোমাগো ভালো বই কি! কিন্তু মোগো যে সর্বনাশ। জল না অইলে ভাদ্দরইয়া ফসল যে পামু না।

অনসূয়া বাদে অন্য সবাই তার কথা শুনে হেসে ওঠে। অনসূয়া নিচু স্বরে ভৃত্যকে শুধায়, কে রে লোকটা! ভারি অভদ্রতা। গায়ে পড়ে কথা বলতে আসে।

: সখানাথ, গাঁয়ের চাষিদের মাতবর।

: মাতবর কী?

: মানে মোড়ল।

: অ তাই যেখানে সেখানে–

: কথাগুলি সবই সখানাথের কানে যায়।

অভদ্র বইকি–তার ওই বক্তব্যের আড়ালে যে কান্না তা ওদের কানে পৌঁছায়নি। ওরা জমিদার, ওদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সঙ্গে তাদের আসমান-জমিন ফারাক। ওরা এক জাত তারা অন্য। তাদের সর্বনাশেই তো ওদের পৌষমাস। এই তো রীতি।

কিন্তু সখানাথের ছেলে রমানাথ বাপের মুখে ঘটনাটা শুনে চটে উঠলো। ইচ্ছে হলো, তখুনি ছুটে গিয়ে দুটো কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে।

কিন্তু নিরস্ত্র করল সখানাথ : রাগের কিছু নাই রে, অমন ওরা বলেই।

অনসূয়া বাড়ি ফিরে বাপকে ঘটনাটা জানায় : দেখো তো কী আস্পর্ধা।

দ্বারিকানাথ বললেন : হু।

তিনি আরও অনেক শুনেছেন সখানাথের কথা। এখন নাকি সখানাথেরই মাতবরি : ওরই নেতৃত্বে সকলেরই বড় বাড় বেড়েছে। পাইক-পেয়াদা খাজনা চাইতে গেলে উলটে ধমকদিয়ে হাঁকিয়ে দেয়; পাই না খেতে, খাজনা দেবো কোত্থেকে? জমিদারকে নাকি ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই নেয় না আজকাল। গেল মাঘে কম্যুনিস্টরা না কারা যেন এসেছিল, তারা সখানাথের কানে যে মন্ত্রণা ঢেলে গেছে, এসব তারই ফল। এই তো প্রায় সপ্তাহখানেক হলো দেশে এসেছেন তিনি, অথচ একটা প্রজাকেও কাচারিতে চৌকাঠ মাড়াতে দেখা যাচ্ছে না।

দিনকাল খারাপ, তাই ঘাঁটাতে সাহস করেন না দ্বারিকানাথ। নইলে–

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাগতেই হলো।

এতদিন গ্রামে এসেছেন অথচ একটা প্রজাও সেলাম ঠুকতে এলো না, ব্যাপারখানা কী? খবর দিলেও যে কেউ আসে না। মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন এই জ্যৈষ্ঠে, এখন কত লোকজন জোগাড় দরকার–

তাই সখানাথকে খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার ছেলে নাকি মারমুখে হয়ে পাইককে হাঁকিয়ে দিয়েছে, বলেছে : আকালের দিনে আমরা না খেয়ে মরেছি, আর তোমার কর্তামশাই তখন এখানের চাল শহরে নিয়ে ব্যবসা করেছেন। আমাদের অবস্থাটা একবার চক্ষেও দেখতে আসেননি। যে জমিদার প্রজাপালক হতে পারে, তেমন তোমাদের মনিব নয়। আজ দায় পড়েছে তাই ডাকতে এসেছ, কিন্তু তাঁকে বলোগে বাপু, জমিদার যখন আমাদের জানেনি, আমরাও তাঁকে চিনি না।

শুনে আগুন হয়ে উঠলেন দ্বারিকানাথ। যে করে হোক ওদের শায়েস্তা করবার একটা দুর্দম ইচ্ছা হয়েছিল। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অথবা বাকি খাজনার দায়ে নিলাম করে তাড়িয়ে দিলে কে কী করতে পারবে তাঁর! কিন্তু নিষেধ করল নায়েব : না কর্তা, মামলা টামলা বা মারামারি করে সুবিধে হবে না। পেছনে স্বদেশিওয়ালারা রয়েছে, দেখছেন না কেমন সুন্দর দল পাকিয়েছে। এক্ষেত্রে চুপ করে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকাই ভালো, নইলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে।

সারা বাংলাদেশে প্রজাক্ষেপানো কাণ্ডকারখানাগুলি স্মরণ করে দ্বারিকানাথ শেষ পর্যন্ত অপমানটা হজম করেই নিলেন। মানুষ তো নয়, আদিম বর্বর ওরা, একবার ক্ষেপিয়ে দিলে কে বলতে পারে কী করে বসে! তবে জব্দ সখানাথদের করা চাই-ই। তবে একটু সবুর, মেয়ের বিয়েটা তো ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক।

স্বদেশিওয়ালারা কথা শুনে রোমান্সের গন্ধ পায় বাংলা ফিল্ম দেখা অনসূয়া। জনান্তিকে নায়েবকে শুধায়— স্বদেশিওয়ালাদের কথা যেন কী বলছিলেন কাকাবাবু, এখানেও আছে।

: আছে বই কী!

: লিডার কে তাদের?

: আর লিডারের কথা জিগ্যেস করছো, সে কোনো ভদ্দরলোক নয়, ঐ সখানাথ আর তার ছেলে ব্রহ্মনাথই ওদের লিডার।

: ও! হতাশ হয়ে পড়ে অনসূয়া।

এদিকে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহটাও অনাবৃষ্টিতে কেটে যায়। সর্বত্র খা খা করে শুষ্কতায়।

অবশেষে একদিন বিকেলে জোর হাওয়া দিল হঠাৎ। কয়েকটা দিন অসহ্য গুমোট ছিল। গাছের পাতাটি পর্যন্ত স্থির। আকাশেও ছিল না তীব্র রৌদ্র ঢাকা এক ফোঁটা মেঘ।

দারুণ গ্রীষ্মে যখন চারিদিক অস্থির, সেই সময় হঠাৎ একদিন হাওয়া এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ থেকে দেখতে দেখতে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এলো তার ধূসর পাল উড়িয়ে।

চাষিদের বুক আশায় কেঁপে ওঠে। আকাশের দিকে চেয়ে ‘আল্লা’ ‘আল্লা’ করে। ভগবান বুঝি শুনেছেন কান্না।

ক্রমাগত দুদিন ধরে সেই হাওয়া তীব্রবেগে বইতে থাকে। নতুন আমের মুকুল উড়ে গেল দিক হতে দিগন্তরে। আর সেই হাওয়ার সাথে পাল্লা দিল মেঘ। গুরু গুরু করে তাদের সে কী ডাকাডাকি আর মাঝে মাঝে বিজলি জ্বেলে ফরকানি!

শেষে নামল জল। ঝরঝর করে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। জল উঠল ক্ষেতে মাঠে। মেঘের ডাকে খালবিল ছেড়ে ওঠে, এলো হরেক রকম মাছ। রোজ রাত্রিবেলা ক্ষেতে ক্ষেতে মশাল জ্বেলে মাছ ধরার ধুম পড়ে গেল।

গভীর রাত্রে অন্ধকার মাঠে মশাল জ্বেলে সেই সমস্ত ছায়ামূর্তিকে যখন জানলা খুলে দেখত অনসূয়া, দ্বারিকানাথ ধমকে উঠতেন : জানলা বন্ধ করে দাও অনু, ঠান্ডা লাগবে। এতো একেবারে সাগরের নোনা হাওয়া, লাগলেই সর্দিতে পড়বে।

অনসূয়া অগত্যা শুয়ে গান ধরত কিংবা খুলে পড়ত উপন্যাস।

যাই বলে থাকুক, দ্বারিকানাথ ভেবেছিলেন সখানাথ শেষ পর্যন্ত আসবেই; কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ না দেখে শেষে নিজেই একদিন বেরোলেন।

অবিশ্যি এছাড়া বেরোবার অন্য এক কারণ ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাঁকে এক ব্যক্তিগত চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন : শুনতে পেলাম তোমাদের এলাকায় অন্নাভাব শুরু হয়েছে, সত্যি কি না জানাও তো।

এর উত্তর ঘরে বসে লিখে দিলেই চলত। কিন্তু তবু গ্রামটা একটু ঘুরে দেখবার ইচ্ছে হলো দ্বারিকানাথের।

অনসূয়া সঙ্গী হলো।

কিন্তু কই? ক্ষেতে ক্ষেতে চাষিরা যে গান গেয়ে হাল চষছে! সকলেরই মুখ হাসিখুশি। যেন নতুন করে জীবন পেয়েছে সব। সব দুশ্চিন্তা উড়ে গেছে। ব্যাপার কী, চালের দর তো সত্যি সত্যি ত্রিশ টাকায় পৌঁছেছে, এ অবস্থায় এমন তো হবার কথা নয়।

খোঁজ নিলেন, ঘরে খোরাকি রেখেছে কি না। কিন্তু তাও তো নয়।

ঘুরে ঘুরে শেষে এলেন সখানাথের বাড়ি। সখানাথ কোথায় বসাবে, কী করে সমাদর করবে ভেবে আকুল। অনসূয়া গেলো, অন্দরে।

দ্বারিকানাথ জিগ্যেস করলেন : কী খবর সখানাথ, তোমার যে দেখা পাওয়াই ভার!

: আইজ্ঞা মরিচক্ষেত লইয়া বড় ব্যস্ত ছিলাম, তাছাড়া মাথায় মৌসুমের দুশ্চিন্তা, ভাবলাম যাই ধীরে সুস্থে–

: হু! তা কেমন কাটাচ্ছ আজকাল?

: আইজ্ঞা, আপনার আশীর্বাদে ভালোই!

কথাটা হাত কচলে বললে বটে সখানাথ, কিন্তু দ্বারিকানাথ যেন কেমন ব্যঙ্গের গন্ধ পান। একে গত খন্দ ভালো হয়নি, তার ওপর এবারে চালের দর ত্রিশ টাকা, সখানাথের তো তেমন অবস্থা নয় যে এ অবস্থাতেই ভালো থাকবে।

তবু না দমে আবার শুধান : শুনেছিলাম, সকলেরই নাকি খুব অভাব যাচ্ছে, কিন্তু কই, ফুর্তিতেই তো আছ সবাই। সেবার আকালটা হঠাৎ এলো কি না, তাই সামলাতে সত্যি বেগ পেয়েছ, এবার আর তেমন অবস্থা হবে না, কী বল?

পানদানে করে পান নিয়ে এলো, সখানাথ তাই বাড়িয়ে দিয়ে বলে : ক্যামনে কই, মাথার উপরে আপনারা। তেমন অবস্থা না হওয়া, বাঁচা-মরার সবি তো আপনাগো হাতেই নির্ভর।

দ্বারিকানাথ একটা পান তুলে মুখে দিতে দিতে কথাটা উড়িয়ে দিতে চান : আমাদের হাতে আর কী ক্ষমতা! আজকাল জমিদারির কী অবস্থা তো জান না!

সখানাথের ছেলে হঠাৎ হেসে বললেন : অনেক ক্ষ্যামতা কর্তা। বাঁচাইতে না পারলেও মারতে তো পারেন।

দ্বারিকানাথের হাত থেকে চুনের বোঁটা খসে পড়ে।

অনসূয়াও এই সময় অন্দর থেকে চোখ-মুখ লাল করে ফিরে আসছিল, কথাটা শুনে সেও ভ্রু কোঁচকাল।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দ্বারিকানাথ, তারপর হাসার চেষ্টা করে বললেন : হে, হে, তা বেশ বলেছ। এই বুঝি তোমার ছেলে সখানাথ।

: আইজ্ঞা হ, ওরে বেটা পেন্নাম কর।

সখানাথ তাড়া দিলেও রমানাথের দিক থেকে তার কোনো উৎসাহ দেখা যায় না।

শেষ পর্যন্ত দ্বারিকানাথই বলে ওঠেন : থাক থাক, আর পেন্নাম করতে হবে না। বেশ ছেলে।

অনসূয়া ডাকল : বাবা!

হ্যাঁ, এই উঠছি। তোমার ছেলেকে কাল একবার পাঠিয়ে দিও সখানাথ।

সখানাথ হাত কচলে বললে : সে আপনেই কইয়া যান। আমার কথা আবার শোনে কি না।

কথাটা খেয়াল করে কান লাল হয়ে ওঠে দ্বারিকানাথের। তবু ফিরে দাঁড়িয়ে সখানাথের ছেলের উদ্দেশে মিষ্টি করে হাসার চেষ্টা করেন : বাপের কথা শোন না বুঝি? ছিঃ বাবা, উদ্ধত হতে নেই!

চুপ করে নতমুখ হয়ে রইল, তবে তার চেপে মুখে যে ভাব ফুটে উঠল, তাকে বিরক্তি প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। কিন্তু দ্বারিকানাথ তা খেয়াল না করার ভান করে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন। আচ্ছা, আমি চলি, তুমি কাল এসো একবার। তোমার মতো জোয়ান ছেলেই আমার দরকার–

: আমি যাইতে পারমু না।

কথার মাঝখানেই রমানাথের জবাবটা যেন শপাং করে দ্বারিকানাথের গায়ে এসে পড়ল। চোখ জ্বলে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিলেন। তবু হাসির চেষ্টা করে মোলায়েম স্বরে শুধালেন : কেন?

: বাড়িতে কাজ আছে।

আবার সেই চাবুকের মতো জবাব। যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি দৃঢ়। গোঁয়ারের মতো মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

: আঃ হারামজাদা, আদব করে বল! সখানাথ তাড়া দিয়ে ওঠে। অনসূয়ার চোখ তখন আগুন, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল দ্বারিকানাথের : বাবা! বলছে কাজ আছে, তবু ওর মতো লোককে তোমার কী এমন দরকার পড়ল?

এইবার রমানাথ বাঁকা চোখে একটু চাইলে তার দিকে। অনসূয়া দেখলে তার মুখ যেমন তৃপ্তিতে কঠিন তেমনি ব্যঙ্গ ভরা।

হাত ধরে এবার যেন সে টেনে নিয়ে যেতে চাইল দ্বারিকানাথকে।

কিন্তু আশ্চর্য দ্বারিকানাথের সামলে নেবার শক্তি। প্রচণ্ড প্রতাপ পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবহ রক্ত গরম হয়ে উঠলেও —ও, তাহলে থাক, তাহলে থাক–বলতে বলতে আবার তিনি বললেন : তাহলে তুমিই যেয়ো সখানাথ।

: যাবো। একটু নরম সুরে সম্মতি কবুল করে পিছু পিছু যেতে লাগল সখানাথ। মুখে ছিল অজস্র প্যাঁচাল।

অনসূয়া বা দ্বারিকানাথ কেউ সেদিকে কান দিল না। অথচ এবার খাঁটি কথাই বলছিল সখানাথ। চারদিকের অবস্থা সত্যিই খারাপ। ঘরে কেউই ধান চাল রাখেনি, কেমন করে বুঝবে যে এবারও এমনি বাজার চড়বে। এখন কী করে যে দুমুঠো জুটবে সে-ভাবনায় সবাই অস্থির। বাইরে এ আনন্দ তো নতুন মৌসুম পাওয়ার। আচ্ছা সেবার শুনলাম বর্মা শত্রুদের হাতে যাওয়ায় চালের দাম বেড়েছিল, কিন্তু এবার–

হঠাৎ দ্বারিকানাথকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে কথা থেমে গেল সখানাথের।

আচ্ছা সখানাথ, এত ঔদ্ধত্য তোমরা কোথায় পেলে বলো তো? ভাবছ বুঝি আমি এর প্রতিকার জানিনে?

: সে কী কতা কর্তা, ঔদ্ধত্য কই! ও, ছেলেটার কতা কইতে আছেন বুঝি? তা ওটা বরাবরই একটু এইরকম। তা ওর কতা ধইরেন না আপনি কর্তা, ওর হইয়া আমি মাপ চাই।

আবার কথা কাটাকাটির উপক্রম দেখে অনসূয়া ডাকে : বাবা! এই অভদ্রগুলোর সঙ্গে তবু তুমি কথা না বলে পারবে না?

সখানাথ হঠাৎ কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

দ্বারিকানাথ একটু নরম হয়ে বলেন : না, না, তোমার মাপ চাইবার কিছু নেই, সখানাথ। মাপ আমি করবই, যদি ও কাল আমার ওখানে আসে। তা তোমার ও ছেলেকে একটু বলে দিও সখানাথ, সে তো জানোই, কথা না মানার দরুন ওর ঠাকুরদাকে কাঁধের চাদর দিয়ে এক মাস আমার বাসায় জুতো মুছে দিতে হয়েছিল। হয়ত ও তা জানে না!

বাঁকা বিদ্রূপে সখানাথের চোখ বুঝি-বা মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল : খুব জানে কর্তা। সেই অপমান ভুলতে না পাইরাই তো আপনাগো উপর ওর অত ঘেন্না।

এবার আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে হঠাৎ হনহন করে এগিয়ে গেলেন দ্বারিকানাথ।

সখানাথ চোখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে চতুর্দিক। বেগবন্ত হাওয়ায় দূর-সমুদ্রগান। অগ্নিবরণ কৃষ্ণচূড়া ধূসর আকাশের গায়ে যেন আরও রক্তলাল। সখানাথ তৃপ্ত হয়ে চোখ বুজল : আ, আরও তীব্র মৌসুম এনে দাও ভগবান শোষণশুষ্ক পৃথিবীতে, আমাদের তৈরি ক্ষেতে আরও জাগুক নবজীবনতেজা অঙ্কুর।

দ্বারিকানাথ হন হন করে হাঁটছিলেন।

পেছনে অনসূয়া। নাকে তার ফোঁসানি : কেন অপমানিত হতে গেলে বাবা?

: তোকেও বলেছে নাকি কিছু?

: বলেনি! কম্যুনিস্টদের শেখানো কথা। বলে কিনা, তুমি চোরা কারবারি। পঞ্চাশ সনে মানুষের জান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ?—

: হুঁ! আচ্ছা দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি!

দেহের মধ্যে উষ্ণ রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। এই গ্রামের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতাদেরই বংশধর দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরী যা হুকুম দিয়েছেন, বিনা বাক্যব্যয়ে সব প্রজা তাই পালন করে ধন্য হয়েছে, এই-ই দেখে এসেছেন এতদিন। তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা দূরের কথা, তাকাতেও ভয় পেত। হঠাৎ সেই নিয়ম ভাঙার সাহস কারা জুগিয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই ধীরে ধীরে দ্বারিকানাথের মনের ক্রোধটা বেশির ভাগ তাদেরই ওপর গিয়ে বর্তায়।

: দাঁড়া খুঁজে বার করি পিছনে কারা আছে। তারপর—

: সখানাথ বললে কী শুনলে বাবা? মৌসুম পেয়েই না কি এত ফুর্তি, আর তারি জন্যে ওরা নাকি সবাই একটু বেসামাল।

: মৌসুম! মনে মনে ক্রূর হেসে ওঠেন দ্বারিকানাথ। মৌসুমই বটে।

কিন্তু জাদু, যারা তোমাদের নাচিয়ে দিয়েছে, তারা আবার ফাটকে পচতে গেল বলে! (সেটুকু ব্যবস্থাও করতে না পারলে এতকাল জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, এসপির সঙ্গে খানাপিনা আর খাতির করার মূল্য কী!) তারপর দাঁড়াও না, মৌসুম না হয় পেয়েছই, কিন্তু বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে যে আকাল কোন পুঁজি দিয়ে তাকে ঠেকাবে! আমার স্টক-করা চালের দাম তখন চড়চড় করে আরও বেড়ে যাবে। তখন কার দুয়ারে মাথা কোটো দেখব না! আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে আজই লিখে দেব : কোনো অভাব নেই, কিছু করতে হবে না তোমার।

সবুর! এ ফুর্তি আর কদিনের, আমারও মৌসুম সমাগত।

যেতে যেতে আবার জীবনের ওপর দোর্দণ্ড প্রতাপের সেই আগামী দিন কল্পনা করে খুশি হয়ে ওঠেন দ্বারিকানাথ। তারপর যেন অনেক গলার কেমন একটা আওয়াজ শুনে একবার পিছন দিকে তাকান। হাওয়ায় একটা দূরাগত হাসির রোল ভেসে আসছে নাকি? *[সংক্ষেপিত]*

শব্দার্থ ও টীকা

মৌসুম সংবাদ	–	দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে প্রবাহিত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যা বর্ষা ঋতুর সূচনা ঘটায় সেটাই মৌসুমি বায়ু নামে পরিচিত। এখানে মৌসুম সংবাদ বলতে বর্ষার আগমন সংবাদের কথা বলা হয়েছে।
দেয়া	–	মেঘ।
মেঘমল্লার রাগ	–	সংগীতের একপ্রকার রাগ, যা বর্ষা ঋতুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
মাতারি	–	একটি আঞ্চলিক শব্দ যা দিয়ে নারীকে বোঝানো হয়।

ভাদ্দরইয়া ফসল	–	ভাদ্র মাসে পাকে এমন ফসল বা ধান।
তাদের সর্বনাশেই তো ওদের পৌষমাস	–	একটি প্রবাদ আছে : কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। অর্থাৎ একটি ঘটনা যখন কারো জন্য আনন্দ নিয়ে আসে অথচ অন্যদের তা নিরানন্দের কারণ হয়। এখানে অনাবৃষ্টি যখন জমিদার-কন্যার সুখের কারণ তখন তা কৃষকদের জন্য সর্বনাশস্বরূপ।
আস্পর্ধা	–	দর্প। দুঃসাহস।
স্বদেশিওয়ালা	–	ব্রিটিশ শাসনামলে স্বদেশের অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিঃস্বার্থভাবে জীবনপণ লড়াইয়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।
ফরকানি	–	ঠিকরে বার হওয়া। মেঘের মধ্য থেকে বিদ্যুতের বের হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।
নোনা হাওয়া	–	লবণাক্ত বায়ু। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা বাতাস।
খন্দ	–	ফসল, শস্য। ফসলের মৌসুম।
কম্যুনিস্ট	–	কমিউনিজম তথা সাম্যবাদ বা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সংগ্রামশীল।

পাঠ-পরিচিতি

"মৌসুম" গল্পটি লেখকের 'অনেক দিনের আশা' (১৯৫২) নামক গল্পগ্রন্থে সংকলিত। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালের কাহিনি নিয়ে এ গল্প রচিত হয়েছে। তখন দেশে জমিদারি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে যে নতুন চেতনা সৃষ্টি হয়েছে সেটাই গল্পের মূল বিষয়। আর কৃষকদের মধ্যে এই নতুন উপলব্ধি জাগিয়ে তোলার মূলে সক্রিয় ছিল সমাজরূপান্তরকামী কমিউনিস্ট ও স্বাধীনতাকামী স্বদেশিওয়ালারা। অনাবৃষ্টি শেষে বৃষ্টির আগমনে কৃষকরা, আর্থিক দুর্দশা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ ফসলের কথা ভেবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়। ঘরে খাদ্য না থাকলেও নতুন ফসলের স্বপ্নে তারা বিভোর। এই আনন্দ জমিদার সহ্য করতে পারে না। অন্যদিকে শোষক জমিদারের কৃষকবিরোধী কর্মকাণ্ডে তরুণ কৃষকদের মধ্যে যে প্রতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তা দমনে নতুন পরিকল্পনা আঁটে জমিদার। চাল মজুদ করে দাম বাড়িয়ে সংকট সৃষ্টি করে জমিদার কৃষকদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। শোষক জমিদারের প্রজাবিরোধী স্বার্থপরায়ণতার বিপরীতে কৃষককুলের জাগরণের ইঙ্গিতেই গল্পটি তাৎপর্যবহ। নতুন কালের বাস্তবতা ও ব্যঞ্জনা নিয়ে গল্পটি বিশেষত্বমণ্ডিত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'স্বদেশিওয়ালাদের কথা যেন কী বলছিলেন কাকাবাবু?'– উক্তিটি কার?

ক. অনসূয়ার খ. নায়েবের
গ. দ্বারিকানাথের ঘ. সখানাথের

২. 'মাথায় মৌসুমের চিন্তা' বলতে বোঝানো হয়েছে–

i. চাষিদের নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা
ii. অভাবের তাড়নায় বিষণ্ন বিলাপ
iii. বর্ষায় নতুন ফসল বোনার বাসনা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।

৩. কবিতাংশের 'সচেতনতার ধান' কথাটি "মৌসুম" গল্পের সাথে যেসব দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো-

i. অধিকার আদায়ে সোচ্চার
ii. প্রাকৃতিক বৈরিতায় কৃষকের বিপর্যয়
iii. শোষকের বিরুদ্ধে সোচ্চার

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল নিচের কোনটি?

ক. সমাজ পরিবর্তনকারী মানুষের প্রচেষ্টা
খ. গ্রীষ্ম প্রকৃতির প্রচণ্ড দাবদাহ
গ. জমিদারের নির্মম শোষণ-বঞ্চনা
ঘ. কৃষক শ্রেণির ঐক্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

তুরাগ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক আকবর সাহেব কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী যেমন– ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, ছোলা, চিনি, খেজুর এসব দ্রুত মজুদ করেন। কারণ রমজান মাস আসন্ন। আর রমজানে এসব জিনিসের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাই অধিক মুনাফার এখনই সময়। ফলে রমজান আসতে না আসতেই কৃত্রিম সংকটের কারণে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্য দেখা দেয়। দিশেহারা হয়ে পড়েন সোবহান মিয়ার মতো সাধারণ মানুষেরা। আধপেটা খেয়ে কোনোভাবে এরা রমজানে রোজা রাখেন, আর সুদিন আসার জন্য ফরিয়াদ করেন স্রষ্টার কাছে।

ক. গাঁয়ের চাষিদের মাতবর কে?

খ. "অনসূয়ার চোখে তখন আগুন"– কেন?

গ. আকবর সাহেবের সাথে "মৌসুম" গল্পের দ্বারিকানাথের চারিত্রিক সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সখানাথদের জীবনে "মৌসুম" আসে কিন্তু সোবহানদের জীবনে সুদিন আসে না কেন? কারণ বিশ্লেষণ কর।

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া

আবদুল্লাহ আল-মুতী

লেখক-পরিচিতি

প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন। তিনি ১৯৩০ সালের পহেলা জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দিন এবং মাতা হালিমা শরফুদ্দিন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে এমএ এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল-মুতী প্রথম জীবনে শিক্ষকতা ও শিক্ষা প্রশাসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এদেশের জনপ্রিয় এই বিজ্ঞান লেখক বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বিষয়ে অবিরাম লিখে গেছেন অনুপম ভাষায়। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ২৮। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে 'বিজ্ঞান ও মানুষ', 'এ যুগের বিজ্ঞান', 'বিপন্ন পরিবেশ', 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা', 'সাগরের রহস্যপুরী', 'মেঘ বৃষ্টি রোদ', 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', 'আবিষ্কারের নেশায়', 'রহস্যের শেষ নেই', 'জানা-অজানার দেশে', 'তারার দেশের হাতছানি', 'আমাদের বিজ্ঞান কোন পথে', 'আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ', 'মহাকাশে কী ঘটছে', 'পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে' ইত্যাদি।

তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার, একুশে পদক, ড. কুদরাত-এ-খুদা স্বর্ণপদক, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

তিনি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ'-এর প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি এবং বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন ১৯৯৮ সালের ৩০এ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আমাদের চারপাশের পৃথিবী যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে তা সহজে মেনে নেওয়া আজো অনেকের পক্ষেই বেশ শক্ত। তাই দেখা যায় এই বিশ শতকের শেষেও এমন লোকের অভাব নেই যারা মনে করে এই পৃথিবীটা সৃষ্টির সময়ে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি রয়েছে; শুধু বেড়েছে মানুষ—আর বদলেছে তাদের পোশাক-আশাক, কথা বলার ধরন। তবে সুখের বিষয় এ রকম লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। বেশির ভাগ লোক আজ মনে করে আগের দিনের চাইতে পৃথিবী অনেক বদলে গিয়েছে— আর এখনও ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

আগে চারপাশের বেশির ভাগ পরিবর্তন ঘটত খুব ধীরে ধীরে—'প্রাকৃতিক নিয়মে'। কিন্তু আজ এমনি ধারার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের প্রভাব যোগ হয়েছে। মানুষ কখনো জেনেশুনে নিজেদের অজান্তেই প্রকৃতির ওপর নানা ধরনের 'খোদকারি' করে চলেছে। তাতে আমাদের চারপাশে নানা পরিবর্তন ঘটছে বেশ দ্রুত তালে। অল্পদিনের মধ্যেই চোখে পড়ছে প্রকৃতিতে নানা ধরনের রদ-বদল।

শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে আজ পর্যন্ত সোয়া দুইশো বছরে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে দ্রুত। সারা পৃথিবী জুড়ে যত মানুষ বাড়ছে তত তারা গড়ে তুলছে অসংখ্য শহর-বন্দর, পথঘাট। গাছ কেটে সাফ করছে বন-জঙ্গল; কোথাও ভরাট করছে জলা জায়গা, কোথাও নদীতে দিচ্ছে বাঁধ। দু-এক প্রজন্মের মধ্যেই কোথাও নদীতে চড়া জেগে পত্তন হচ্ছে ফসলি জমি, আবার কোথাও উর্বর আবাদি জমি হয়ে যাচ্ছে ধু ধু মরুভূমি। আর এসব শুধুই যে চারপাশের গাছপালা, পশুপাখির ওপর ছাপ ফেলছে তা নয়, বদলে দিচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু, মানুষের জীবনযাত্রা।

প্রাচীনকালে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটত, মানুষ টের পেত অনেকটা পরিবর্তন ঘটে যাবার পর। আজ বিজ্ঞানীরা অনবরত চারপাশের নানা মাপজোখ নিচ্ছেন। তার ফলে আমরা বুঝতে পারছি তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, হাওয়ার আর্দ্রতা– এসব বছর বছর কতটা বাড়ছে বা কমছে। কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে আগামী দিনে কী ঘটতে পারে সেসব সম্ভাবনা নিয়ে।

গত ক-দশক ধরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করছেন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যেন ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। আমাদের দেশে মাপজোখ ছাড়াই সবাই বুঝতে পারছে গরম যেন বেশি পড়ছে, আবহাওয়া আগের চেয়ে বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে অর্থাৎ গত প্রায় দেড়শ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি হলো মোটামুটি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর যতদূর মনে হচ্ছে তাপমাত্রার এই বৃদ্ধি আগামী দিনেও চলতে থাকবে। এমনিতে শুনতে এক ডিগ্রি বৃদ্ধি তেমন কিছু মনে হয় না; কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন এমনি সামান্য পরিবর্তন থেকেই অতীতে অনেক বিশাল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যে কারণে আজ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে উঠছে তাকে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া।

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া কী?

নানা ধরনের উপাদানের কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকেই বলা হয় গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া। শীতের দেশে খুব ঠান্ডার সময়ে গাছপালা জন্মাবার জন্য এক ধরনের কাচের ঘর ব্যবহার করা হয়; তাকে বলা হয় গ্রিন হাউস বা কাচের কুঠি–সেই থেকেই এসেছে এই নাম। কাচের দেয়ালের একটা গুণ হলো তার ভেতর দিয়ে ছোট মাপের আলোর ঢেউগুলো ঢুকতে পারে, কিন্তু তাতে ঘরের ভেতরটা গরম হয়ে উঠে লম্বা মাপের যে অবলোহিত তাপরশ্মি ছড়াতে থাকে তা আর এই কাচ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না। তার ফলে ওই ঘরের ভেতরটা গরম থাকে। বায়ুমণ্ডলের কিছু কিছু গ্যাস যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন এরাও ঠিক এমনিভাবে সূর্যের তাপকে আটকে রাখে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে যদি এ ধরনের গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে ওঠে তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে পারে।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ কিছুদিন ধরে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাতাসের প্রধান দুটো গ্যাস হলো নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। নাইট্রোজেন থাকে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ আর অক্সিজেন থাকে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ। আরও থাকে আরগন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি নানা উপাদান। তাদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব সামান্যই–আয়তন হিসেবে প্রতি দশ হাজার ভাগের মাত্র তিন ভাগের মতো।

১৭৫০ সাল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল মোটামুটি প্রতি দশ হাজার ভাগের ২.৭৫ ভাগ; ১৯৫৯ সালে দাঁড়ায় ৩.১৬ ভাগ; ১৯৯৩ সালে হিসাব করা হয়েছে ৩.৫৭ ভাগ। পৃথিবীতে যে হারে কয়লা, তেল এসব খনিজ জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে আর বন-জঙ্গলের পরিমাণ কমছে তাতে মনে হয় একুশ শতকের মাঝামাঝি এই গ্যাসের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি দশ হাজারে চার থেকে ছ-ভাগ অর্থাৎ আজকের তুলনায় অন্তত ২৫ শতাংশ বেশি। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ায় নানা ধরনের গুরুতর প্রভাব পড়বে।

আগেই বলেছি, বাতাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে সে অতি সামান্য মাত্রায়। আর এই সামান্য মাত্রায় থাকাটা আমাদের জন্য বেশ দরকারিও বটে। বাতাসের এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছপালার সালোক সংশ্লেষণের জন্য খুব জরুরি। গাছপালায় সালোক সংশ্লেষণ না ঘটলে আমাদের খাবার-দাবার কিছুই জুটবে না। তাছাড়া বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড আদৌ না থাকলে পৃথিবী মহাশূন্যে তাড়াতাড়ি তাপ ছড়িয়ে দিয়ে অতিমাত্রায় ঠান্ডা হয়ে পড়ত। কিন্তু এই সামান্য মাত্রা গ্যাসের পরিমাণে যদি ওঠা-নামা ঘটে তবে তাতেও পৃথিবীর জলবায়ুতে ঘটতে পারে বড় রকম ওলট-পালট।

পৃথিবীর ওপর সূর্যের যে বিপুল শক্তি এসে পড়ে তার মোটামুটি অর্ধেক পৃথিবীর গায়ে পড়বার আগেই ঠিকরে যায় বাতাসের আবরণ থেকে, মেঘ থেকে, বরফের স্তূপ থেকে। যে অর্ধেকটা পৃথিবী শুষে নেয় তারও বেশির ভাগ পৃথিবী আবার ছড়িয়ে দেয় লম্বা মাপের তাপরশ্মির আকারে। এসব তাপরশ্মির সবটা তা বলে পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে না; অনেকটা আটকে পড়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। এই আটকে দেবার ব্যাপারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের একটা বড় ভূমিকা আছে। এর ভেতর দিয়ে সূর্যের ছোট মাপের আলোকতরঙ্গ সহজেই এসে পড়তে পারে পৃথিবীতে, কিন্তু এসব আলোকতরঙ্গ পৃথিবীর ওপর পড়ে যে বড় তাপতরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা এই গ্যাসের বাধা ডিঙিয়ে মহাশূন্যে পালিয়ে যেতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের আরও যেসব উপাদান এভাবে তাপ আটকে রাখতে পারে তার মধ্যে রয়েছে জলীয় বাষ্প, ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বন (এই গ্যাসটি নানারকম স্প্রেতে এবং হিমায়ক ও শীতাতপ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়), ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি।

বিশ শতকে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিন গুণ—১৭০ কোটি থেকে হয়েছে ৫৭০ কোটির ওপরে। কিন্তু এই সময়ে খনিজ জ্বালানির ব্যবহার বেড়েছে প্রায় পনেরো গুণ। এতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও বাড়ছে; তার ফলে পৃথিবীতে বেশি বেশি তাপ আটকে থাকছে—বেড়ে উঠছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই হারে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে ২০৩০ সালের কাছাকাছি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়তে পারে আজকের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তারপরও এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি সম্ভবত চলতেই থাকবে। একুশ শতকের শেষে তাপমাত্রা বাড়তে পারে আজকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এই সঙ্গে গত কিছুদিন ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বিজ্ঞানীরা লক্ষ করছেন। বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে সূর্যকিরণ পড়ার ফলে তিন-পরমাণুযুক্ত এক ধরনের অক্সিজেন অণু তৈরি হয় (সাধারণ অক্সিজেন অণুতে থাকে দুটি করে পরমাণু)—একে বলা হয় ওজোন গ্যাস। পৃথিবীর বিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার উঁচুতেই এই ওজোন গ্যাস থাকে সব চাইতে বেশি। এই গ্যাসের একটা গুণ হলো এরা সূর্যের তীব্র অতিবেগুনি রশ্মিকে শুষে নিতে পারে। ওজোন স্তর এসব রশ্মি শুষে না নিলে পৃথিবীতে আমাদের গা ঝলসে যেত। এই স্তর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং পৃথিবী থেকে ছড়িয়ে পড়া তাপরশ্মি শুষে নিয়ে কিছুটা তেতে ওঠে।

সম্প্রতি নভোযান থেকে পাওয়া তথ্য পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, মানুষ ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বন প্রভৃতি কৃত্রিম রাসায়নিক বস্তু ব্যবহারের ফলে উঁচু বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাতে মানুষের চামড়া ঝলসে যাবার বা মানুষের চামড়ায় ক্যানসার হবার আশঙ্কা বাড়ছে; সেই সঙ্গে উঁচু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমছে। ওজোন স্তরের পরিমাণ যদি মাত্র এক শতাংশ কমে যায় তাতেই পৃথিবীতে অতিবেগুনি রশ্মিপাতের পরিমাণ বেড়ে যায় দু-শতাংশ। এই রশ্মির পরিমাণ ৫ শতাংশ বাড়লে অণুজীবদের জীবনচক্র অর্ধেক হয়ে যায়; যদি বাড়ে ১০ শতাংশ তাহলে গাছপালা আর সালোক সংশ্লেষণ চালাতে পারে না। সে রকম অবস্থা যদি কখনো ঘটে তাহলে পৃথিবীর প্রাণিকুলের জন্য এবং সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য এক মহাবিপদ ঘনিয়ে আসবে।

জলবায়ুর পরিবর্তন আগেও ঘটেছে

পৃথিবীজুড়ে তাপমাত্রার বৃদ্ধি যে প্রথম ঘটছে তা নয়। ঘটেছে আগেও বহুবার। পৃথিবীর জলবায়ু বদলেছে বার বার; তাই এটা এমন কিছু আশ্চর্যজনক বা অস্বাভাবিক কাণ্ড নয়। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, গত একশ কোটি বছরে পৃথিবীর ওপরে দেখা দিয়েছে অন্তত চারটি বেশ বড় রকম বরফের যুগ। এমনি এক একটি যুগে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিশাল এলাকা ঢাকা থেকেছে বিপুল পরিমাণ বরফের স্তূপে। আজ আমরা আছি এর মধ্যে শেষ বরফের যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে।

গত একশ কোটি বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা থেকেছে মোটামুটি ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এসব সময়ে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলগুলোও থেকেছে বরফমুক্ত; অথচ আজ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হলো প্রায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর এখন অ্যান্টার্কটিকা আর গ্রিনল্যান্ডে প্রায় দু-মাইল পুরু বরফের আস্তরণ বিছানো রয়েছে।

এমনি শেষ বরফের যুগ দেখা দিয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে। তারপর থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর পর পর আবার বরফ গলেছে; কিছুটা উষ্ণ জলবায়ু থেকেছে গড়পড়তা দশ হাজার বছর ধরে, তারপর আবার এসেছে প্রচণ্ড শীত। কাজেই গত দশ লাখ বছরে মানুষের মাথার ওপর দিয়ে গেছে অন্তত ন-টা প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ; এসব সময়ে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার বেশির ভাগ জায়গা ঢাকা পড়েছে বিশাল বরফের স্তূপে। তবে এসব বরফের যুগ এসেছে বহু হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে; বরফ গলেছেও তেমনি বহু হাজার বছর ধরে। তাতে গাছপালা, জীবজন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে।

সবশেষের বরফের পাঁজা গলতে শুরু করেছিল আমাদের সময়ের ১৪,০০০ থেকে ১৮,০০০ বছর আগে। পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গা থেকে বরফের ঢাকা সরে যায় মোটামুটি দশ হাজার বছর আগে; আট হাজার বছর আগে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। তার ফলে মিসর, সুমেরিয়া, ভারত, চীন এসব দেশে দেখা দেয় মানুষের সভ্যতার বিকাশ।

তবে আগেকার এসব আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে আজকের তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আগেকার পরিবর্তনগুলো ঘটেছে হাজার বা লক্ষ বছর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে, অথচ আজ অনেকটা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে এসব পরিবর্তন ঘটছে অনেক কম সময়ের মধ্যে। গত হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতিকে কেবলই জয় করতে আর ব্যবহার করতে চেয়েছে, প্রকৃতির নিজের স্বাস্থ্য আর স্বস্তির প্রয়োজনের কথা তেমন ভাবেনি। আজ প্রকৃতি যেন তারই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে!

বহু লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল কম, তাই প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভাবটা তেমন বড় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গত কয়েক শতকে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে বিপুল হারে। মানুষ গোগ্রাসে শেষ করছে বনের গাছপালা, জমির সার পদার্থ, নদীর মাছ, ভূগর্ভের খনিজ, বাতাসের অক্সিজেন, পৃথিবীর প্রাণিসম্পদ। এর ফলে পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে প্রকৃতি তার ক্ষতি কিছুতেই পুষিয়ে নিতে পারছে না। ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য আজ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

তাপমাত্রা সত্যি কি বাড়ছে?

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়লে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে এটা না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি যে তাপমাত্রা বাড়ছে, আর বাড়লেও ঠিক কী হারে বাড়ছে তা কি বিজ্ঞানীরা একেবারে নিশ্চিতভাবে জেনেছেন?

আসলে পৃথিবীব্যাপী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে এবং নিখুঁতভাবে হিসাব করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। আরও কঠিন হলো এ ধরনের বৃদ্ধির সঠিক কারণটিকে চিহ্নিত করতে একদল বিজ্ঞানী বলছেন গত দু-শ বছরে যত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো হয়েছে আর তাতে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটেছে তাতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা আরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল।

আরেক দল বিজ্ঞানী অবশ্য এ রহস্যের একটা সমাধানও দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে শুধু তো কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটছে না, সেই সঙ্গে সালফার ডাই-অক্সাইড বা সালফেট-এরও নিঃসরণ ঘটেছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড যেমন আলোকরশ্মিকে ঢুকতে দেয় আর তাপরশ্মিকে পৃথিবী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধা দেয়, সালফেটের বেলায় ঘটে অনেকটা এর উল্টো ব্যাপার। বাতাসে ভাসমান সালফেট কণা সূর্যের আলোকরশ্মিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ঢুকতে বাধা দেয়; কাজেই তার প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বরং কমে যায়।

বায়ুমণ্ডলে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড আর বেশি সালফার ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ ঘটলে (যেমন এখন ঘটছে) তার ফলে কী পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি হতে পারে তার কম্পিউটার মডেল তৈরি করে অতীত ও বর্তমানের পর্যবেক্ষণের

সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মডেলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের খুবই মিল রয়েছে। আবার আরও কিছু বিজ্ঞানী প্রথমে শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হচ্ছে ধরে মডেলটি চালালেন, তারপর আবার চালালেন কার্বন ডাই-অক্সাইড আর সালফার ডাই-অক্সাইডের মিলিত নিঃসরণ ধরে। দেখা গেল শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হলে যে পরিমাণ তাপমাত্রা বাড়ে তার চেয়ে দু-ধরনের নিঃসরণ মিলিত হলে তাপমাত্রা কিছুটা কম বাড়ে। পর্যবেক্ষণের তথ্যের সঙ্গে এরই মিল বেশি। এমনকি উঁচু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমেও যেতে পারে। আর এই মিলিত ফলে প্রতি দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ে প্রায় ০.২০ সেলসিয়াস (অর্থাৎ এক শতাব্দীতে দুই ডিগ্রি)।

বাংলাদেশে কী ঘটতে পারে?

ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া আর উঁচু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমে যাওয়া—এই দু-ধরনের পরিবর্তনের ছাপ এর মধ্যেই পৃথিবীর জলবায়ুতে পড়তে শুরু করেছে। তবে এই ছাপ যে পৃথিবীর সব জায়গায় একইভাবে পড়ছে তা নয়। সাধারণভাবে চারপাশের তাপমাত্রা বাড়লে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হয় বেশি, তাতে বৃষ্টিপাত বাড়ে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন গ্রীষ্মমণ্ডলে যতটা ঘটবে নাতিশীতোষ্ণ বা হিমমণ্ডলে ঘটতে পারে তার চাইতে তিন গুণ বেশি। আবার শীতপ্রধান এলাকাগুলো বেশি উষ্ণ হয়ে ওঠার ফলে পৃথিবীর সাধারণ বায়ু প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। বায়ুপ্রবাহ কমলে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকায় ক্রমাগত বৃষ্টি হতেই থাকবে, আবার হয়ত খরাপ্রবণ এলাকায় আরও তীব্র খরা দেখা দেবে অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে পৃথিবীর বেশির ভাগ এলাকায় একুশ শতক থেকে আবহাওয়ায় বিরাট রকম বিপর্যয় ঘটতে শুরু করবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব পরিবর্তনের কিছু কিছু নমুনা এর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা, বিশেষ করে হিমমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে ওঠার আরও একটা গুরুতর ফল হবে। মেরু অঞ্চলের ও হিমবাহের বরফ গলতে শুরু করবে; তাছাড়া উষ্ণতা বাড়লে সাগর জলের আয়তনও বেশি হবে। আর তাতে পৃথিবীজুড়ে সাগরের উচ্চতা বাড়বে। এর ফলে সমুদ্রতীরের অনেক নিচু অঞ্চল তলিয়ে যাবে। তখন চাষের জমিতে সমুদ্রের লোনা পানি এসে ঢোকার ফলে দেশের বিরাট এলাকায় চাষবাস নষ্ট হবে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বলছেন, একুশ শতকে পৃথিবীর উষ্ণতা আজকের তুলনায় গড়ে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেশি হলে সাগর জলের আয়তন যেটুকু বাড়বে শুধু তাতেই সাগরের উচ্চতা বেড়ে উঠতে পারে এক মিটারের মতো। এতে বাংলাদেশের মতো বদ্বীপ অঞ্চলের দেশে সমুদ্রতীরের বিশাল এলাকা তলিয়ে যাবার ফলে গৃহহারা হবে অন্তত এক কোটি লোক, মিসরেও ঘটবে এমনি। একুশ শতকের শেষে সাগরতলের উচ্চতা বাড়তে পারে তিন মিটার; তাহলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা তলিয়ে যাবে আর উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে প্রায় অর্ধেক লোক।

শুধু যে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত আর খরাই কৃষিতে প্রভাব বিস্তার করবে তা নয়, কার্বন ডাই-অক্সাইড গাছপালার বৃদ্ধির জন্য একান্ত জরুরি। কাজেই হাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে ফসলের ফলন বাড়তে পারে। অবশ্য সেই সঙ্গে আগাছারও বাড়-বাড়ন্ত হবে। তাতে মাটিতে নাইট্রোজেনের ঘাটতি হয়ে ফসলের ক্ষেতে রোগবালাই বাড়তে পারে; কীটপতঙ্গের আক্রমণ ঠেকানোও হয়ত ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠবে।

তবে একটা বিষয় আজ বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তা হলো বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পায়ন হয়েছে খুব কম; তারা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে সামান্য, আর তাই কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনও করে শিল্পোন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক কম। এসব দেশে ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বন জাতীয় ক্ষতিকর গ্যাসের ব্যবহারও সামান্যই। কাজেই আজকে আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত যে পরিবেশগত বিপদ সারা পৃথিবীর সামনে বিশাল হুমকি সৃষ্টি করেছে তার সমাধান রয়েছে প্রধানত শিল্পোন্নত দেশগুলোর হাতে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নানারকম গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য আজ তাদেরই সবার আগে উদ্যোগ নিতে হবে।

কিন্তু তা বলে বাংলাদেশে আমরা হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের দেশে আবহবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে চর্চা ও গবেষণা জোরদার করা দরকার; সারা দেশে, বিশেষত উপকূল অঞ্চলে উন্নত তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করা দরকার; উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনায়ন প্রভৃতি গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি নেবার কথা এখন থেকেই ভাবতে হবে। *[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]*

শব্দার্থ ও টীকা

খোদ্‌কারি – মানব কর্তৃক প্রাকৃতিক নিয়মবিরোধী কার্যক্রম।

শিল্পবিপ্লব – ইউরোপে ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ কালপর্বে কলকারখানা ভিত্তিক উৎপাদনের যে বিপুল উত্তরণ ঘটে তাই শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। এই প্রক্রিয়ায় যন্ত্র ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক উৎপাদন, বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার, যন্ত্রের ব্যবহার এবং জ্বালানি শক্তি হিসেবে কয়লার ব্যবহার গুরুত্ব পায়।

সেলসিয়াস – তাপমাত্রা পরিমাপের একটি স্কেল। যার নিম্ন স্থিরাঙ্ক ০ ডিগ্রি এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি।

অবলোহিত তাপরশ্মি – লাল আলো হতে দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি।

আলোক তরঙ্গ – নির্দিষ্ট পথে আলোক শক্তির গমন।

তাপ তরঙ্গ – একপ্রকার তরঙ্গ যা কোন মাধ্যম ছাড়াই বিকিরণের মাধ্যমে উষ্ণ স্থান হতে শীতল স্থানে সঞ্চালিত হয়।

অতিবেগুনি রশ্মি – বর্ণালীতে বেগুনি আলোর বাইরে যে অদৃশ্য আলো থাকে তাকে অতিবেগুনি রশ্মি বলে। এ রশ্মি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। অতিবেগুনি রশ্মি জীবাণুনাশক।

অণুজীব – অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না এমন জীব। যেমন, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা।

অ্যান্টার্কটিকা – পৃথিবীর দক্ষিণতম মহাদেশ। এই মহাদেশেই দক্ষিণমেরু অবস্থিত। তুষারাবৃত এই মহাদেশকে ঘিরে রয়েছে দক্ষিণ মহাসাগর। এই মহাদেশ সবচেয়ে শীতল, শুষ্ক। এখানে স্থায়ী কোনো মানববসতি নেই। পেঙ্গুইন ও সিল এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

জীবাশ্ম জ্বালানি – প্রস্তরীভূত প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি।

গ্রীষ্মমণ্ডল – বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বের কর্কট ও মকর ক্রান্তির অন্তর্গত গ্রীষ্মপ্রধান ভূ-ভাগ।

হিমমণ্ডল – দুই মেরুর সন্নিহিত ক্ষীণতম সূর্যালোক বিশিষ্ট ভূ-ভাগ।

হিমবাহ – পর্বতগাত্র বেয়ে নিম্নদিকে ধীরে প্রবহমান তুষার স্রোত।

আবহবিজ্ঞান – আবহাওয়াবিষয়ক বিজ্ঞান। Metorology।

সমুদ্রবিজ্ঞান – ভূ-বিজ্ঞানের একটি শাখা। এই জ্ঞানশাখা সামুদ্রিক জীব, সামুদ্রিক পরিবেশ, সমুদ্রের স্রোত ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে। Oceanography

ভূ-বিজ্ঞান – পৃথিবী। গ্রহ সম্পর্কিত বিজ্ঞান যা পৃথিবীর আবহ, স্থলভাগ, জলভাগ, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে। এই গবেষণার সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত ইত্যাদি গভীরভাবে সম্পর্কিত। Earth Science।

ম্যানগ্রোভ বনায়ন – উপকূলীয় ও জোয়ার প্লাবিত অঞ্চলে জন্ম নেওয়া বৃক্ষের অরণ্য। এই ধরনের অরণ্যে প্রায় আশি প্রজাতির বৃক্ষ জন্মায়। বাংলাদেশের সুন্দরবন এ ধরনের অরণ্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পাঠ-পরিচিতি

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রবন্ধটি আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিনের 'পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। শিল্পবিপ্লব, জ্বালানির অতি ব্যবহার, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, শহর-বন্দর-রাস্তা-ঘাট তৈরি, বন-জঙ্গল উজাড় ইত্যাদি নানা কারণে সাম্প্রতিক কালে অতিদ্রুত বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু ও মানুষের জীবনযাত্রা। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, এসব পরিবর্তনের মূলে রয়েছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার ক্রমবৃদ্ধি। যে কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিজ্ঞানীদের ভাষায়, তাকেই বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া।

মানবকল্যাণের জন্য নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে বিভিন্ন গ্যাস ও খনিজ জ্বালানির অতি ব্যবহারের ফলে আগামী ২০৩০ সালে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং শতাব্দী শেষে এই বৃদ্ধি দাঁড়াতে পারে ১.৫ ডিগ্রি থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সে-ক্ষেত্রে অণুজীবদের জীবনচক্র হুমকির মুখে পড়ে ব্যাহত হবে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। ঘনিয়ে আসতে পারে পৃথিবীর মানুষ ও প্রাণিকুলের জন্য মহাবিপদ।

প্রকৃতির নিজের স্বাস্থ্য ও স্বস্তির প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে মানুষ কেবল নিজেদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে জয় ও ব্যবহার করতে যাওয়ায়ই প্রকৃতির ভারসাম্য আজ হুমকির মুখে। এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, তীব্র খরা, মরুকরণ, উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাওয়াসহ নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি হবে। পৃথিবীর সামনে পরিবেশগত বিপর্যয়ের যে হুমকি রয়েছে সে-ব্যাপারে সচেতন করে তোলা হয়েছে এ রচনায়।

বহুনির্বাচনি অংশ

১. একুশ শতকের শেষে সাগরতলের উচ্চতা কত মিটার বাড়তে পারে?

ক. দুই খ. তিন

গ. পাঁচ ঘ. ছয়

২. প্রকৃতির ওপর নানা ধরনের 'খোদকারি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

i. প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করা

ii. প্রকৃতির স্বাভাবিকতা নষ্ট করা

iii. প্রকৃতির সাথে বৈরী আচরণ করা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের মাথায় হাত। কারণ ক্রমাগত খরায় মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। বর্ষা মৌসুম শেষ হয়ে এলেও বৃষ্টির কোনো দেখা নেই। ফসলের মাঠেও বিচিত্র সব কীট-পতঙ্গের আক্রমণ। আর কৃষকরা মাঠে নামলেই প্রচণ্ড রোদে তাদের গা যেন ঝলসে যাবার উপক্রম হয়।

৩. উদ্দীপকে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য দায়ী হলো–

i. মাটিতে নাইট্রোজেন কমে যাওয়া

ii. বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়া

iii. বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাস কমে যাওয়া

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকের সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী?

ক. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো
খ. অপরিকল্পিত শিল্পায়ন কমানো
গ. নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন না করা
ঘ. পৃথিবীর উষ্ণতা কমানো

সৃজনশীল প্রশ্ন

মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর
চারিদিকে শুনি হাহাকার।
ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কণ্ঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।
মাটি অরণ্যের পানে চায়
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা! জাগো আজি,
মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা।

ক. "গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া"– কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

খ. বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাস অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. কবিতাংশের বক্তব্যে "গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া" প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত দিকের যৌক্তিকতা "গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া" প্রবন্ধে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে – মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ
শওকত আলী

লেখক-পরিচিতি

কথাসাহিত্যিক শওকত আলী পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম খোরশেদ আলী সরদার এবং মায়ের নাম মোসাম্মত সালেমা খাতুন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চলে আসেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে। ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। অভাব অনটনের মধ্যেই চালিয়ে যান নিজের লেখাপড়া। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে এমএ পাস করেন। সাংবাদিকতা, শিক্ষকতাসহ বিভিন্ন ধরনের পেশায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর সর্বশেষ তিনি সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

জীবনকে নিবিড়ভাবে অবলোকন করা এবং বিচিত্র জীবনপ্রবাহকে শিল্পাবয়ব প্রদান শওকত আলীর সাহিত্যভাবনার মূল প্রবণতা। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচনায়। তিনি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। শওকত আলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘পিঙ্গল আকাশ’, ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’, ‘উত্তরের ক্ষেপ’, ‘লেলিহান সাধ’ প্রভৃতি।

বাতাস উঠলে এখন টাঙনের পানিতে কাঁপন লাগে না। পানি এখন অনেক নিচে। বালি কেটে কেটে ভারি ধীর স্রোতে এখন শীতের টাঙন বয়ে যায়। পানির তলায় বালি চিকমিক করে, কোথাও কোথাও সবুজ গুল্ম স্রোতের ভেতরে ভাটির দিকে মাথা রেখে এপাশ ওপাশ ফেরে। চতুর দু-একটা মাছ তির তির করে উজানে ছুটে গেলেও আবার ভাটিতে ফিরে আসে। কিন্তু কাঁপে না পানির স্রোত। এমনকি সাঁকোর ওপর দিয়ে চিনি কলের ভারী আখ-বওয়া ট্রাকগুলো যাবার সময়ও না। সাঁকোর থামগুলো গুম গুম শব্দ করে ওঠে, কিন্তু পানির স্রোত তেমনি ধীর, তেমনি শান্ত। আসমান, কান্দর আর দিগন্তজুড়ে যে শীতের একটা শান্ত ভাব থাকবার কথা সেই ভাবটা টাঙনের স্রোতে আজকাল সব সময় ধরা থাকে।

আর ঐ শান্ত নদীর ধারে বসে থাকবার জন্যেই কিনা কে জানে কপিলদাস ভারি আরামে রোদের দিকে পিঠ মেলে দিয়ে ঝিমোতে পারে। তার চারদিকে নানা শব্দ কিন্তু সে সব তার কানে ঢোকে কি না বোঝা মুশকিল। ধরো, কী রকম গাঁ গাঁ চিৎকার করতে করতে চিনি কলের ট্রাকগুলো ছুটছে, ফার্মের ভেতরে বিনোদ মিস্তিরি খান-দুই ট্রাক্টর ট্রায়ালের জন্য চালু করে রেখেছে—তার ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ শব্দ একটানা সকাল দুপুর রাত ধরে ক্রমাগত হয়ে চলেছে, নদীর ওপারে আবার কোথায় এক রাখাল সারাদিন ধরে একটা বুনো সুর বাঁশিতে বাজিয়ে যাচ্ছে—এ সবই তার কানে ঢুকবার কথা। কিন্তু কপিলদাস চুপচাপ। মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে অল্প-স্বল্প দুলছে, আর সে বসে রয়েছে তো বসেই রয়েছে।

ওদিকে ছাগল ঢুকে যদি সব্জি ক্ষেত তছনছ করে, কি বিন্দা মাঝির বউ সোনামুখী নগেন হোরোর বোন সিলভীর সঙ্গে ঝগড়া বাধায় কিংবা নদীর ওপারে খোলা কান্দরে খরগোশ তাড়িয়ে নিয়ে আসে কোনো ভিন গাঁয়ের কুকুর এবং সেজন্যে যদি এপারের বাচ্চারা লে লে হই হই করেও ওঠে—কপিলদাস নড়বে না, হেলবে না, কান পাতবে না—কাউকে একটা কথা জিজ্ঞেসও করবে না।

আসলে কপিলদাস বুড়োর কাছে সবই একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো বলে মনে হয়। মনে হয়, এরকমই হয়ে আসছে দুনিয়ায়। ঝগড়া বলো, ঝাঁটি বলো, জন্ম বলো, মরণ বলো—সবই একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো। কত দেখল সে জীবনে। সব কিছুই শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। রাগ বল, ক্ষোভ বল, আবার

হাসিখুশি মনের ভাব বল, কিংবা সামনে প্রকাণ্ড কান্দর, কি কান্দরের ওপরকার আসমান, আবার তার নিচে টাঙনের স্রোত—সব কিছু, যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যা শোনা যাচ্ছে—সবই একটার সঙ্গে আরেকটা শেষ পর্যন্ত মেলানো। আসলে, তার মনে হয়, সংসারের অনেক ভেতরে শান্ত ধীর এবং নিরবচ্ছিন্ন একটা স্রোত আছে। সব কিছুর ওপর দিয়ে ঐ স্রোত বয়ে যায়। সেখানে কাঁপন নেই, উত্তেজনা নেই, চিৎকার নেই। সব কিছু সেখানে ক্রমাগত একটার সঙ্গে আরেকটা মিলে যাচ্ছে।

ঠিক এই ধরনের একটা গা-ছাড়া পরিতৃপ্ত ভাব আজকাল তাকে প্রায়ই পেয়ে বসে। আর সেজন্যেই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ভারি আরামে সে ঝিমোতে পারে। বয়স বেড়ে গেলে সম্ভবত মানুষের এরকম একটা অবস্থা এসে যায়।

তবে সব সময় ঐ ভাবটা থাকে না।

আর তখনই পুরনো ঘটনা ছবির পর ছবি সাজিয়ে নিয়ে আসে চোখের সামনে। পুশনা পরবে কি তুমুল নাচ জুড়েছে দেখো কপিলদাস। তার গলায় বাঁধা মান্দল কী রকম শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, মেয়েদের গলায় কেমন শানানো স্বর। কপিলদাস দেখতে দেখতে নিজের যৌবনকালে চলে যায়। একের পর এক ঘটনা মনে পড়তে থাকে তার। আর ঐ রকমভাবে স্মৃতি তার সামনে পুরনো পসরা খুলে বসলে সে ভারি সুখে ঐসব পুরনো ঘটনার মধ্যে বিচরণ করে ফেরে।

একবার সেই যে কি হলো, মহাজনের ধান খামার বাড়ি থেকেই কিষানদের হাতে বিলিয়ে দিলি—মনে আছে সে কথা?

আর মানুয়েল পাদ্রিকে টাঙনের পানিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলি? মনে নাই?

চকিতে সে দেখতে পায় বর্ষায় ভরা টাঙনের পানিতে পাদ্রি তলিয়ে গেল। ঘোলাটে পানির মধ্যে কালো জুতোসুদ্ধ তার পা দুখানি ওপরে উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল স্পষ্ট করে। একটু পরই মানুয়েল পাদ্রি আবার ভেসে উঠেছিল। আর সে কি গাল! সাঁতরাতে সাঁতরাতে শাসাচ্ছিল, দেখিস তোর বাপকে বলব, দেখব বিচার হয় কি না।

সেই ছেলেবেলার কথা। হাপন ছিল যখন সে। তোর তির কী রকম নিখুঁত নিশানায় গিয়ে বিঁধত, কপিলদাস মনে নাই সে কথা?

হ্যাঁ মনে আছে। কপিলদাস মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজেকে শোনায়—সব মনে আছে।

কেন মনে থাকবে না। সান্তালের বাচ্চা না সে? দেখ তো খরগোশের পেছনে কে ছুটছে অমন? শুকদেবের ব্যাটা চতুর মাঝি নাকি দিবোদাসের ব্যাটা কপিলদাস? আর ঐ দেখ, কপিলদাসের শিকারি কুকুর কী রকম ছুটে যাচ্ছে তির-খাওয়া শিকারের পেছনে। কপিলদাস মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায় তার কালো রঙের কুকুরটাকে—যেটা তার কিশোরকালের সঙ্গী ছিল সর্বক্ষণ। কুকুরটাকে শেষ পর্যন্ত বাঘে খেল।

কপিলদাস এককে দিন আবার নিজের কাছে গল্প ফাঁদে। দূর থেকে দেখা যায় বুড়ো থেকে থেকে মাথা নাড়াচ্ছে আর ঝুঁকে ঝুঁকে দুলছে। কোন গল্পটা আরম্ভ করবে সে? বাহ্ গল্পের কি আর শেষ আছে—নিজেকেই শোনায় বুড়ো। ধরো, মেলার সেই ঘটনাটা—

মেলার গল্পটাই হঠাৎ মাঝখান থেকে শুরু হয়ে যায়। কেন যে বেছে বেছে মেলার গল্পটাই শুরু হয়—সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গল্প আরম্ভ করলেই সে মেলার ঘটনায় চলে আসে।

কিংবা ঐ ধান কাটার ব্যাপারটাই ধরো না কেন। আধিয়ার জোতদারের মাঝখানে পড়ে গেল সাঁওতাল বস্তিটা। গুপীনাথ হুঁ হ্যাঁ করে না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। ওদিকে কে একজন আগুনের কুণ্ডলীর ওপরে আরেক বোঝা নাড়া চাপিয়ে দিয়ে গেল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আর ঐ আগুনের আলোয় গুপীনাথের কপাল চকচক করতে লাগল। কিন্তু সে শাদা চুল ভর্তি মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

সাঁওতালদের তখন কি মুশকিল ভাবো দেখি। মহাজন বসত করবার জায়গা দেয়, আবাদের জমি দেয়, গিরস্তির কাজ দেয়—সেই মহাজনের বিপক্ষে কেমন করে যায়। মহাজন যে সব দেয়। হ্যাঁ, সব দেয়—কিন্তুক পেটের ভাতটা কি সারা বছর দেয়, আঁ? কহ মড়ল, কহ দে, দেয় পেটের ভাতটা? এই রকমের সব বাদানুবাদ। কিন্তুক যদি ভিটেমাটি থেকে তুলে দেয় তাহলে? এই রকমের সব তর্কাতর্কি। ওদিকে গুপীনাথ কিছুই বলে না। মড়ল হলে বোধ হয় ঐ অবস্থায় কিছু বলা যায় না।

কিন্তুক তখন ভারি জাড় হে মড়ল। দেহ দলদল করে কাঁপছে। দূরে দূরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—হামরা মাহাজনের সঙ্গে নাই, আধিয়ার কিষানের সঙ্গে হামরা।

কে বলেছিল কথাটা? মনে নেই এখন। সে নিজে হতে পারে, মোহন কিস্কু হতে পারে—কিংবা চতুর মাঝিও হতে পারে। লোকটা যে কে ঠিক মনে নেই। কিন্তু কথাটা ঠিক মনে আছে।

তারপর?

কপিলদাস আর খেই ধরতে পারে না। বিচার সভার শেষ দৃশ্যটা স্মরণে আসে না। বরং হঠাৎ ধান কাটার দৃশ্যটা মনের ভেতরে দেখতে পায় সে। কপিলদাস মাঠে নেমেছে, পাশের ক্ষেতে মোহন কিস্কুর বউ টরি-সারা কান্দরে আর একটা মানুষ দেখা যায় না। ধান গাছের নোয়ানো পাতায়, শিষের গায়ে, তখনও রাতের হিম ফোঁটায় ফোঁটায় জমে আছে। রোদের তাপ গায়ে লাগে কি লাগে না এমনি কুয়াশা।

ঐ রকম গল্প বলতে বলতে বেলা ফুরিয়ে যায় এক সময়। রোদের তাপ কমে আসে। ঝাপসা চোখ দুটি মেলে সে তখন আসমানের ধূসর রঙ দেখে। একবার নদীর ভাটি থেকে উঠে আসা শঙ্খচিলের ডাকটাও শুনতে পায়। বাতাসে তখন শীতের কামড়। তার দুহাতের আঙুল ছেঁড়া কোটের বোতাম দুটি খুঁজতে থাকে।

আর ঐ সময়ই তার চোখে পড়ে যায়। দেখে কজন লোক টাঙনের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে বস্তির দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাচ্ছে। লোকগুলোকে সে চিনতে চেষ্টা করে। ওখানে এই সময়ে কারা? অমন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা—কে লোকটা? অনেকক্ষণ ধরে লোকটার নড়া-চড়ার ভঙ্গিটা লক্ষ করে। লক্ষ করতে করতেই মনে পড়ে—কদিন আগেও বোধহয় ওদের এইভাবেই দেখেছে সে। ঠিক এইভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বস্তির দিকে হাত তুলে কী যেন বলাবলি করছিল। সে এক সময় চিনতে পারে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা লোকটা ম্যানেজার মহাজন ছাড়া আর অন্য কেউ হতে পারে না। কিন্তু এমন সময় ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের কি কাজ? একবার মনে হয় জরিপ হচ্ছে বোধ হয়। একেক সময় ঐ রকম জমিজমার মাপামাপি চলে। ওরা কি জমিজমা মাপতে এসেছে? কই এ রকম কোনো খবর তো তার কানে আসেনি।

একটু পর আর দেখা যায় না কাউকে। দেখতে না পাওয়ায় কৌতূহলটাও আর থাকে না। কপিলদাস তখন গরুর পালের ঘরে ফেরা ঘুন্টির আওয়াজ কান পেতে শোনে। ফার্মের গরুগুলোর গলায় নতুন ঘুন্টি বাঁধা হয়েছে নিশ্চয়ই। আজকাল বোধহয় জয়হরির ছোট ছেলেটা ফার্মের গরু চরায়। জয়হরির কী যেন হয়েছিল? জয়হরির কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে সে। আর ঠিক ঐ সময় কাছে এসে দাঁড়ায় সলিমউদ্দিন। এসেই ডাকে, বুঢ়া দাদা বাড়িত যাবো নাই?

হ্যাঁ যামু, সে জয়হরির কথা স্মরণ করতে না পেরে সলিমউদ্দিনের দিকে মনোযোগ দেয়। ছোঁড়া কোত্থেকে আসছে সেই কথা জিজ্ঞেস করতে করতে উঠে দাঁড়ায়।

সলিমউদ্দিন তখন কুশিয়ার ক্ষেতে আজ কী কাণ্ডটা ঘটেছে সেই ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করে এবং ঐ আরম্ভের মুখেই সে জানিয়ে দেয়–বুঢ়া দাদা তুমার বস্তিটা আর এইঠে থাকবে নাই, ইবছর এইঠে ধানের আবাদ হবে। কথাটা কেন যে বলে ছোঁড়া বুড়ো ঠিক ধরতে পারে না। কিংবা এমনও হতে পারে যে তার বর্ণনাতেই বোধহয় প্রসঙ্গটা থাকে না।

কপিলদাসের হঠাৎ খেয়াল হয় লোকগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। এখুনি না দেখল! মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উবে গেল অতোগুলো মানুষ।

নাকি সে দেখে নি! তার কেবলি মতিভ্রম হতে থাকে। ইদিকে সলিমউদ্দিনের সেই খামারবাড়ির ঘটনাটার বর্ণনা তখনো ফুরোয়নি।

আবার কথাটা নতুন করে বলতে হলো সলিমউদ্দিনকে। বলল, তুমার বসতটা ইবার উঠায় দিবে, এইঠে ইবছর ট্রাকটর চলিবে।

কপিলদাস এবারও বুঝতে পারে না। তার নিজের হিসাব মেলে না। ট্রাকটর জমিতে চলবে, তাই চলে এসেছে এতকাল। মানুষের বসতের উপর দিয়ে ট্রাকটর চলতে যাবে কেন? ই কেমন কথা? সে অন্ধকারেই ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। বলে, ঠিক শুনিছিস তুই, কহ ঠিক শুনিছিস?

সলিমউদ্দিন এবার সত্যিই বিরক্ত হয়। বলে, মোর কথা বিশ্বাস না হয় আর কাহাকো পুছে দেখ। মুই ইবার যাঁউ, তুই বুঢ়া মানুষ, তোর কিছু ফম থাকে না।

কথাটা বলেই হঠাৎ ছোঁড়া চলে গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপিলদাস মাথা নাড়ায়। আর নিজেকে শোনায়–না, ক্যানে পালাব। তার পা আপনা থেকে বাড়ির পথ ধরে। কোথায় পালাবে সে। এক সময় আবার হাসি পায় বুড়োর, পালাবার কথাটা এল কোত্থেকে? তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল–নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে তখন সে বলে, তোর কিছু ফম থাকে না। আর ঐ সময় ট্রাকটরের আওয়াজটা তার কানে এসে ধাক্কা মারে। কী কারণে যে হঠাৎ ধকধক শব্দ করে জেগে উঠল ঘুমন্ত ট্রাকটরটা আন্দাজ করা মুশকিল। বিনোদ মিস্ত্রি একেকদিন এই রকম হঠাৎ ট্রাকটরের এঞ্জিন চালিয়ে দেয়। ট্রাকটরটা সে চোখের সামনে দেখতে পায় যেন। বিশাল বিশাল দুটো চাকা ঘুরতে ঘুরতে মাঠের বুকের ওপর দিয়ে চলেছে, পেছনের ধারালো চাকতিগুলো মাটি ফালা ফালা করে দিচ্ছে, গন্ধ বেরুচ্ছে কাটা মাটির ভেতর থেকে। ঐভাবে ট্রাকটরটা চলে আসে একেবারে দীনেশ কিস্কুর বাড়ির সীমানা পর্যন্ত। তারপরই বেশ দিব্যি ঘুরে যায়। বসতই হলো ট্রাকটর চলাফেরা করার শেষ সীমানা। হ্যাঁ, কলের জিনিস ঐ পর্যন্ত আসে। সংসারের সীমানা পর্যন্তই তার আসবার ক্ষমতা, তারপর আর পারে না, এতকাল অন্তত পারেনি। আর এখন সেই কলের জিনিস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে দীনেশ কিস্কুর উঠোনে। ঘরের দেয়ালে ভোঁতা নাক ঢুকিয়ে উল্টো দিকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরুবে। দৃশ্যটাকে সে মনের ভেতর দেখতে পায়। আর তাই দেখে সে ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করে। ই কী কথা আঁ? ট্রাকটর চলে আসবে সংসারের বুকের ওপর?

কপিলদাস বুড়োর এখন মনে পড়তে থাকে। এই বস্তি উঠে যাবার ব্যাপারটা আকস্মিক নয় একেবারে–তাহলেও, এই কি শেষ পর্যন্ত পরিণতি? বস্তিটস্তি উঠে যাবে আর ট্রাকটর চলতে থাকবে ঘরবাড়ি-ভিটেমাটির উপর দিয়ে। কোথায় একটা মেয়েমানুষের মাথা গরম করে মাতালের দিকে দা উঁচিয়ে তেড়ে যাবার ঘটনা আর কোথায় বাড়িঘর সংসারসুদ্ধ লোপাট করে দেওয়া। কিসের সঙ্গে কিসের জড়ানো। কিন্তু ভাবো তো বসতটা কত পুরনো? মনে আছে তোর, হ্যাঁ বাহে মড়লের ব্যাটা, তোর কি ফম আছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ ফম আছে। বিচার বসেছিল ফার্মের অফিস ঘরে। কে একজন সাহেব মানুষ শুধোচ্ছিল। আর সে উত্তর দিচ্ছিল। কবে কোন প্রাচীনকালে এসেছিল একদল মানুষ। সেই দলের মড়ল ছিল শিবোনাথ। শিবোনাথ আবার গুণিন ছিল। কিন্তুক গুণিন হলেই কি সব হয়, আঁ? হয় কখনও? হয় না।

ঐ পর্যন্ত বলার পর আর বলতে পারেনি—মহিন্দর ধমকে উঠেছিল। পরে জানিয়েছিল, তুই আর হামার সঙ্গে আসিস না বাপ—তোর কথার কুনো ঠিক নাই। কুন কথাত তুই কুন কথা কহিস বুঝিস না।

হ্যাঁ মড়ল তুই বুঢ়া মানুষ—তুই কিছু করিবা পারিস না। ঐ দিনই কে যেন বলেছিল কথাটা। কপিলদাস কথাটা নিজেকে শোনালো আরেকবার—তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছু করার নাই। একবার নয়, ঘুরে ঘুরে কথাটা সে বলেই চলল। আর থেকে থেকে ভারি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়টা। আর ঐ দীর্ঘশ্বাস তাকে বার্ধক্যের অক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে ঠাণ্ডায় পা দুখানি অসাড় হয়ে উঠেছে। উঠোনের আগুনের কাছে বসে বসে সে হাত-পা সেঁকে কিছুক্ষণ। মহিন্দরের বউ বিন্নী থালায় করে ভাত দিয়ে যায়। আগুনের তাতে ততক্ষণে আরাম লাগছে কপিলদাসের। ভাতের পাশে এক টুকরো পোড়া মাংস দেখতে পেয়ে সে খুশি হয়। নাতিদের শুধোয় কী শিকার পেয়েছিল তারা। মহিন্দরের ছেলে শিকারের গল্পটা আরম্ভ করে বোধহয়—কিন্তু তার গল্পের দিকে বুড়ো আর মনোযোগ দিতে পারে না।

দাদা, বড় জঙ্গল্‌ত নাকি বাঘ থাকে?

নাতির প্রশ্ন শুনে একটু সজাগ হতে হয় বুড়োকে। ঠিক মনে করতে পারে না। প্রাণনগরের জঙ্গলে কি বাঘ আছে? কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে। তারপর মাথা নাড়ায়, নাই রে—শুকদাস, ঐঠে বাঘটাগ নাই। কিন্তুক ছিল এক সময়।

নাতিরা ঘন হয়ে বসে। কপিলদাস ভাত খাওয়ার কথা ভুলে যায় তখন। সে গল্প আরম্ভ করে।

গল্প মানে তো নিজের কথা। সাঁওতাল কিশোর ছেলের যে ব্যাপারে সবচাইতে আকর্ষণ সেটাই সে ধীর স্বরে বর্ণনা করতে থাকে। তার কালো রঙের কুকুরটার কথা আসে। তার ঘরে খুঁজলে তিরের চোঙা দুটো এখনো পাওয়া যাবে—সেই চোঙায় বাছা বাছা তির জমানো থাকত। একবার তির দিয়ে একটা বাঘ গেঁথে ফেলেছিল। ভাগ্যিস সে তখনো বাঘ কী জিনিস জানত না। বনবিড়াল ভেবে নিশানা করে তির ছেড়ে দিয়েছে আর অমনি কী ডাক! ভয় পেয়ে পড়িমরি করে কী রকম দৌড়েছিল সেই ঘটনাটা সে বলে এবং বলবার সময় দৌড়ের বর্ণনাটাই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। বুড়ো মানুষের গুনগুন গুনগুন ধীর স্বরের একঘেঁয়েমিতে বিরক্তি লাগে বাচ্চাদের। শুকদাস অস্থির হয়ে ডাকে, দাদা বাঘটার কী হইল?

ও, হ্যাঁ, বাঘটা। কপিলদাসকে একটু ভেবে নিতে হয়। তির খেয়ে বিকট চিৎকার করে উঠবার পর বাঘটার যে কী হয়েছিল কোনোভাবেই মনে পড়তে চায় না। তখন গল্পটা সে বানাতে আরম্ভ করে। তার বর্ণনায় তখন কৌতুক আসে। বাঘের ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবার ব্যাপারটা সে রঙ চড়িয়ে বলতে চায়। কিন্তু বাঘটা টেনে নিয়ে আসবার সময় কি রকম কষ্ট হচ্ছিল সে কথাটাই ঘুরেফিরে বলতে থাকে সে।

শীতের রাত, ততক্ষণে সবারই ঘরে গিয়ে শোবার কথা। কিন্তু কেউ শুতে যাচ্ছে না সেটা সে লক্ষ্য করে। দেখে, ইতিমধ্যে মহিন্দর, দীনদাস এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কোনো শলাপরামর্শ হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা যে কী, কিছুই অনুমান করা যায় না।

ও হ্যাঁ, বাঘটার যেন কী হয়েছিল? কপিলদাস কিশোর দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ল্যাজ ধরে টানবার প্রসঙ্গে ফিরে আসে। ঐ রকম যখন টেনে আনছিল তখনো কিন্তু বাঘটা বেঁচে ছিল—হ্যাঁ। ঘা খাওয়া বাঘ কিন্তু ভয়ংকর জিনিস।

এই পর্যন্ত বলে থামতে হয়। ঘা খাওয়া বাঘের ভয়ংকরতা কীভাবে বোঝাবে সেজন্যে তাকে ভাবতে হয়। আর ঐ সময় মহিন্দরদের কাছে একটি লোককে আসতে দেখে সে গল্পের কথা ভুলে যায়। উঠে গিয়ে দাঁড়ায় মহিন্দর আর দীনদাসের কাছে।

নিজের ছেলে মহিন্দর বিরক্ত হয়—বলে, তুই এখুন যা তো বাবা, বুঢ়া মানুষ তুই ইসবের কী বুঝিস!

কপিলদাস বুড়ো এবার সত্যিই দমে যায়। নিজের জন্ম দেয়া ছেলে যদি এই রকম করে বলে, তো সে কী করবে। তাকে পিছিয়ে আসতে হয়। হ! মড়ল তুই তো বুঢ়া মানুষ, তুই কিছু করিবা পারিস না। কথাটা ঘুরেফিরে কেউ যেন তার কানের কাছে বারবার করে বলতে থাকে। সে কিছুই করতে পারে না, তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মানুষের জটলাটা দেখে। ততক্ষণে জায়গাটা বেশ একটুখানি সমাবেশ মতো হয়ে উঠেছে। দেখে, দীনদাস হাত নেড়ে নেড়ে কী বলে চলেছে। তারপর আবার মহিন্দর আরম্ভ করল। তার কথা শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে আবার ভায়া মাঝি আরম্ভ করল।

ভারি ধীর নোয়ানো স্বর। শান্তভাবে পরামর্শ হচ্ছে যেন। রাগ নেই। জ্বালা নেই। কারো দুচোখ ধকধক করে জ্বলে উঠছে না, কেউ চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে না। কপিলদাসের ভারি অবাক লাগে গোটা ব্যাপারটা দেখে। অবাক লাগে, কিন্তু কিছু বলে না সে। বরং নিজেকে সরিয়ে আনে। কয়েক পা পিছিয়ে আসে সে। কিন্তু ঐ কয়েক পা সরে আসতে অনেকটা সময় লেগে যায় তার। কানের কাছে তখনও সে শুনছে—তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছুই করার নাই। যেখান থেকে উঠে এসেছিল সেইখানে সে ফিরে যায়। শুধুই যথাস্থানে ফিরে যাওয়া, শুধুই মেনে নেওয়া—তার কেবলই মনে হতে থাকে।

বাচ্চারা লোকসমাগম দেখেই সম্ভবত উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। মেয়ে-বউরা এখানে সেখানে ইতস্তত দাঁড়িয়ে। বাচ্চারা একত্র হলে যা হয়—ততক্ষণে খুনসুটি, দাপাদাপি এবং হাসাহাসি এইসব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পাথরের ওপর ঘষে ঘষে তীরে শান দেওয়া তখনো হচ্ছে। মহিন্দরের ছেলে ডাকল, দাদা তারপর বাঘটার কী হইল?

ও, সেই গল্প। কপিলদাসের মনে পড়ে একটু আগে শিকারের গল্প বলতে বলতে সে উঠে গিয়েছিল। তখন আগুনের আলো কিশোর মুখের ওপর চমকাচ্ছে, কে একজন কঞ্চি দিয়ে আগুনটা আরেকটুখানি উস্‌কে দিল। আর ঐ ঘটনার কারণেই কি না কে জানে, কপিলদাস গল্পটা আবার আরম্ভ করে দিল। হ্যাঁ, বাঘটার ল্যাজ ধরে টানতে টানতে আসছিল সে। ভারী ওজন হয় বাঘের। আর বাঘটা ওদিকে তখনও কিন্তু মরেনি। নাহ্, বাঘটা বোধহয় মরেই গিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে।

কপিলদাস সৎ হয়ে উঠতে চায় বাচ্চাদের কাছে। গল্প বানানো বাদ দেয়। তার স্পষ্ট মনে পড়ে তখন। বাঘটার গায়ে বিকট গন্ধ ছিল, তিরটা ঠিক বুকের মাঝখানে গিয়ে গেঁথেছিল, একেবারে এদিক থেকে ওদিক বেরিয়ে গিয়েছিল। রক্ত তখনও বেরুচ্ছিল গলগল করে। আর ঐ সময়, বিকেল বেলায়, প্রাণনগরের জঙ্গলের ধারে একটা লোক ছিল না চারদিকে কোথাও। সে চিৎকার করে বাবাকে ডাকছিল, বন্ধুদের ডাকছিল। আর ঠিক তখন হঠাৎ তার পাশের ঝোঁপ থেকে কি একটা জানোয়ার লাফ দিয়ে বেরিয়েই বাঁয়ে ছুটতে শুরু করে দিল। ঐ জানোয়ারটা দেখেই সে—

এ পর্যন্ত বলেই সে থামে। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাবে বলে ইতস্তত করে। আহা কেমন করে বলবে যে শেয়াল দেখে সে ভয়ানক ভয় পেয়ে পালিয়েছিল।

তারপর, তারপর কী হইল? বাচ্চারা সমস্বরে জিজ্ঞেস করলে সে হঠাৎ হেসে ওঠে।

কপিলদাস তখন নিজের আলাদা অস্তিত্ব আর অনুভব করতে পারে না। তীরে শান দেবার সময় কী রকম করে পাথরের ওপর ঘষতে হয়—তাই দেখায়। একজনের হাত থেকে বাঁশিটা টেনে নিয়ে ফুঁ দিয়ে একটা বহু পুরনো সুর বাজায়। কী বাজালো আঁ, কী বাজালো দাদা? প্রশ্ন হলে সে ভাঙা ভাঙা গলায় গানটা গায়—

ফকির বুলে ঢুলুক বাজে

ভালুক নাচে ঝাম,

হাইয়ারে হালমাল কই গেলু রে—এ—এ।

গানটি শুনে বাচ্চারাও গাইতে শুরু করে দেয়।

বুড়োর ভীমরতি হয়েছে ভেবে মেয়েরা কেউ কেউ মনোযোগ দেয় বাচ্চাদের জটলার দিকে। বড়রা যেখানে সভা বসিয়েছে সেখান থেকেও কে একজন চিৎকার করে গোলমাল বন্ধ করতে বলে। কিন্তু বাচ্চাদের থামাবে কে? মহিন্দরের ছেলে ধনুকের জন্যে বাঁশের ছিলা তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। কপিলদাস তার হাত থেকে কেড়ে নিলো ধনুকটা। বলল, দেখ, কেমন করে ছিলা পরাতে হয় ধনুকে।

বাচ্চারা তখন ঘিরে দাঁড়ায় বুড়োর চারদিকে। কপিলদাস হাঁটু ভেঙে ধনুকের এক মাথা ধরে ঝুলে পড়ে ধনুকটা নোয়ায়। তারপর বাঁ হাতে ছিলার ফাঁসটা ধনুকের মাথায় ঢোকাতে চায়। কিন্তু প্রথমবারেই পারে না।

ডান হাতটা তার ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। বাচ্চারা বুড়োর কাণ্ড দেখে সমস্বরে বলে, পারব নাই দাদা–তুই পারব নাই। কিন্তু পারে সে। ঐ কাঁপা কাঁপা হাতেই সে ছিলা পরিয়ে দেয় ধুনকের। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছিলা টেনে ধনুকের একটা টঙ্কার তোলে। ভারি সুন্দর টানটান আওয়াজ হয় তাতে। এরপরও বুড়ো থামে না। একটা শানানো তির নেয় হাতে এবং তিরটা ধনুকের ছিলায় বসিয়ে তাক করে। সামনের দিকে একবার, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। বুড়ো ভয় দেখিয়ে মস্করা করে যেন। বাচ্চারা তাতে হই হই করে ওঠে। আর ঐ রকম হই হই শুনেই সম্ভবত কপিলদাস তিরটা দু আঙুলের ফাঁকে চেপে ছিলা ধরে টানে। টেনে ধনুকের নিশানা করে অন্ধকারের দিকে। মহিন্দরের ছেলে বলে ওঠে, দাদা তিরটা ছুটে যাবে, দাদা মোর তিরটা ছুটে যাবে। কিন্তু কপিলদাস নাতির মিনতি শুনতে পায় কি না বোঝা যায় না। সে সত্যি সত্যি তিরটা ছেড়ে দেয়। আর বাতাস কাটা শব্দ করে তিরটা অন্ধকারের দিকে ছুটে যায়।

চারদিকে মানুষের বসত। মেয়েরা বুড়োরা কাণ্ড লক্ষ করে হ্যাঁ হ্যাঁ করে ওঠে। সভার মানুষদের মধ্য থেকেও কয়েকজন এগিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বুড়ো কপিলদাস আর একটা তির হাতে তুলে নিয়েছে। সবাই যখন নিষেধ করছে তখন সে দ্বিতীয় তিরটাও সামনের অন্ধকারের দিকে নিশানা করে ছুড়ে দিয়েছে। এবং ঐ কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় ব্যাপারটা আর ছেলেমানুষি তামাসার পর্যায়ে থাকে না। দূর থেকে মহিন্দর চিৎকার করে ওঠে, বিন্নি গালাগাল করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বুড়ো তখন হাসছে কেমন দেখো, যেন সে কিশোরকালে ফিরে গিয়েছে। জীবনে প্রথম নিশানা ভেদ করার যে খুশি–সেই খুশি পেয়ে বসেছে তাকে। সে শান দেয়া আরও একখানা তির হাতে তুলে নিয়েছে তখন। ওদিকে পেছন থেকে দীনদাস চিৎকার করে বলছে–ধর বুঢ়াটাকে, ধরে কাঢ়ে লে ধেনুকখান–সেই চিৎকার বুড়োর কানে পৌঁছায় না। কেউ পেছনে তাকে ধরতে আসছে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কপিলদাস বুড়ো দুহাতে তির-ধনুক নিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে চলতে থাকে। বিমূঢ় মানুষজনের চোখের সামনে দিয়েই সে অনায়াসে অন্ধকার, গাছপালা, কৈশোর এবং আদিম উল্লাসের মধ্যে চলে যায়। আর সেখান থেকে সে তার তৃতীয় তিরটা সঠিক নিশানায় ছুড়বার জন্যে তৈরি হতে থাকে। *[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]*

শব্দার্থ ও টীকা

মুর্মু – সাঁওতাল গোত্রবিশেষ। মুর্মু শব্দের অর্থ নীল গাভি; যা এই গোত্রের গোত্র-চিহ্ন তথা টোটেম। কথিত আছে একবার এক অরণ্যভূমিতে কিছু লোক কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিল। একসময় তাদের সর্দার ঘুমিয়ে পড়ল। সেই বনে ছিল একটি হিংস্র নীল গাভি । গাভিটি এসে পায়ের চাপা দিয়ে সর্দারকে মেরে ফেলল। ঘুম থেকে উঠে লোকেরা তখন গাভিটিকে হত্যা করল। সেই থেকে মৃত ব্যক্তির গোত্রের নাম বা পদবি হলো মুর্মু। এই গোত্রের একাধিক উপগোত্রও রয়েছে।

টাঙন — পাহাড়ি জলাধারবিশেষ। এ গল্পে ঠাকুরগাঁও শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া টাঙন নদী বোঝানো হয়েছে।

কান্দর — খাত বা নিচু স্থান। সাধারণত খালের অংশবিশেষ।

পুশনা পরব — বিশেষ পুজোর আয়োজন। পৌষ-সংক্রান্তিতে এই পুজো উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়।

হাপন — বালক।

মান্দল — মাদল; এক ধরনের তালবাদ্য।

পসরা — পণ্যসম্ভার; বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত দ্রব্য।

ভাঁট — এক ধরনের বুনো ফুলবিশেষ।

নাগরদোলা — ওপর থেকে নিচের দিকে ঘুরতে পারে এমন পাল্‌কির মতো। এতে ছোট ছোট খোপ থাকে। তাতে মানুষ বসে আর এই খোপগুলোকে যন্ত্রের সাহায্যে কিংবা হাত দিয়ে টেনে ওপর থেকে নিচে ঘুরিয়ে আনে।

জাড় — শীত, ঠান্ডা।

আধিয়ার — বর্গাদার। যারা একটি নির্দিষ্ট শর্তে অন্যের মালিকানাধীন জমিতে হাল চাষ করে এবং উৎপাদিত ফসলের অংশ শর্ত মোতাবেক মালিককে প্রদান করে।

জোতদার — ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার সূত্র ধরে কৃষকদের জমির মালিকানা চলে যায় জমিদারদের হাতে। এ সময় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে এক মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরা জমিদারদের কাছ থেকে জমি পত্তনি বা ইজারা নিত। এরাই জমির চাষ তদারকি এবং খাজনা আদায়ের কাজ করত। ফলে উৎপাদনের সম্পূর্ণ খরচ কৃষক বহন করলেও ফসলের অর্ধেক চলে যেত জোতদারের হাতে।

গিরস্তি — গৃহস্থ কাজ।

মড়ল — মোড়ল। গোষ্ঠী প্রধান। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

ঘুন্টি — ঘণ্টাবিশেষ। গবাদিপশুর গলায় পরানো হয় এমন ছোট ঘণ্টা।

কুশিয়ার ক্ষেত — আখ ক্ষেত।

পুছে দেখ — জিজ্ঞেস করে দেখ।

ফম থাকা — স্মরণ থাকা। মনে থাকা।

পাঠ-পরিচিতি

আলোচ্য গল্পটি শওকত আলীর ‘লেলিহান সাধ’ (১৯৭৭) গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। কপিলদাস মুর্মু এক বৃদ্ধ সাঁওতাল। ভূমির অধিকার নিয়ে সাঁওতালদের রয়েছে রক্তে রঞ্জিত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। ভূমি তাদের

অস্তিত্বেরই অপর নাম। তাই নিজেদের বসতবাটি থেকে উন্মুলিত হবার আশঙ্কা যখন তীব্রতর রূপ ধারণ করে তখন বয়সের ভারে ঝিমিয়ে পড়া, অন্য সবার কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মানুষ কপিলদাস অমিত সাহসে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। জীবনের শেষ কাজ হিসেবে শেষ লড়াইটা লড়বার জন্য নিজেকে সে সময়ের হাতে তুলে দেয়। তরুণদের ভয় দ্বিধাকে অমূলক প্রমাণিত করে একাই সে আত্মত্যাগী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাটির কাছাকাছি থাকা এক প্রবীণের এই অনিঃশেষ সংগ্রামশীলতার নান্দনিক রূপায়ণ ঘটেছে এই গল্পে।

সমগ্র গল্পজুড়েই লেখক স্থবির দশায় আক্রান্ত কপিলদাসের অতীতের স্মৃতিকথা, বীরত্বগাথা– যার কতকটা সত্য কতকটা কল্পনা– এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। আর সেইসঙ্গে কপিলদাসের প্রতি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন; যার মূল সুর হলো : ‘হা মড়ল তুই বুঢ়া মানুষ– তুই কিছু করিবা পারিস না।’ এরূপ চিন্তার বিপ্রতীপে অবস্থিত কেবল শিশুরা। তাদের কাছে কপিলদাস এবং তার গল্প– দুয়েরই বিশেষ আকর্ষণ ও গুরুত্ব রয়েছে। এই উৎসাহ কপিলদাসকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। সে তার বয়সকে অতিক্রম করে যায়; অনেকটা খেলার ছলেই জড়বৎ কপিলদাস আকস্মিকভাবে গতিপ্রাপ্ত হয়। তার হাতে উঠে আসে তির-ধনুক। একের পর এক তির তার হাত থেকে ছুটে যেতে থাকে শত্রুকে লক্ষ করে। কপিলদাস নিজে কেবল একটি চরিত্র থাকে না; হয়ে ওঠে জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের এক আপসহীন যোদ্ধা। কপিলদাসের আশ্রয়ে লেখক আমাদের জানিয়ে যান লড়াইয়ের কোনো বয়স নেই। উন্মুলিতপ্রায় মানুষগুলো কোনো কিছুর পরোয়া না করেই তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এই আশাবাদের দ্যোতনা জাগিয়ে গল্পকার রচনাটি সমাপ্ত করেন। সাঁওতালি কথনভঙ্গি, শব্দ যোজনা এবং যথোপযুক্ত প্রেক্ষাপট সৃজন এই রচনার শিল্পসাফল্যকে বহুগুণ বর্ধিত করেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “ধর বুঢ়াটাকে, ধরে কাঢ়ে লে ধেনুকখান”—কার উক্তি?

ক. দীনদাসের খ. মহিন্দরের

গ. সলিমউদ্দিনের ঘ. বিনোদ মিস্ত্রির

২. “ওদিকে গোপীনাথ কিছুই বলে না”—এর কারণ হলো গোপীনাথের-

i. স্বার্থপরতা

ii. কাপুরুষতা

iii. স্বাজাত্যবোধহীনতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাহমুদা নামের এক অসহায় বিধবা বহু বছর ধরে সরকারি খাস জমিতে বসবাস করে আসছেন। ভূমিহীনতা সূত্রে মাহমুদা ও অন্যান্যরা সরকারের কাছ থেকে খাস জমি বন্দোবস্ত নিতে চান। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী মৎস্য ঘের মালিকেরা ওই জমি তাদের নামে বন্দোবস্ত নিয়ে নতুন মৎস্য ঘের বানাতে চান। ‘হয় জমি নয় জীবন’– এই প্রত্যয় বুকে নিয়ে মাহমুদারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

৩. উদ্দীপকের মাহমুদা কপিলদাস মুর্মুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণ, তার–

i. সাহসিকতা

ii. সংগ্রামশীলতা

iii. অধিকার সচেতনতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটির চূড়ান্ত রূপ "কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ" গল্পে কোন বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সবই একটার সঙ্গে আরেকটা শেষ পর্যন্ত মেলানো

খ. ম্যানুয়েল পাদ্রিকে টাঙনের জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল

গ. মহাজনের ধান খামার বাড়ি থেকেই কিষানদের বিলিয়ে দিলি

ঘ. বুড়ো দু-হাতে তির-ধনুক নিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে চলতে থাকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশবাসীর ওপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নানা দিক থেকে শোষণ-বঞ্চনা চালিয়ে আসছিল। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় লাভ করলেও বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তাদের বিভিন্ন টালবাহানা এদেশবাসীকে সংক্ষুব্ধ করে তোলে। তখন 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' স্লোগানে শহর-বন্দর-গ্রাম আন্দোলিত হয়।

ক. মুর্মু কী?

খ. কপিলদাস বুড়োর কাছে সবই একটার সাথে আরেকটা মেলানো বলে মনে হয়–কেন?

গ. উদ্দীপকের দেশবাসীর সাথে কপিলদাস মুর্মুর চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কপিলদাস মুর্মুর অতীত ও বর্তমান তাঁকে উদ্দীপকের দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। – মন্তব্যটির যথার্থ্য যাচাই কর।

জাদুঘরে কেন যাব

আনিসুজ্জামান

লেখক-পরিচিতি

আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও মনস্বী অধ্যাপক।। তাঁর জন্ম ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়। পিতা ডা. এ.টি.এম. মোয়াজ্জম ও মাতা সৈয়দা খাতুন। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকার প্রিয়নাথ স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় স্নাতক সম্মান, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছেন শিকাগো ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক।

আনিসুজ্জামান উচ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'আঠারো শতকের চিঠি', 'পুরোনো বাংলা গদ্য', 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে', 'বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য', 'ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য', 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক', 'চেনা মানুষের মুখ', 'আমার একাত্তর', 'কাল নিরবধি', 'বিপুলা পৃথিবী' ইত্যাদি। সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্যে তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিলিট এবং ভারত সরকারের পদ্মভূষণসহ বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

পাশ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ত্ব—মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ—একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত। আলেকজান্দ্রিয়ায় নাকি পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে—ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না—কিন্তু এটুকু দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, সে সময়ে জাদুঘরতত্ত্ববিদ্‌দের কেউ তার ধারে-কাছে ছিলেন না। কী প্রেরণা থেকে বিশেষজ্ঞ না হয়েও একজন মানুষ এমন একটা কাজ করেছিলেন এবং দর্শনার্থীরাই বা সেখানে কোন প্রত্যাশা নিয়ে যেতেন, তা আজ ভাববার বিষয়। পৃথিবীর এই প্রথম জাদুঘরে ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদউদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা, তবে এটা নাকি ছিল মুখ্যত দর্শন-চর্চার কেন্দ্র। এ থেকে আমাদের মনে দুটি ধারণা জন্মে : জাদুঘর গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক, আর তার দর্শকেরা সেখানে যেতেন নিজের নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, হয়ত কেউ কেউ ঘুরে ফিরে সর্বক্ষেত্রেই উপস্থিত হতেন।

কালক্রমে প্রাচীন জিনিসপত্র সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছিল এবং সম্পন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের উদ্‌যোগে তা সংগৃহীত হয়ে জাদুঘর গড়ার ভিত্তি রচনা করছিল। প্রাচ্যদেশেও এমন সংগ্রহের কথা অবিদিত ছিল না, তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে পাশ্চাত্যদেশে এ ধরনের প্রয়াস অনেক বৃদ্ধি পায়। এ রকম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জাদুঘরে কখনো কখনো জনসাধারণ সামান্য প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকতে পারত বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সকলের জন্যে খোলা থাকত না। রাজ-রাজড়ারা বা সামন্ত প্রভুরা যেসব সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন, তাতে থাকতো ওইসব মহাশয়ের শক্তি, সম্পদ ও গৌরবের ঘোষণা। ষোল শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্‌যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয়নি। নবনির্মিত এসব জাদুঘরই জনসাধারণের জন্যে অবারিত হয় গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে কিংবা বিপ্লবের সাফল্যে। ফরাসি বিপ্লবের পরে প্রজাতন্ত্রই সৃষ্টি করে ল্যুভ, উন্মোচিত হয় ভের্সাই প্রাসাদের দ্বার। রুশ বিপ্লবের পরে লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদে গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে। টাওয়ার অফ লন্ডনের মতো ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং তার সংগ্রহ যে সর্বজনের চক্ষুগ্রাহ্য হলো, তা বিপ্লবের না হলেও ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণের ফলে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের অধিকারীরাও একসময়ে তা জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার প্রেরণা বোধ করেন এবং কখনো কখনো এসব ব্যক্তিগত সংগ্রহের দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে তা সকলের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা করে। সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে—এখানকার অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়মের সৃষ্টি হয় পিতাপুত্র দুই ট্র্যাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল—এই তিনজনের সংগ্রহ দিয়ে। আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম, তবে তার ভিত্তিও ছিল অপর তিনজনের সংগ্রহ—স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির। এসব কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তন যে জাদুঘরের রূপকে বড় রকম প্রভাবান্বিত করে, সে-বিষয়টা তুলে ধরা। জাদুঘরে প্রবেশাধিকার না পেলে কিংবা নাগরিকদের জন্যে জাদুঘর গড়ে না উঠলে সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না,—কেন যাব সে চিন্তা তো অনেক দূরের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে; পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তাদের উপনিবেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। তেমনি একদিকে শিল্পোন্নতি এবং অন্যদিকে উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে বিশ শতকে জাদুঘর-স্থাপনার কাজটি দ্রুত এগিয়ে যায়, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও আত্মপরিচয়দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে, তার আগে আর দুটি কথা বলি। একালে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো মেলানো-মেশানো জাদুঘরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম। সেখানে বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার; স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার জাদুঘর; রয়েছে নানা বিষয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনী ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। আর এসবের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে প্রাসাদোপম অট্টালিকার। অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি যেখানে যেতে চান, যা দেখতে চান ও জানতে জান, তিনি তা করতে পারেন। তবে এখনকার প্রবণতা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শনের থেকে মানবসৃষ্ট নিদর্শন আলাদা করে রাখা, আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে ছোট-বড় জাদুঘর গড়ে তোলা। গত ত্রিশ বছরে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, যদিও ব্রিটিশ মিউজিয়মের সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো জাদুঘর সে দেশে তৈরি হয়নি। জাদুঘরের বৈচিত্র্য আজ খুবই চোখে পড়ে—সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত। আজ ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টাই প্রবল : প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ ভ্রমণ, পরিবেশ, কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা—তারও আবার নানান বিভাগ-উপবিভাগ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত জাদুঘর বহু দেশে বহু কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও এখন জাদুঘর বলে বিবেচিত। জাদুঘর বলতে আজ আর ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ল্যুভ বা হার্মিতিয়ের মতো বিশাল প্রাসাদ বোঝায় না। উন্মুক্ত জাদুঘর জিনিসটা এখন খুবই প্রচলিত। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের একাংশে অবস্থিত হলেও জাদুঘরের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণির জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে গড়া জাদুঘর। আমাদের দেশ থেকে উদাহরণ নিলে বলব, এখানে যেমন আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, তেমনি আছে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামরিক জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলধা গার্ডেন এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়ম। একজন কী দেখতে চান, তা স্থির করে কোথায় যাবেন, তা ঠিক করতে পারেন।

তবে জাদুঘরের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, যা চমকপ্রদ, যা অনন্য, যা লুপ্তপ্রায়, যা বিস্ময় উদ্রেককারী—এমন সব বস্তু সংগ্রহ করা। গড়পড়তা মানুষ তা দেখতে যায়, দেখে আপ্লুত হয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার

কথা বলি। ঢাকায় আমাদের জাতীয় জাদুঘরের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান। অনেক আমন্ত্রিতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতান্ত কনিষ্ঠ শিক্ষক আমিও ছিলাম। লক্ষ করলাম, শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণ পড়তে গিয়ে মুদ্রিত 'জাদুঘর' শব্দের জায়গায় সর্বত্র 'মিউজিয়ম' পড়ছেন। চা খাওয়ার সময়ে আমাদের শিক্ষকপ্রতিম অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদা আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতে বললেন, 'গভর্নর' সাহেবের একটা প্রশ্ন আছে, উত্তর দাও। গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিউজিয়মকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন?' একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'স্যার, জাদুঘরই মিউজিয়মের বাংলা প্রতিশব্দ।' গভর্নর এবার রাগতস্বরে বললেন, 'মিউজিয়মে যে আল্লাহর কালাম রাখা আছে, তা কি জাদু?' আল্লাহর কালাম বলতে তাঁর মনে বোধ হয় ছিল, চমৎকার তুঘরা হরফে লেখা নুসরত শাহের আশরাফপুর শিলালিপি—ষোল শতকে এক মসজিদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তরখণ্ড—সেটা রাখা হয়েছিল সকলের চোখে পড়ার মতো জায়গায়। যাহোক, গভর্নরের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, 'স্যার, ওই অর্থে জাদু নয়, বিস্ময় জাগায় বলে জাদু —মা যেমন সন্তানকে বলে, ওরে আমার জাদু রে।' ব্যাখ্যার পরের অংশটা যথার্থ কিনা, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ হয়, তবে আমার বাক্য শেষ করার আগেই গভর্নর হুংকার দিলেন, 'না, জাদুঘর বলা চলবে না, মিউজিয়ম বলতে হবে, বাংলায়ও আপনারা মিউজিয়মই বলবেন।' তর্ক করা বৃথা— হুকুম শিরোধার্য করে আমি চ্যান্সেলরের সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। যঃ পলায়েতে স জীবতি।

আরও একটা প্রবাদ আছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমারও তাই হলো। গভর্নরের সামনে থেকে চলে আসার পর মনে হলো, তাঁকে বললাম না কেন, জাদু শব্দটা ফারসি,–তাতে হয়ত তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতেন। আপনারা অনেকেই জানেন, জাদুঘর পুরোটাই ফারসি, তবে জাদুঘরের ঘরটা বাংলা। উর্দুতে জাদুঘরকে বলে আজবখানা, হিন্দিতে অজায়েব–ঘর। খানা ফারসি; আজব, আজিব, আজায়েব আরবি। জাদু ও আজব শব্দে দ্যোতনা আছে দুরকম : একদিকে কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকি; অন্যদিকে চমৎকার, মনোহর, কৌতূহলোদ্দীপক। 'আমার ছেলেকে সোজা পেয়ে মেয়েটা জাদু করেছে' আর 'কী জাদু বাংলা গানে!'–দু রকম দ্যোতনা প্রকাশ করে।

বয়সের দোষে এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। মোনায়েম খান যে সেদিন রাগ করেছিলেন এবং জাদুঘরের অন্য অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও যে তিনি আল্লাহর কালামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, এখন মনে হয়, তার একটা তাৎপর্য ছিল। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই জাদুঘরে সংরক্ষিত মুসলিম ঐতিহ্যমূলক নিদর্শন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল এবং বাংলায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জাদুঘরকে যেহেতু 'জাদুঘর' বলে, তাই তিনি সেটা বর্জন করে 'মিউজিয়ম' শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হিসেবে। জাদুঘরকে যদি তিনি আত্মপরিচয়লাভের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে থাকেন, তাহলে মোটেই ভুল করেননি। অল্প বয়সে আমি যখন প্রথম ঢাকা জাদুঘরে যাই, তখন আমিও একধরনের আত্মপরিচয়ের সূত্র সেখানে খুঁজে পাই—অতটা সচেতনভাবে না হলেও। বাংলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। স্থাপত্যের নিদর্শন বলতে প্রধানত ছিল কাঠের ও পাথরের স্তম্ভ, আর ভাস্কর্য ছিল অজস্র ও নানা উপকরণে তৈরি। বঙ্গদেশে অত যে বৌদ্ধ মূর্তি আছে, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না; পৌরাণিক-লৌকিক অত যে দেবদেবী আছে, তাও জানতাম না। মুদ্রা এবং অস্ত্রশস্ত্র দেখে বাংলায় মুসলিম-শাসন সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়েছিল—ইসা খাঁর কামানের গায়ে বাংলা লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পোড়ামাটির কাজও ছিল কত বিচিত্র ও সুন্দর! জাদুঘরের বাইরে তখন রক্ষিত ছিল নীল জাল দেওয়ার মস্ত বড় কড়াই। নীল-আন্দোলনের ইতিহাস কিছুটা জানতাম। কড়াইয়ের বিশালত্ব চিত্তে সম্ভ্রম জাগাবার মতো, কিন্তু তার সঙ্গে যে অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুবিন্দু জড়িত, সেটা মনে পড়তে ভুল হয়নি। ঢাকা জাদুঘরে যা দেখেছিলাম, তার কথা বলতে গেলে পরে দেখা নিদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে—কিন্তু বঙ্গের হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস ও

সমৃদ্ধ সংস্কৃতির যে নমুনা সেখানে ছিল তা থেকে আমি বাঙালির আত্মপরিচয় লাভ করেছি। পরে তা শক্তিশালী হয়েছে কলকাতা জাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু জাদুঘরে আত্মপরিচয়জ্ঞাপনের এই চেষ্টা, নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার যত্নকৃত প্রয়াস দেখেছি। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেকো-রোমান মিউজিয়মে ও কায়রো মিউজিয়মে যেমন মিশরের পুরোনো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে, সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে দেখেছি আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিধ অর্জনের নিদর্শন এবং ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং টাওয়ার অফ লন্ডনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি ধরা আছে। কুয়েতের জাদুঘরে আমার ছেলেবেলায় দেখা ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সযত্ন স্থান দেখে চমৎকৃত হয়েছি; বুঝেছি, তাদের আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছে, কিন্তু দূর ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ হাতে আসেনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়দানের সূত্র জানানো। জাদুঘরে আমাদের যাওয়ার এটা একটা কারণ। সে আত্মপরিচয়লাভ অনেক সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনেরও সূচনা করে।

টাওয়ার অফ লন্ডনে সকলে ভিড় করে কোহিনুর দেখতে। আমিও তা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমার আরেকটা কথা মনে হয়েছিল। জাদুঘর হৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জায়গা বটে, তবে তা সবসময়ে নিজের জিনিস হবে, এমন কথা নেই। অন্যের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার হরণ করে এনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের জাদুঘর সাজাতে কুণ্ঠিত বোধ করে না।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে নানা দেশের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। কী উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে, সেকথা আপাতত মুলতবি রাখলাম। কিন্তু এসব দেখে অভিন্ন মানবসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, এত দেশে এত কালে মানুষ যা কিছু করেছে, তার সবকিছুর মধ্যে আমি আছি।

জাতীয় জাদুঘর একটা জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। যে সেখানে যায়, সে তার নিজের ও জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সংস্কৃতির সন্ধান পায়, আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করে। এই যে শত সহস্র বছর আগের সব জিনিস–যা হয়ত একদিন ব্যক্তির বা পরিবারের কুক্ষিগত ছিল–তাকে যে নিজের বলে ভাবতে পারি, তা কি কম কথা? আবার অন্য জাতির অনুরূপ কীর্তির সঙ্গে যখন আমি একাত্মতা অনুভব করি, তখন আমার উত্তরণ হয় বৃহত্তর মানবসমাজে।

জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি জোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সমাজের এক স্তরে সঞ্চিত জ্ঞান তা ছড়িয়ে দেয় জনসমাজের সাধারণ স্তরে। গণতন্ত্রায়ণের পথও প্রশস্ত হয় এভাবে। জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ। কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি, তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও কারণ ঘটাতে পারে।

আরও একটা সোজা ব্যাপার আছে। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। মানুষের অনন্ত উদ্ভাবন-নৈপুণ্যে, তার নিরলস সৃষ্টিক্ষমতা, তার তন্নিষ্ঠ সৌন্দর্যসাধনা, তার নিজেকে বারংবার অতিক্রম করার প্রয়াস–এসবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমরা অশেষ উল্লসিত হই।

এতকিছুর পরেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'জাদুঘরে কেন যাবে?' সূক্ষ্ম কৌতুক সঞ্চার করে প্রাবন্ধিক পরিশেষে লিখেছেন যে, তাহলে তার একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই : 'কে বলছে আপনাকে যেতে?'

শব্দার্থ ও টীকা

মিউজিয়াম স্টাডিজ	–	জাদুঘর বা প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা।
আলেকজান্দ্রিয়া	–	উত্তর মিশরের প্রধান সমুদ্রবন্দর ও সুপ্রাচীন নগর। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট এই নগর পত্তন করেন। এটি ছিল আলেকজান্ডার যুগের গ্রিক সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে বিশ্বের প্রাচীন গ্রন্থাগার (পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত) ছিল।
অবিদিত	–	জানা নেই এমন। অজানা। অজ্ঞাত।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস – খ্রিষ্টীয় চৌদ্দো থেকে ষোলো শতক ধরে ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগরণের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণই ইউরোপীয় রেনেসাঁস।

ফরাসি বিপ্লব – ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি জনগণ সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি আর অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার।' এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।

রুশ বিপ্লব – ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লবী নেতা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সর্বহারার দল বলশেভিক পার্টি সেখানকার জারতন্ত্রকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় জনগণ তথা রাষ্ট্র।

টাওয়ার অফ লন্ডন – লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর তীরবর্তী রাজকীয় দুর্গ। এর মূল অংশে রয়েছে সাদা পাথরের গম্বুজ। এটি নির্মিত হয় ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। এক সময় দুর্গটি রাজকীয় ভবন ও রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে অস্ত্রশালা ও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত।

গোচরীভূত – অবগত। পরিজ্ঞাত।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় – যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বারো শতকের প্রথম দিকে। শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত জাদুঘর অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান।

অ্যাশমল – ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক। জন্ম ১৬১৭; মৃত্যু ১৬৯২। তিনি রসায়ন ও পুরাকীর্তি বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর সংগ্রহগুলি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম।

অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম – ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক অ্যাশমলের সংগ্রহ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর। এই সংগ্রহশালার প্রাচীন ভবন গড়ে ওঠে ১৬৭৯-১৬৮৩ কালপর্বে। বর্তমান অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম – প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত এই জাদুঘর ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৩। সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন, আর্ল অব অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লি–এই তিনজন সংগ্রাহকের বই, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদির বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ ক্রয় করে এই জাদুঘর গড়ে তোলে।

প্রত্নতত্ত্ব – এই বিদ্যায় প্রাচীন মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করা হয়। পুরাতত্ত্ব। archaeology।

নৃতত্ত্ব – মানব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নৃবিদ্যা। anthropology।

মৎস্যাধার – মাছ পালনের কাচের আধার। মাছের চৌবাচ্চা। জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ সংরক্ষণের কৃত্রিম জলাধার। aquarium।

ল্যুভ – Louvre Museum। ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি। প্যারিসে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই জাদুঘরের চিত্রশিল্পের সংগ্রহ বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত।

হার্মিটেজ – সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রম। মঠ। hermitage।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	–	বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর। এ দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে এটি নিয়োজিত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জাদুঘর হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরের শাহবাগে এর অবস্থান।
জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর	–	এই জাদুঘর বাংলাদেশের অনন্য জাদুঘর। চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদে অবস্থিত এই জাদুঘরে বাংলাদেশের পঁচিশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ বিদেশি পাঁচটি দেশের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রয়েছে।
ঢাকা নগর জাদুঘর	–	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত এই জাদুঘর নগর ভবনে অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর লক্ষ্য ঢাকা নগরের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এই জাদুঘর ঢাকা সংক্রান্ত বেশকিছু বই প্রকাশ করেছে।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	–	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন ও স্মারক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্যে এই জাদুঘর বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সবার সামনে তুলে ধরার কাজেই জাদুঘর অনন্য অবদান রেখে আসছে।
বঙ্গবন্ধু জাদুঘর	–	এই জাদুঘর ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে ১৯৯৭ সালে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। এই জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক দুর্লভ ছবি, তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয়েছে।
বিজ্ঞান জাদুঘর	–	ঢাকায় অবস্থিত এই জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভৌতবিজ্ঞান, শিল্পপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, মজার বিজ্ঞান, ইত্যাদি গ্যালারি ছাড়াও সায়েন্স পার্ক, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ইত্যাদি রয়েছে। এই জাদুঘর তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনামূলক কাজে প্রণোদনা দিয়ে থাকে।
সামরিক জাদুঘর	–	১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শহরের কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে এটি স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন যুগের সমরাস্ত্র, ট্যাংক, ক্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ইত্যাদি দেখার সুযোগ এ জাদুঘরে রয়েছে।
বরেন্দ্র জাদুঘর	–	প্রাতিষ্ঠানিক নাম বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ও রাজশাহীতে অবস্থিত। এ জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর। এখানে ভাস্কর্য, খোদিত লিপি, পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মুদ্রার মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণায় এগুলি আকর-উপাদান হিসেবে গণ্য।
বলধা গার্ডেন	–	ঢাকা মহানগরের ওয়ারীতে এর অবস্থান। এটি একাধারে উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘর। ভাওয়ালের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯০৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাদুঘরের অনেক নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বলধা গার্ডেনে দেশি-বিদেশি অনেক প্রজাতির গাছপালার আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর	–	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক হস্তান্তরিত ছোট সংগ্রহ নিয়ে ১৯৭৩ সালে এই জাদুঘরের যাত্রা শুরু। এই জাদুঘরে রয়েছে টার্সিয়ারি যুগের মাছের জীবাশ্ম, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননকৃত শিল্পবস্তু, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রা, শিলালিপি, ভাস্কর্য, অস্ত্রশস্ত্র, লোকশিল্প ইত্যাদি নিদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের কিছু দলিলপত্র। এ ছাড়া একাডেমিক প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ জাদুঘর সক্রিয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।
দ্বিজাতি তত্ত্ব	–	ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ভারতকে ধর্মীয় প্রাধান্যের ভিত্তিতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করার রাজনৈতিক মতবাদ। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এ ধারণার উদ্গাতা তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।
স্থাপত্য	–	ভবন প্রাসাদ ইত্যাদি স্থাপনের কাজ বা এ সংক্রান্ত কলাকৌশল বা বিজ্ঞান। architecture।
ভাস্কর্য	–	ধাতু বা পাথর ইত্যাদি খোদাইয়ের শিল্প। মূর্তিনির্মাণ কলা। sculpture।
কলকাতা জাদুঘর	–	এটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম বা ভারতীয় জাদুঘর নামেও সমধিক পরিচিত। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৪ সালে। এটিই ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর।
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল	–	প্রাতিষ্ঠানিক নাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। রানি ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ। কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ কোণে অবস্থিত সুরম্য শ্বেতপাথরে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধ অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন।
গ্রেকো রোমান মিউজিয়ম	–	মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে। এতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পুরানিদর্শনসহ প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতার অনেক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।
কায়রো মিউজিয়ম	–	মিশরের কায়রোতে অবস্থিত এই জাদুঘর মিশরীয় জাদুঘর নামেও পরিচিত। এটি ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার প্রদর্শন সামগ্রী রয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

এই রচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা ‘ঐতিহ্যায়ন’ (২০০৩) থেকে সংকলিত হয়েছে।

জাদুঘর হচ্ছে এমন এক সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান যেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয় সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্যে। অর্থাৎ জাদুঘর কেবল বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিদর্শনগুলি প্রদর্শন করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও সেগুলি সংরক্ষণ করে রাখে। সংগৃহীত নিদর্শনগুলিকে জাদুঘরে যথাযথভাবে পরিচিতিমূলক বিবরণসহ এমন আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করা হয় যেন তা থেকে দর্শকরা অনেক কিছু জানতে পারেন, পাশাপাশি আনন্দও পান। এ ছাড়াও জাদুঘরে আয়োজন করা হয় বক্তৃতা, সেমিনার, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদির। পরিদর্শকদের মধ্যে জানার কৌতূহল বাড়িয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। এভাবে জাদুঘর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে জনগণকে আকৃষ্ট ও সম্পৃক্ত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গুরুত্বের কথা এবং মানব জাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরায় নানা ধরনের জাদুঘরের ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে আকর্ষণীয় ঢঙে ও মনোগ্রাহী ভাষায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোথায় অবস্থিত?

ক. কলকাতায় খ. লন্ডনে

গ. প্যারিসে ঘ. ঢাকায়

২. ব্রিটিশ মিউজিয়ম, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থাগারের জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রয়োজন হয়েছিল–

i. বিচিত্র সংগ্রহের কারণে

ii. সংরক্ষণের সুবিধার্থে

iii. সংগ্রহের বিপুলতার কারণে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

ফিলিপ শিক্ষা-সফরে বলধা গার্ডেনে গিয়ে নানা ধরনের উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত হয়। অজানা অসংখ্য উদ্ভিদ এবং আহরিত নতুন জ্ঞান তাকে কৌতূহলী করে তোলে।

৩. ফিলিপের কৌতূহলী হওয়া এবং 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনায় মানুষের আবেগাপ্লুত হওয়ার কারণ, জাদুঘর–

ক. আনন্দদায়ক ও বৈচিত্রপূর্ণ খ. বৈচিত্রপূর্ণ ও ভীতিকর

গ. অভিনব ও রোমাঞ্চকর ঘ. আনন্দদায়ক ও রহস্যপূর্ণ

৪. উক্ত দিক নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও আত্মপরিচয়দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়

খ. গড়পড়তা মানুষ তা দেখতে যায়, দেখে আপ্লুত হয়

গ. জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি যোগায়

ঘ. জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন

সৃজনশীল প্রশ্ন

ফ্রান্সের লোকদের দেশাত্মজ্ঞান অমনি করেই হয় বলে তাদের দেশাত্মবোধ আপনা আপনিই জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথ চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্ব-পুরুষদের, যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে। আর দেশের প্রতি জেলার প্রতি পর্বতের নাম–যাদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।

ক. পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল কোথায়?

খ. জাদুঘর কীভাবে গড়ে ওঠে?

গ. অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনাটির যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাদৃশ্যগত দিকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কিত? যাচাই কর।

রেইনকোট

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

লেখক-পরিচিতি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা কথাসাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার নাম। ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রামে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত নারুলি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম বি.এম. ইলিয়াস এবং মাতার নাম মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। প্রথমে বগুড়ায় ও পরে ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি লেখার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর কখনো জোর দেননি। বরং গুরুত্ব দিয়েছেন লেখার গুণগত মানের ওপর। জীবন ও জগৎকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয়কে করেছেন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের জীবনকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই। মানুষের পরম সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রান্তসমূহ উন্মোচনেও তাঁর রয়েছে গভীর দক্ষতা। তাঁর পাঁচটি ছোটগল্প গ্রন্থে সংকলিত আছে মাত্র ২৮টি গল্প। এছাড়া রয়েছে ২টি উপন্যাস ও ১টি প্রবন্ধসংকলন। তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম : 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'খোয়ারি', 'দুধভাতে উৎপাত', 'দোজখের ওম', 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল'। উপন্যাস দুটি হলো : 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা'।

১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখন ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড-কভারের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আর-একপশলা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অন্তত তিন দিন ফুটফাট বন্ধ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কই? ম্যান প্রোপোজেস–। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেস্তে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন।– পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কালেমা সব সময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে। –তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপ্‌টার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিনসিপ্যালের পিওন। আলহামদুলিল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটার চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে, "স্যার নে সালাম দিয়া।" বলেই ভাঙাচোরা গালের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শাঁসটুকু শুষে নেয় এবং হুকুম ছাড়ে, "তলব কিয়া। আভি যানে হোগা।"

কী ব্যাপার?

বেশি কথা বলার সময় নাই—কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে।

মানে?

"'মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর অয়াপস যানেকা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।"

ভয়াবহ কাণ্ড। ইলেকট্রিক ট্র্যান্সফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালান পার হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বাঁ দিকে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজের জিমন্যাশিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিনসিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ক্রস করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, "ক্যায়সে?"

প্রিনসিপ্যালের পিওন জানবে কী করে? "উও আপ হি কহ সকতা।"

মানে? সে-ই বা বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি?—তার মাথাটা আপনাআপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে, "ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে। চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগা।"

'নেহি।' নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, "আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।"

কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়, রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়ত ডেমোটেড হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলে। আরও নিচেও নামাতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঠেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।

"যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার—।" বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিনসিপ্যালের ধমকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আল্লাই জানে! ফায়ারিং স্কোয়াডে যদি দাঁড় করিয়েই দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে গুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিনসিপ্যাল কি তার জন্যে কর্নেলের কাছে এই তদবিরটুকু করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিনসিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই গেছে, প্রথমেই কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই। তা প্রিনসিপ্যাল তাদের এত বড়ো একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে গুলি করার সময় শরীরের আলতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানবে না? আবার প্রিনসিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের জন্যে এতটুকু করবে না?

প্যান্টের ভেতর পা গলিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ বলছে, "তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়।"

এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী?–রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশন নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুশমনকে সম্পূর্ণ কব্জা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম। প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ শোনা যায়, আওয়ার আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্য সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেনটেটিভ্‌স অব দ্য পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি, আই মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মন্ত্রীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ তার এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

"এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।" বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা গেল, "তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।"

ইস! আবার মিন্টু। বৌয়ের এই ভাইটার জন্যেই তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা যায় না, ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে। ও চলে যাবার তিনদিন পরেই পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলা তার বৌকে জিগ্যেস করেছিল, "ভাবি, আপনার ভাইকে দেখছি না।" ব্যস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাবার জন্যে লেগে গেল হন্যে হয়ে। মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্‌টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের তলার ভদ্রলোক একদিন বলছিল, "আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না। যে গোলমাল, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।" শুনে বুকটা তার ঢিপঢিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ তোলে? নিরাপত্তার জন্যেই সে এখানে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। শহর থেকেও দূরেই বলা যায়। ভেবেছিল নতুন এলাকা, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো অস্ত্র ঢুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যিখানে। মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সে-ও জানে তার বৌ-ও জানে। কিসিনজার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। –মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িঘর, গ্রাম, বাজারহাট জ্বালিয়ে দিচ্ছে,–কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। এসব হলো ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। –না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াও ঠিক নয়। নিচের ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজাকার। সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়।

"দেখি তো, ফিট করে কিনা।" আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে দিতে বলে, "মিন্টু তো আমার অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?" –দেখো, ফের মিন্টুর দৈর্ঘ্যের তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

"ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।" এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়।

"আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।" আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে–। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ।

তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, "আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী। তাই না?"

এ তো ভাবনার কথা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুনরূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়। না-! খামাখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ নাই? প্রিনসিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ ঠিকই বলে, "শোনেন, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইন্‌ভলভ্‌ড।" তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ক্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়,-সে কখনো এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করেছে? কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে প্রিনসিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ক্লাসট্লাস সব বন্ধ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইম্‌লি যায়। স্টাফ রুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে, -কই, সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিনসিপ্যালের কামরায়। ড. আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়েন্টদের আশু ও অবশ্যম্ভাবী পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনে। ওই ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিনসিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে।

মিন্টুর ফেলে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিনসিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!

রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ,-ওদের তো একেক গুষ্টির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ-হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত-শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উত্তরেই। মিলিটারি লরির ল্যাজটাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগন্ধ নেই। বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের ছোট দোকানটার ঝাঁপ একটুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উত্তরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোঁড়াটা বিড়বিড় করে, কাল শোনেন নাই? মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাত্রী কম। না, না, কন্ডাক্টররা সবসময় যেমন-খালি-গাড়ি বলে চ্যাঁচায়, সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি পড়তে লাগল বাসের ভিজে মাটিতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অন্তত টিটকারি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না।

ঠোঁটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব হয়ে গেলেও কেউ টুঁ শব্দটি করছে না? তার পোশাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি?

খালি রাস্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ওই সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে, "রাখো রাখে"' বলতে বলতে ঝুঁকি নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলন্ত বাস থেকে। সে তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা দুটোই পকেটমার। নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুৎসই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোমে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তাইতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। হুঁ! এদেরও সে ঠিক চোর অথবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বস্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা ছোটে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি কোথাও লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্যে অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে পড়ে ঝটপট পায়। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। তার মানে তাকে বেশ ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরত।

যাক, মিন্টুর রেইনকোটে তার কাজ হচ্ছে। চোর ছ্যাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা থাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

আসাদ গেট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামালে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন 'আরে রাখো রাখো' এবং একজন 'রোখো-রোখো' বলতে বলতে নেমে পড়ল ধড়ফড় করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অর্ডিনারি চোর, ছিঁচকে চোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার। ফের নতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টির আঁশ উড়ছে; ঠান্ডা হাওয়ায় গাছপালা, লোকজন, দোকানপাট ও বাড়িঘরের ওপর ট্রান্সপারেন্ট আবরণ দেখে তার এক্সট্রা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো-লাগাটা চিড় খায়, বাস হঠাৎ করে ব্রেক কষলো। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে, চোখ পড়ে নির্মীয়মাণ মসজিদের ছাদের দিকে। দরজা থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া ঢুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগে; ক্রাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন সাহেব। ঠাণ্ডা হওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুঝি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিনতলায় থাকত তখন তারা। রাতভর ট্যাঙ্কের হুঙ্কার আর মেশিনগান আর স্টেনগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়নি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিলে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং বন্ধ জানালার পর্দা একটু তুলে সে রাস্তা দেখতে থাকে। রাস্তার ওপরে মসজিদের ছাদে মুয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়েছিল আজান দিতে। সাধারণত জুমার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মুয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানালার

ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেক্‌ট্রিসিটি নষ্ট, মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো। মুয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল 'আল্লাহু আকবার'। দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। সেদিন সকালে বৃষ্টি ছিল না। আজ বৃষ্টির সকালে মিলিটারি কি ওই দৃশ্যের পুনর্ঘটনের পাঁয়তারা করছে? এখন তো কোনো নামাজের ওয়াক্ত নেই, তবে আজান দেওয়াবে কি করে? এরা বোধ হয় যে কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ত ঘোষণা করে নতুন হুকুম জারি করেছে।

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভিতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগে বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে দ্রাম-দ্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হল্‌কা বেরোয় তার চোখ দিয়ে। তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে। মিলিটারির চোখ ছুঁচালো হয়ে আসে এবং ছুঁচালো চোখের মণি কাঁটার মতো বিঁধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভোঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে, ছুঁচালো চোখে, গোঁফের নিচে ও নাক, গোঁফ ও চোখের আশপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে, নেমে পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মনে হয় রেইনকোটের পানির ফোঁটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোঁটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোঁটা গোণাগুনতি সেরে মিলিটারি হঠাৎ বলে, 'আগে বাড়ো'। বাস হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের স্বস্তির নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায় এবং হুকুম করে, 'রাখেন নামবো'। বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমানো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপরাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট বাঁকায়, এতে তার সামনের সারির দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

প্রিনসিপালের কামরায় প্রিনসিপালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা। তার ভারিক্কি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পান্ডাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে প্রিনসিপালের কালো মুখ বেগুনি হয়, ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি, ই পি এস ই এস হওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্যার বলে, 'হি ইজ প্রফেসর হুদা।'

কিন্তু ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি নিজের ভুল সংশোধন না করে পারে না, 'সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি।

"শাট আপ।"

এবার প্রিনসিপাল থামে।

তাকে এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে নিয়ে মিলিটারি জিপে তোলার আগে জাঁদরেল কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার প্রিনসিপালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিন্সিপালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্বিগ্ন হয়, সাজিদ সাহেব যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এই মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল এঁকেবেঁকে। মস্ত উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক-চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ওই আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি করে। ঠেলাগাড়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে।

নুরুল হুদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোত্থেকে? তারা হলো কুলি, সে একজন লেকচারার।

তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন?

প্রিনসিপালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার, তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল–।

মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

"আমার নাম? সত্যি বলেছে? আমার নাম বলেছে?" নুরুল হুদার হঠাৎ চিৎকারে মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে, কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে।

নুরুল হুদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেঁষে! তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি নিয়ে সে কি যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে, 'বর্ষাকালেই তো জুৎ'। কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী? স্টাফরুমে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসফিস করছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন। –ওই ছদ্মবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুঝিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্থা? –উৎসাহে নুরুল হুদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌনতা মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেগে দুটো ঘুষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘুষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘুষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'!

ওই ঠিকানাটা বলে দিলেই তো তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, হ্যাঁ'। কিন্তু পরের

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য একটি ঘরে। তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাৎ সপাৎ করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হুদার কাছে মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।

শব্দার্থ ও টীকা

জেনারেল স্টেটমেন্ট	– সাধারণ বিবৃতি।
স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশন	– সুনির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ।
'তলব কিয়া। আভি যানা হোগা'	– 'তলব করেছেন। এখনই যেতে হবে।'
'মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর ওয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।'	– 'মিসক্রিয়েন্টরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছে। আবার ফিরে যাওয়ার সময় প্রিনসিপাল সাহেবের বাড়িতে গ্রেনেড ছুড়েছে। গেট ভেঙে গেছে।'
'ক্যায়সে?'	– 'কীভাবে?'
'উও আপ হি কহ সকতা'	– 'সেটি আপনিই বলতে পারেন।'
মিসক্রিয়ান্ট	– দুষ্কৃতকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবাহিনী এই শব্দটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে।
'আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।'	– 'আবদুস সাত্তার মৃধার বাসায় যেতে হবে। আপনি এখনই আসুন। এক কর্নেল সাহেব এর মধ্যেই চলে এসেছেন। সব প্রফেসরকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি আসুন।'

ওয়েলডিং ওয়ার্কশপ	–	ঝালাই কারখানা।
সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ	–	রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে এভাবে অভিহিত করত।
ক্র্যাক-ডাউনের রাত	–	১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে সেই রাতের কথা বলা হয়েছে।
রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার আমাদের জেনারেল মনসুন	–	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রবল বর্ষায় তেমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে সেই বিষয়টিরই তুলনা করা হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১* থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে গল্পটি রচিত। মুক্তিযুদ্ধের তখন শেষ পর্যায়। ঢাকায় তখন মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। তারই একটি ঘটনা এ গল্পের বিষয়; যেখানে ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণের ফলে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে এবং তাদের মধ্য থেকে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করে। নুরুল হুদার জবানিতে গল্পের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বিবৃত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের মধ্যে ঢাকা শহরের আতঙ্কগ্রস্ত জীবনের চিত্র। গেরিলা আক্রমণের ঘটনা ঘটে যে রাতে, তার পরদিন সকালে ছিল বৃষ্টি। তলব পেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে নুরুল হুদাকে কলেজে যেতে যে রেইনকোটটি পরতে হয় সেটি ছিল তার শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মন্টুর। গল্পে এই রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য অসাধারণ। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে সঞ্চারিত হয় যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম– তারই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কার জবানিতে "রেইনকোট" গল্পের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হয়েছে?

ক. আবদুস সাত্তার মৃধা খ. ড. আফাজ আহমদ
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. নুরুল হুদা

২. নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তলব করার কারণ–

ক. কমান্ডারের নির্দেশে খ. প্রিন্সিপালের অভিযোগে
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ভেবে ঘ. তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুক্তিফৌজ! কথাটা এত ভারী যে এই রকম অত্যাচারী সৈন্য দিয়ে ঘেরা অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে বসে মুক্তিফৌজ শব্দটা শুনলেও কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ওই অবিশ্বাসের ভেতর থেকে একটা আশা, একটা ভরসার ভাব ধীরে ধীরে মনের কোণে জেগে উঠতে থাকে।

৩. অনুচ্ছেদে "রেইনকোট" গল্পের কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা
খ. মুক্তিযোদ্ধাদের অদম্য শক্তি-সাহস
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর আস্থা
ঘ. যুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ মানুষের উৎকণ্ঠা

৪. উক্ত ভাবটি যে বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

ক. মিসক্রিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোর দিয়া
খ. একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম
গ. নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না
ঘ. বউয়ের এই ভাইটার জন্যই তাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. "রেইনকোট" গল্পে মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় স্থাপন করা হয়?

খ. দেশে একটা কলেজ ও শহিদ মিনার অক্ষত নেই কেন?

গ. চিত্রে "রেইনকোট" গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রিত দিকটি "রেইনকোট" গল্পের খণ্ডাংশমাত্র– বিশ্লেষণ কর।

মহাজাগতিক কিউরেটর

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থল সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ, জননী আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনা জেলায়। তাঁর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় বগুড়ায়। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলা ভাষায় রচিত সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির একচ্ছত্র সম্রাট। 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ' রচনার মাধ্যমে এ-ধারার সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তিনি একই সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও স্বপ্নচারী রোমান্টিক। তাঁর সাহিত্যেও বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠা ও মানবীয় কল্পনার সম্মিলন ঘটেছে। মাতৃভূমি, মানুষ ও ধরিত্রীর প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা তাঁর সাহিত্যিক মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের বিজ্ঞানমুখী তরুণ-প্রজন্মের তিনি আদর্শ। কিশোর উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনাতেও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিশোর উপন্যাস 'দীপু নাম্বার টু', 'আমার বন্ধু রাশেদ' এবং 'আমি তপু' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'মহাকাশে মহাত্রাস', 'টুকুনজিল', 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী', 'একজন অতিমানবী', 'ফোবিয়ানের যাত্রী'সহ অনেক পাঠকপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির তিনি স্রষ্টা। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞান লেখক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'বেশ পরিণত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে ক্ষুদ্র এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী।'

দ্বিতীয় প্রাণীটি আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ।'

'কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসকে আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাকটেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় স্থির। সালোকসংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙাতেও নানা ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতরে আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।'

প্রথম প্রাণীটি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ।'

'তুমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ।'

প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের নীলনকশা এই ডিএনএ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল—এটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।'

'হ্যাঁ।' দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, 'আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি—কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে—যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল।'

'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।'

'হ্যাঁ'।

'এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে।'

'গাছপালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।'

'এই প্রাণীটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটাকে বলে সাপ।'

'সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠান্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।'

'ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই।'

প্রথম প্রাণীটি বলল, 'আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে!'

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, 'হ্যাঁ, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি। তবে—'

'তবে কী?'

'এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে?'

'ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত।'

'এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।'

'হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?'

'কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।'

প্রথম প্রাণীটি বলল, 'এই প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণীটা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে।'

'ঠিকই বলেছ, গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?'

'তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান?'

‘কী?’

‘এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশির ভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়।’

‘ঠিকই বলেছ। আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।’

‘আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।’

‘কী?’

‘এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?’

‘কোন প্রাণীর কথা বলছ?’

‘মানুষ।’

‘মানুষ?’

‘হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘এই দেখ এরা শহর–বন্দর-নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।’

‘শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে। পশুপালন করছে।’

‘যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে।’

‘নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছ?’

‘কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে—’

‘কী?’

‘তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?’

‘তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?’

‘এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ? কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?’

‘এর সবই কি মানুষ করেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।’

‘এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।’

‘ঠিকই বলেছ।’

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদের বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে।’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা-ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর গ্রহ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না।’

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও সামাজিক প্রাণী। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে!'

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, 'ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে।'

'কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?'

'শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।'

'অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।'

'মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে।'

'প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করেনি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।'

'ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই?'

'হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।'

দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

মহাজাগতিক – মহাজগৎ সম্বন্ধীয়।

কিউরেটর – জাদুঘর রক্ষক। জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ – যা থেকে এমন রশ্মির বিকিরণ ঘটে যা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে দেখা যায়।

ওজোন স্তর – বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোন গ্যাসে পূর্ণ স্তর বিশেষ, যা আমাদের সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

নিউক্লিয়ার বোমা – পারমাণবিক বোমা।

ডাইনোসর – বর্তমানে লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক কালের বৃহদাকার প্রাণী।

গ্যালাক্সি – ছায়াপথ।

পাঠ-পরিচিতি

‘জলজ’ গ্রন্থের অন্তর্গত “মহাজাগতিক কিউরেটর” গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের ‘সায়েন্স ফিকশন সমগ্র’ তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানবকল্যাণকর্মী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। অনন্ত মহাজগৎ থেকে আগত মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটরের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীতে আগমনের তথ্য দিয়ে গল্পটির সূচনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে দুজন কিউরেটরের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে গল্পটি নাট্যগুণ লাভ করেছে। প্রজাতির যাচাই-বাছাই কালে পৃথিবীর নানা প্রাণীর গুণাগুণ কিউরেটরদের সংলাপে উঠে আসে। ‘মানুষ’ নামক প্রজাতি বিবেচনার ক্ষেত্রে কিউরেটর দুইজনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা মূলত কল্পকাহিনির লেখকেরও মনের কথা। দুইজন কিউরেটর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মনুষের কারণেই হ্রাস ঘটে যাচ্ছে ওজোন স্তরের। মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির ভারসাম্য। পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মানুষই নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে একে অন্যের ওপর। এই পরিস্থিতিতেও তারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান বলে কথিত। ‘মানুষ’ প্রজাতির নির্বুদ্ধিতায় তারা শঙ্কিত হয়। অবশেষে তারা পরিশ্রমী সুশৃঙ্খল সামাজিক প্রাণী পিঁপড়াকেই শনাক্ত করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে। ডাইনোসরের যুগ থেকে এখনো বেঁচে থাকা সুবিবেচক ও পরোপকারী পিঁপড়াকে তারা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বিবেচনায় সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কল্পকাহিনির রসের সঙ্গে সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন লেখকের তীব্র শ্লেষ ও পরিহাসের মিশ্রণ গল্পটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “মহাজাগতিক কিউরেটর” গল্পে মানুষের বয়স কত বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. এক মিলিয়ন খ. দুই মিলিয়ন
গ. তিন মিলিয়ন ঘ. চার মিলিয়ন

২. সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের প্রাণ সহজ এবং সাধারণ কেন?

ক. বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই খ. সকল প্রজাতি দেখতে একই রকম
গ. সকল প্রজাতির গঠন একই ঘ. প্রজাতিগুলোর গুণাগুণ ভিন্ন ভিন্ন

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও

কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝাপটায় লণ্ড-ভণ্ড মালঞ্চ গ্রাম। ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, ভেঙে পড়ে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী গ্রামবাসী ভেঙে না পড়ে সবাই মিলে পরস্পরের ঘর-বাড়ি মেরামত করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিপর্যয় কাটিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে এলেন।

৩. অনুচ্ছেদে “মহাজাগতিক কিউরেটর” গল্পের যে দিকগুলোর প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো-

i. একতা
ii. শৃঙ্খলা
iii. সহমর্মিতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত দিকের বিপরীত প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে নিচের কোন বাক্যে?

ক. এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে

খ. এদের মাঝে শ্রমিক আছে, সৈনিক আছে

গ. যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে

ঘ. অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

একদিন সকালে কাজলের বাড়ির পাশে একটি বানর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই জায়গা অন্য বানরেরা ঘিরে ধরে যেন বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে ফেলবে ওরা। ওই দিনই কলেজে যাবার পথে কাজল দেখল, কয়েকটি ছেলে একটি মেয়েকে উত্যক্ত করছে। আশে-পাশে অনেক মানুষ থাকলেও কেউ প্রতিবাদ করছেন না। কাজল সঙ্গের বন্ধুদের নিয়ে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেল।

ক. "মহাজাগতিক কিউরেটর"কোন জাতীয় রচনা?

খ. মহাজাগতিক কিউরেটরদ্বয়ের পিঁপড়া সংগ্রহের কারণ কী?

গ. কিউরেটরদের বিচারের আলোকে উদ্দীপকের কোন প্রাণীটি শ্রেষ্ঠ– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইতিবাচক কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক—উদ্দীপক ও 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার কর।

মহুয়া

দ্বিজ কানাই

লেখক-পরিচিতি

মধ্যযুগের কবি। দ্বিজ কানাই পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিবাসী। দল গঠন করে তিনি তৎকালীন লোকনাট্যরীতিতে নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। দ্বিজ কানাই এক অসবর্ণ তরুণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে গভীর দুঃখ ভোগ করেন বলে শোনা যায়। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান অনুযায়ী, তিনি সতেরো শতকের কবি। তাঁর সম্পর্কে যে প্রবাদ প্রচলিত তাতে জানা যায়, তিনি বর্ণবিভক্ত সমাজে উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও নিম্নবর্ণ অর্থাৎ শূদ্রশ্রেণির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। 'মহুয়া' পালা রচনায় তাঁর যে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তার মূলে তাঁর ব্যক্তি জীবনের সংস্কারমুক্ত মানবিক বোধ সক্রিয় বলে ধারণা করা হয়।

গারো পাহাড় পেরিয়ে হিমানী পর্বত ছাড়িয়ে 'সপ্ত সমুদ্দুর' পারে বাঘ-ভালুকের বসতি রয়েছে এমন নির্জন বনে বাস করে ডাকাত সর্দার হুমরা বাইদ্যা। তার ছোট ভাই মাইন্‌কা। এই বেদের দল ভ্রমণ করতে করতে এল ধনু নদীর পারে কাঞ্চনপুর গ্রামে। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের–

ছয় মাসের শিশুকন্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশিকালে হুমরা তারে করল চুরি॥
এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।
খেলা কছরত তারে যতনে শিখায়॥
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
হাট্টিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল॥
আগল ডাগল আখিরে আস্‌মানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাশুরা॥

মুনির মন টলে যাওয়ার মতো সুন্দরী হয়ে ওঠে সে। নাম তার মহুয়া সুন্দরী। অনেক দিন পরের কথা। বেদের দল উপস্থিত হলো বামনকান্দা গ্রামে। তাদের সঙ্গে রয়েছে খেলা দেখানোর নানা উপকরণ–

তোতা লইল ময়না লইল আরও লইল টিয়া।
সোনামুখী দইয়ল লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া॥
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়॥
শিকারি কুকুর লইল শিয়াল হেজা ধরে।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে॥

এই গ্রামে বাস করে নদ্যার চাঁদ–পূর্ণিমার চাঁদের মতো তার রূপ। মায়ের অনুমতি নিয়ে সে 'বাইর বাড়ি'র মহলে বাইদ্যার খেলার আয়োজন করে। বেদে কন্যার রূপের কথা আগেই শুনেছিল নদ্যার চাঁদ– স্বচক্ষে তা দেখে এবং খেলা কসরতে মুগ্ধ হয়ে মহুয়াকে সে হাজার টাকার শালসহ নানা বক্‌শিস প্রদান করে। তাদের উলুয়াকান্দায় বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য জমি প্রদান করে।

বেদের দলের দিন কাটছিল সুখেই। পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ নদ্যার চাঁদ ও মহুয়ার এক সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে দেখা হয় এবং ব্যাকুল হৃদয়ের কথা জানাজানি হয়।

'জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥
'শুন শুন ভিনদেশি কুমার বলি তোমার ঠাঁই।
কাইল বা কি কইছলা কথা আমার মনে নাই ॥
তুমি ত ভিনদেশি পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি ॥
'কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্বে ছিলি কোথা ॥
'নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই ॥

দিন যায়। দিবস রজনী আনমনা মহুয়ার মনের খবর জানতে পারে পালঙ্কসই– পরামর্শ দেয় ভুলে যাবার। মহুয়া বলে :

চন্দ্রসূর্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী ॥
বাইদ্যার সঙ্গে আমি যে সই যথায় তথায় যাই।
আমার মন বানধ্যা রাখে এমন স্থান আর নাই ॥
বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম দেশান্তরি।
বিশ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিয়াম দড়ি ॥

এদিকে চিরকেলে ভ্রমণ-পিয়াসী বেদের দলের এই গৃহী জীবন বাইদ্যা সর্দার হুমরার ভালো লাগে না। মাইনকার সাথে সে ভিনদেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ করে। সময় থেমে থাকে না। ফাগুন যায় যায়। নির্ঘুম নদের চাঁদ মধ্যরাতে বাঁশি তুলে নেয় হাতে। সে বাঁশির আহ্বানে ছুটে আসে প্রাণপ্রতিমা মহুয়া। মহুয়া জানায়–

শুন শুন নদ্যার ঠাকুর বলি যে তোমারে।
এই না গেরাম ছাড়্যা যাইবাম আজি নিশাকালে ॥
তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গেরে বন্ধু এইনা শেষ দেখা।
কেমন কর্যা থাকবাম আমি হইয়া অদেখা ॥
আর না শুনবাম রে বন্ধু তোমার গুণের বাঁশি।
আর না জাগিয়া বন্ধু পুয়াইবাম নিশি ॥
মনে যদি লয়রে বন্ধু রাখ্যো আমার কথা।
দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমার মাথা ॥
যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমারে।
উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে ॥

সেইদিনই অন্ধকার রাতে বেদের দল উত্তর দেশে পালিয়ে যায়– সকাল বেলা এলাকার সবাই দেখে বাড়িঘর সবই আছে কিন্তু বেদের দল নেই। খবর পৌঁছে যায় নদের চাঁদের কাছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সে পাগল হয়ে ওঠে মহুয়ার সন্ধানে। গভীর বেদনা সত্ত্বেও একদিন ঘুমন্ত মায়ের পায়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে নদের চাঁদ। ঘুরতে থাকে মাসের পর মাস যে পথে গেছে বেদের দল। সবাইকে জিজ্ঞাসা করে তার মহুয়াকে দেখেছে কি-না।

এদিকে পুত্রের অদর্শনে কাঁদতে কাঁদতে মা প্রায় অন্ধ হয়ে গেল।

অগ্রহায়ণ মাসের অল্প শীতে কংসাই নদীর পাড়ে নদের চাঁদ মহুয়াকে পেল। আহার নিদ্রাহীন মহুয়া তখন পাগলপ্রায়। সংসারে মন নেই, শরীরের দিকে তাকানো যায় না। সেই মহুয়া নদের চাঁদের আগমনে—

আজি কেনে অকস্মাতে হইল এমন ধারা।
ছয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খারা॥
দেল ভরিয়া কন্যা করিল রন্ধন।
জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিল ভোঞ্জন॥

হুমরা বাইদ্যাও নতুন অতিথিকে তার দলে বরণ করে নিল— কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভিন্ন। গভীর রাতে বিষমাখানো ছুরি মহুয়ার হাতে দিয়ে বলল—

'আমার মাথা খাওরে কন্যা আমার মাথা খাও
দুষমনে মারিয়া ছুরি সাওরে ভাসাও।'

মহুয়ার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে। ঘুমন্ত প্রিয়তমের কাছে এসে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে নিজ বুকে ছুরি বসাতে চায়। এমন সময় জেগে ওঠে নদের চাঁদ। সকল ঘটনা শুনে বলে—

'তোমার লাগিয়া কন্যা ফিরি দেশ বিদেশে।
তোমারে ছাড়িয়া কন্যা আর না যাইবাম দেশে॥
কী কইবাম বাপ মায়ে কেমনে যাইবাম ঘরে।
জাতি নাশ করলাম কন্যা তোমারে পাইবার তরে॥
তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ি।
এই হাতে মার লো কন্যা আমার গলায় ছুরি॥'
'পইড়া থাকুক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর।
তোমারে লইয়া বন্ধু যাইবাম দেশান্তর॥
দুই আঁখি যে দিগে যায় যাইবাম সেইখানে।
আমার সঙ্গে চল বন্ধু যাইবাম গহিন বনে॥'

চন্দ্র সূর্য সাক্ষী রেখে, বাপের বাড়ির তাজি ঘোড়ায় চড়ে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে দুজন। পথে পার্বত্য খরস্রোতা নদী। তাজি ঘোড়া বিদায় দিয়ে দুজন তখন পারাপারের চিন্তায় অস্থির। এমন সময় ভিনদেশি এক সাধুর নৌকা পেয়ে তারা তাতে উঠে পড়ে। মহুয়ার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ সাধু কৌশলে নদের চাঁদকে 'উজান পাকে' ফেলে দেয়। মহুয়াকে পাওয়ার ইচ্ছায় তাকে সে রানি করে রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। নানা প্রতিশ্রুতির পর—

এতেক শুনিয়া মহুয়া কী কাম করিল।
সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল॥
পাহাড়িয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল।
চুন-খয়েরে কন্যা বিষ মিশাইল॥
হাসিয়া খেলিয়া কন্যা সাধুরে পান দিল মুখে।
রসের নাগইরা পান খায় সুখে॥
'কী পান দিছলো কন্যা গুণের অন্ত নাই।
বাহুতে শুইয়া তোমার আমি সুখে নিদ্রা যাই॥'
'পান খাইয়া মাঝিমাল্লা বিষে পরে ঢলি।
নৌকার উপরে কন্যা হাসে খলখলি॥'

অচৈতন্য সাধুসহ নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে নদীপারের বনে প্রিয়কে খুঁজতে থাকে মহুয়া। এক ভাঙা মন্দিরে মুমূর্ষু নদের চাঁদকে খুঁজে পায় সে। এখানেও এক বৃদ্ধ জটাধারী সন্ন্যাসীর কবলে পড়ে মহুয়া। সন্ন্যাসীর হাত থেকে বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত এক রাত্রে অসুস্থ নদ্যার চাঁদকে কাঁধে নিয়ে বন ত্যাগ করে। অন্য বনে দিনে দিনে সুস্থ হয়ে ওঠে নদের চাঁদ। সুখেই কাটে সময় এই বনদম্পতির। কিন্তু একদিন হঠাৎ বংশী ধ্বনি শুনে চমকে ওঠে মহুয়া– চোখ থেকে গড়ায় পানি। নদের চাঁদ ভাবে– তার প্রাণপ্রতিমা হঠাৎ এমন বিরস-বদন ও চঞ্চল কেন? হুমরা বাইদ্যা ছোটকালে তাকে চুরি করে এনেছে, এটুকুর বাইরে তার জন্মপরিচয় আজও যে শোনা হলো না। মহুয়া জানায়– কালকে যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে সেকথা বলবে। বলতে বলতেই ঢলে পড়ে সে। নদের চাঁদ ভাবে মহুয়াকে হয়ত সাপে কেটেছে। সেমতেই সে পরিচর্যা করতে চায়। তখন–

কান্দিয়া মহুয়া কয়, এই শেষ দিন।
সাপে নাহি খাইছে মোরে গেছে সুখের দিন ॥
দূর বনে বাজল বাঁশি শুন্যাছ যে কানে।
আসিছে বাদ্যার দল বধিতে পরাণে ॥
আমারও পালং সই বাঁশি বাজাইল।
সামাল করিতে পরান ইসারায় কহিল ॥
আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া।
আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া ॥

ঘুম ভাঙতেই দেখে সামনে হুমরা বাইদ্যা দাঁড়ানো। হুমরা মহুয়াকে নির্দেশ দেয় দুশমন নদের চাঁদকে মেরে সুজনকে বিয়ে করতে। সর্দার মহুয়ার হাতে তুলে দেয় বিষলক্ষার ছুরি। মৃত্যু আসন্ন জেনে মহুয়া বলে–

শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুয়ারে ॥
শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায় ॥
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।
কর্মদোষে এত দিনে প্রাণ মোর যায় ॥

বলতে বলতে মহুয়া নিজের বুকেই ছুরি বিদ্ধ করে। হুমরার আদেশে বেদের দল নির্মমভাবে হত্যা করে নদের চাঁদকে।

অনুশোচনা জাগে হুমরা বাইদ্যার। ভালোবাসার অমলিন স্মৃতি জাগিয়ে রেখে দুজনেই শায়িত হয় এক কবরে। তাদের কবরে টুপটুপ ঝরে পড়ে পালঙ্ক সইয়ের মতো নানা জনের চোখের জল।
[গদ্যে রূপান্তরিত]

শব্দার্থ ও টীকা

গারো পাহাড়	–	ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো খাসিয়া পর্বতমালার অংশবিশেষ। এর কিছু অংশ ভারতের আসাম রাজ্য এবং কিছু অংশ বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত।
হিমানী পর্বত	–	(হিমানী = বরফপুঞ্জ) বরফের পাহাড়। ভারতের উত্তর সীমানায় অবস্থিত সর্বদা তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণি।
শুল	–	ষোল।
কছরত	–	কৌশল। দক্ষতা। নিপুণতা।
আগল ডাগল	–	আগর-ডাগর।
পাশুরা	–	পাশরা। বিস্মৃত হওয়া।

দইয়ল	–	দোয়েল।
রাও চণ্ডালের হাড়	–	রাজ-চণ্ডালের হাড়। চণ্ডালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাড়। বেদেরা তাদের বাজি করবার সময় এই হাড় ব্যবহার করে থাকে।
হেজা	–	শজারু। শজারু > সেজা > হেজা।
বাইর বাড়ি	–	বাড়ির বাইরের অংশ। বহির্বাটি।
বাইদ্যার খেলা	–	বেদে দলের নানারূপ খেলা বা শারীরিক কসরত।
সুদর	–	সহোদর।
সুতের হেওলা	–	স্রোতের শেওলা। এখানে আপনজনহীন। নিঃসঙ্গ।
পালঙ্কসই	–	মহুয়ার সখী। যার নাম পালঙ্ক বা পালাং।
বিশ	–	বিষ। গরল।
গৃহী জীবন	–	সংসারী বা গার্হস্থ্য জীবন।
বাইদ্যা	–	বেদে। যাযাবর। সাপুড়ে জাতিবিশেষ।
দেল	–	দিল। হৃদয়।
জাতি দিয়া	–	জাতি নষ্ট করে। নদের চাঁদ ব্রাহ্মণ হয়ে মহুয়ার রাঁধা ভাত খাওয়ায় সে জাতিভ্রষ্ট হয়েছে।
ভোঞ্জন	–	ভোজন। ভক্ষণ।
সাওরে	–	সাগরে।
বিষলক্ষা	–	বিষমিশ্রিত।
তাজি ঘোড়া	–	উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবান অশ্ব। আরবি ঘোড়া।
উজান পাকে	–	উজানে অবস্থিত জলঘূর্ণি।
উজান	–	স্রোতের উৎস দিক।
তক্ষকের বিষ	–	গিরগিটি জাতীয় একপ্রকার বিষধর সরীসৃপের বিষ।
রসের নাগইরা	–	রসপূর্ণ নাগরিয়া। রসিক নাগর।
পরভাতে	–	প্রভাতে। ভোরবেলা।
সুজন	–	বেদে-দলের যুবক সদস্য সুজন। হুমরা বাইদ্যার আশা–সুজনই হবে দলের ভবিষ্যৎ সর্দার। দলের স্বার্থেই সে মহুয়াকে সুজনের সাথে বিয়ে দিতে চায়।

পাঠ-পরিচিতি

দ্বিজ কানাই প্রণীত "মহুয়া" পালাটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গীতিকা (Ballad) ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর সংকলিত এবং ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রথম খণ্ড থেকে এ পালাটি গদ্যে রূপান্তর করে গৃহীত হয়েছে। পালাটিতে মহুয়ার দুর্জয় প্রেমশক্তি ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় কীভাবে মানবসৃষ্ট দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে গেল তারই মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গীতিকাটির কাহিনি গড়ে উঠেছে বর্ণ ও শ্রেণিবৈষম্যমুক্ত একটি মানবিক প্রণয়কে কেন্দ্র করে। একদিকে ছয় মাস বয়সী চুরি হওয়া কন্যা অনিন্দ্যকান্তি মহুয়া অন্যদিকে জমিদারপুত্র নদের চাঁদ। তাদের অদম্য প্রেম সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু বেদে সর্দার হুমরা সামাজিক, বৈষয়িক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে এ প্রেমের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়েও মিলনপিয়াসী দুটি মানব হৃদয় শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়। মৃত্যুই হয় তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

পালাটিতে কাহিনি বর্ণনায় সংহত রচনারীতির ঘাটতি ও নানা অতিশয়োক্তি রয়েছে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষায় রচিত ও নাটকীয় গুণসম্পন্ন এ পালাটিতে বর্ণনারীতির প্রাধান্য রয়েছে। এ অঞ্চলের তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতা সমৃদ্ধ পালাটি দুর্জয় প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "মহুয়া" কাহিনিতে বর্ণিত ধনু নদীর পাড়ে কোন গ্রাম?

ক. উলুয়াকান্দা খ. বামনকান্দা

গ. কাঞ্চনপুর ঘ. বালিয়াকান্দা

২. অন্ধকার রাতে বেদের দলের উত্তর দেশে পালিয়ে যাওয়ার কারণ কী?

ক. আগের জায়গা ভালো না লাগা খ. নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস ভালো না লাগা

গ. নতুন জায়গা আবিষ্কার ঘ. ভ্রমণবিলাসী মনোভাব

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

রুস্তম জানেন বাবা-মা কিছুতেই আলেয়াকে মেনে নেবেন না। আলেয়ার বংশগৌরব রুস্তমের সমকক্ষ নয়। আলেয়াকে ছাড়া রুস্তম কিছু ভাবতে পারেন না। তাই তিনি এক রাতে আলেয়াকে নিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমান।

৩. অনুচ্ছেদে "মহুয়া" কাহিনির যে দিকগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো–

i. ভাবালুতা

ii. ভালোবাসা

iii. নির্ভীকতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. ৩ নং প্রশ্নের উল্লিখিত দিকটি নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. ঘুমন্ত মায়ের পায়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে নদের চাঁদ

খ. তোমাকেই যদি না পাই তবে আর কেন বেঁচে থাকা

গ. মহুয়া প্রতিজ্ঞা করে বন্ধুকে নিয়ে দেশান্তরী হওয়ার

ঘ. মহুয়া নদের চাঁদকে না মেরে নিজের বুকে বিদ্ধ করে ছুরি

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাগরের সাথে দুলির সম্পর্ক তার বাবা মেনে নেননি। তাই দুলিকে অন্যত্র বিয়ে দেন তারা। অনেকদিন পর দুলির শ্বশুরবাড়িতে ফেরিওয়ালার বেশে হাজির হন সাগর। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে দুলি তাকে চিনতে পারেন। আবারও জেগে ওঠে তাদের পুরনো আবেগ। সুযোগ বুঝে এক রাতে সাগরের হাত ধরে দুলি পালিয়ে যান। তার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠানো হয় এবং তাদের অবস্থান খুঁজে পায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দুলি-সাগর একে অপরকে হারাতে রাজি নন। তাই তারা আত্মাহুতি দেন।

ক. বেদের দল একদিন অন্ধকার রাতে কোথায় পালিয়ে যায়?

খ. নদের চাঁদের হাতে মহুয়াকে তুলে দিতে হুমরা বেদে সম্মত নন কেন?

গ. দুলির সাথে মহুয়া চরিত্রের সাদৃশ্য নিরূপণ কর।

ঘ. সাগর-দুলির প্রেমের শাশ্বত রূপই যেন "মহুয়া" রচনার মূল উপজীব্য– মন্তব্যটির যথার্থ্য বিশ্লেষণ কর।

নেকলেস

মূল : গী দ্য মোপাসাঁ

অনুবাদ : পূর্ণেন্দু দস্তিদার

লেখক-পরিচিতি

গী দ্য মোপাসাঁ ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট ফ্রান্সের নর্মান্ডি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম Henri-Renri-Albert-Guy de Maupassant। তাঁর পিতার নাম গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ ও মায়ের নাম লরা লি পয়টিভিন (Laure Le Poittevin)। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মোপাসাঁ একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। পারিবারিক বন্ধু গুস্তাভ ফ্লবেয়ার মোপাসাঁর সাহিত্য-জীবনে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই মহান লেখকের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন। ফ্লবেয়ারের বাসায় মোপাসাঁর পরিচয় ঘটে এমিল জোলা ও ইভান তুর্গনেভসহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সঙ্গে। কাব্যচর্চা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হলেও মূলত গল্পকার হিসেবে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত কোনো বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য-চর্চার জগৎ তৈরি করেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি লক্ষ করা যায় না। অসাধারণ সংযম ও বিস্ময়কর জীবনবোধ তাঁর রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

গী দ্য মোপাসাঁ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক-পরিচিতি

পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর পিতা চন্দ্রকুমার দস্তিদার ও মাতা কুমুদিনী দস্তিদার। তিনি মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশ নেওয়ায় কারাবরণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন আইনজীবী; সমাজভাবুক লেখক হিসেবেও খ্যাতি ছিল তাঁর। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'কবিয়াল রমেশ শীল', 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', 'বীরকন্যা প্রীতিলতা'। এছাড়াও তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'শেখভের গল্প' ও 'মোপাসাঁর গল্প'। তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত। কিন্তু তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে সে ছিল অসুখী। তাদের কোনো জাতিবর্ণ নেই। কারণ জন্মের পরে পরিবার থেকেই তারা শ্রী, সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। সহজাত চাতুর্য, প্রকৃতিগত সুরুচি আর বুদ্ধির নমনীয়তাই হলো তাদের আভিজাত্য, যার ফলে অনেক সাধারণ পরিবারের মেয়েকেও বিশিষ্ট মহিলার সমকক্ষ করে তোলে।

সর্বদা তার মনে দুঃখ। তার ধারণা, যত সব সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু আছে, সেগুলির জন্যই তার জন্ম হয়েছে। তার বাসকক্ষের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেওয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো। তার মতো অবস্থার অন্য কোনো মেয়ে এসব জিনিস যদিও লক্ষ করত না, সে এতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হতো। যে খর্বকায় ব্রেটন এই সাধারণ ঘরটি তৈরি করেছিল তাকে দেখলেই তার মনে বেদনাভরা দুঃখ আর

বেপরোয়া সব স্বপ্ন জেগে উঠত। সে ভাবত তার থাকবে প্রাচ্য-চিত্র-শোভিত, উচ্চ ব্রোঞ্জ-এর আলোকমণ্ডিত পার্শ্বকক্ষ। আর থাকবে দুজন বেশ মোটাসোটা গৃহ-ভৃত্য। তারা খাটো পায়জামা পরে যেই বড় আরামকেদারা দুটি গরম করার যন্ত্র থেকে বিক্ষিপ্ত ভারি হাওয়ায় নিদ্রালু হয়ে উঠেছে, তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। সে কামনা করে একটি বৈঠকখানা, পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে। থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব, যার ওপর শোভা পাবে অমূল্য সব প্রাচীন কৌতূহল-উদ্দীপক সামগ্রী। যেসব পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ সব মেয়েদের কাম্য, সেসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বিকাল পাঁচটায় গল্পগুজব করবার জন্য ছোট সুরভিত একটি কক্ষ সেখানে থাকবে।

তিনদিন ধরে ব্যবহৃত একখানা টেবিলক্লথ ঢাকা গোল একটি টেবিলে তার স্বামীর বিপরীত দিকে সে যখন সান্ধ্যভোজে বসে এবং খুশির আমেজে তার স্বামী বড় সুরুয়ার পাত্রটির ঢাকনা তুলতে তুলতে বলে : 'ও! কি ভালো মানুষ! এর চেয়ে ভালো কিছু আমি চাই না–' তখন তার মনে পড়বে আড়ম্বরপূর্ণ সান্ধ্যভোজের কথা, উজ্জ্বল রৌপ্যপাত্রাদি, মায়াময় বনভূমির মধ্যে প্রাচীন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিরল পাখির চিত্রশোভিত কারুকার্যপূর্ণ পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়াল-এর কামনা। সে ভাবে, অপরূপ পাত্রে পরিবেশিত হবে অপূর্ব খাদ্য আর গোলাপি রং-এর রোহিত মাছের টুকরা অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে মুখে সিংহ-মানবীর হাসি নিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি-চুপি-বলা প্রণয়লীলার কাহিনি।

তার কাছে ফ্রক বা জড়োয়া গহনা নেই–নেই বলতে কিছু নেই। অথচ ঐ সব বস্তুই তার প্রিয়। তার ধারণা ঐসবের জন্যই তার সৃষ্টি। সুখী করার, কাম্য হওয়ার, চালাক ও প্রণয়যাচিকা হবার কতই না তার ইচ্ছা।

তার 'কনভেন্ট'-এর সহপাঠিনী এক ধনী বান্ধবী ছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে তার ভালো লাগত না। কারণ দেখা করে ফিরে এসে তার খুব কষ্ট লাগত। বিরক্তি, দুঃখ, হতাশা ও নৈরাশ্যে সমস্ত দিন ধরে সে কাঁদত।

এক সন্ধ্যায় হাতে একটি বড় খাম নিয়ে বেশ উল্লসিত হয়ে তার স্বামী ঘরে ফিরল।

সে বলল, 'এই যে, তোমার জন্য এক জিনিস এনেছি।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়ে তার ভিতর থেকে একখানা ছাপানো কার্ড বের করল। তাতে নিচের কথাগুলি মুদ্রিত ছিল :

'জনশিক্ষা মন্ত্রী ও মাদাম জর্জ রেমপন্নু আগামী ১৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁহাদের নিজ বাসগৃহে মসিঁয়ে ও মাদাম লোইসেলের উপস্থিতি কামনা করেন।'

তার স্বামী যেমন আশা করেছিল তেমনভাবে খুশি হওয়ার পরিবর্তে মেয়েটি বিদ্বেষের ভাব নিয়ে আমন্ত্রণ-লিপিখানা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে, বিড় বিড় করে বলে :

'ওখানা নিয়ে তুমি আমায় কী করতে বল?'

'কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি ভেবেছিলাম, এতে তুমি খুশি হবে। তুমি বাইরে কখনও যাও না, তাই এই এক সুযোগ, চমৎকার এক সুযোগ!

এটা জোগাড় করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সবাই একখানা চায়, কিন্তু খুব বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীদের বেশি দেওয়া হয়নি। সেখানে তুমি গোটা সরকারি মহলকে দেখতে পাবে।'

বিরক্তির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি অধীরভাবে বলে উঠল :

'ঐ ঘটনার মতো একটি ব্যাপার কী পরে আমি যাব বলে তুমি মনে কর?'

সে ঐ সম্পর্কে কিছু ভাবেনি। তাই সে বিব্রতভাবে বলে :

'কেন আমরা থিয়েটারে যাবার সময় তুমি যেই পোশাকটা পর সেটা পরবে। ওটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে–'

তার স্ত্রীকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে সে আতঙ্কে নির্বাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার চোখের পাশ থেকে বড় বড় দুফোঁটা অশ্রু তার গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। সে থতমতভাবে বলল :

'কী হলো? কী হলো তোমার?'

প্রবল চেষ্টায় মেয়েটি নিজের বিরক্তি দমন করে, তার সিক্ত গণ্ড মুছে ফেলে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় :

'কিছুই না। শুধু আমার কোনো পোশাক নেই বলে আমি ঐ ব্যাপারে যেতে পারব না। তোমার যে কোন সহকর্মীর স্ত্রীর পোশাক আমার চেয়ে যদি ভালো থাকে, কার্ডখানা নিয়ে তাকে দাও।'

সে মনে মনে দুঃখ পায়। তারপর সে জবাব দেয় :

'মাতিলদা, বেশ তো চল আলাপ করি আমরা। এমন কোনো পোশাক, অন্য কোনো উপলক্ষেও যা দিয়ে কাজ চলবে অথচ বেশ সাদাসিধা, তার দাম কত আর হবে?'

কয়েক সেকেন্ড মেয়েটি চিন্তা করে দেখে এমন একটি সংখ্যার বিষয় স্থির করল যা চেয়ে বসলে হিসাবি কেরানির কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক আতঙ্কিত প্রত্যাখ্যান যেন না আসে।

শেষপর্যন্ত ইতস্তত করে মেয়েটি বলল :

'আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় চারশ ফ্রাঁ হলে তা কেনা যাবে।'

শুনে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। কারণ, তার যেসব বন্ধু গত রবিবারে নানতিয়ারের সমভূমিতে ভরতপাখি শিকারে গিয়েছিল, আগামী গ্রীষ্মে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় একটি বন্দুক কিনবার জন্য ঠিক ততটা অর্থই সে সঞ্চয় করেছিল। তা সত্ত্বেও জবাব দিল :

'বেশ ত। আমি তোমায় চারশত ফ্রাঁ দেব। কিন্তু বেশ সুন্দর একটি পোশাক কিনে নিও।'

'বল'-নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লোইসেলকে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন মনে হয়। অবশ্য তার পোশাক প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। একদিন সন্ধ্যায় তার স্বামী তাকে বলল :

'তোমার হয়েছে কী? গত দুই-তিন দিন ধরে তোমার কাজকর্ম কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে।'

শুনে মেয়েটি জবাব দেয়, 'আমার কোনো মণিমুক্তা, একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি। আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে। তাই এই অনুষ্ঠানে আমার না যাওয়াই ভালো হবে।'

স্বামী বলল, 'কিছু সত্যকার ফুল দিয়ে তুমি সাজতে পার। এই ঋতুতে তাতে বেশ সুরুচিপূর্ণ দেখায়। দশ ফ্রাঁ দিলে তুমি দুটি কি তিনটি অত্যন্ত চমৎকার গোলাপফুল পাবে।'

মেয়েটি ঐ কথায় আশ্বস্ত হলো না। সে জবাবে বলল, 'না, ধনী মেয়েদের মাঝখানে পোশাকে-পরিচ্ছদে ঐ রকম খেলো দেখানোর মতো আর বেশি কিছু অপমানজনক নেই।'

তখন তার স্বামী চেঁচিয়ে উঠল : 'আচ্ছা, কী বোকা দেখত আমরা! যাও, তোমার বান্ধবী মাদার ফোরসটিয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বল তার জড়োয়া গহনা যেন তোমায় ধার দেয়। এটুকু আদায় করার তো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় যথেষ্ট।'

সে আনন্দধ্বনি করে উঠল। তারপর সে বলল :

'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।'

পরদিন সে তার বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে তার দুঃখের কাহিনি তাকে বলল। মাদাম ফোরসটিয়ার তার কাচের দরজা লাগানো গোপনকক্ষে গিয়ে বড় একটি জড়োয়া গহনার বাক্স বের করে এনে তা খুলে বলল :

'ভাই, যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও।'

সে প্রথমে দেখল কয়েকটি কঙ্কন, তারপর একটি মুক্তার মালা ও মণিমুক্তা-খচিত চমৎকার কারুকার্য-ভরা একটি সোনার ভিনিশাঁর 'ক্রুশ'। আয়নার সামনে গিয়ে সে জড়োয়া গহনাগুলি পরে পরে দেখে আর ইতস্তত করে, কিন্তু ওগুলি নেওয়ার সিদ্ধান্তও করতে ছেড়ে যেতেও পারে না। তারপর সে জিজ্ঞাসা করে :

'আর কিছু তোমার নেই?'

'কেন? আছে, তোমার যা পছন্দ তুমি তা বেছে নাও।'

হঠাৎ সে কালো স্যাটিনের একটি বাক্সে দেখল অপরূপ একখানা হীরার হার। অদম্য কামনায় তার বুক দুর দুর করে। সেটা তুলে নিতে গিয়ে তার হাত কাঁপে। সে তার পোশাকের উপর দিয়ে সেটা গলায় তুলে নেয় এবং সেগুলো দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়। তারপর উদ্বেগভরা, ইতস্ততভাবে সে জিজ্ঞাসা করল :

'তুমি ঐখানা আমায় ধার দেবে? শুধু এটা?'

'কেন দেব না? নিশ্চয়ই দেব।'

সে সবেগে তার বান্ধবীর গলা জড়িয়ে ধরে, পরম আবেগে তাকে বুকে চেপে ধরে। তারপর তার সম্পদ নিয়ে সে চলে আসে।

'বল' নাচের দিন এসে গেল। মাদাম লোইসেলের জয়জয়কার। সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী, সুরুচিময়ী, সুদর্শনা, হাস্যময়ী ও আনন্দপূর্ণ। সব পুরুষ তাকে লক্ষ করছিল, তার নাম জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করছিল। মন্ত্রিসভার সব সদস্যের তার সঙ্গে 'ওয়ালটজ' নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।

আনন্দে মত্ত হয়ে আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে সে নৃত্য করছিল। তার রূপের বিজয়গর্বে, সাফল্যের গৌরবে সে আর কিছুই ভাবে না। এক আনন্দের মেঘের ওপর দিয়ে যেন ভেসে আসছিল এই সব আহুতি ও মুগ্ধতা আর জাগ্রত সব কামনা। যে কোনো মেয়ের অন্তরে এই পরিপূর্ণ বিজয় কত মধুর!

ভোর চারটার দিকে সে বাড়ি ফিরে গেল। অন্য সেই তিনজন ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব বেশি ফুর্তিতে মত্ত ছিল, তাদের সঙ্গে তার স্বামী ছোট একটি বিশ্রামকক্ষে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আধঘুমে বসেছিল।

বাড়ি ফিরবার পথে গায়ে জড়াবার জন্য তারা যে আটপৌরে সাধারণ চাদর নিয়ে এসেছিল সে তার কাঁধের ওপর সেটি ছড়িয়ে দেয়। 'বল' নাচের পোশাকে অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে ঐটির দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। মেয়েটি তা অনুভব করতে পারে তাই অন্য যেসব ধনী মেয়ে দামি পশমি চাদর দিয়ে গা ঢেকেছিল তাদের চোখে না পড়বার জন্য সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল।

লোইসেল তাকে টেনে ধরে বলল : 'থামো, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে ওখানে। আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি।'

কিন্তু মেয়েটি কোনো কথায় কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। রাস্তায় যখন তারা পৌঁছে গেল, সেখানে কোনো গাড়ি পাওয়া গেল না। তারা গাড়ির খোঁজ করতে করতে দূরে কোনো একখানাকে দেখে তার গাড়োয়ানকে ডাকতে থাকে।

হতাশ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা সিন নদীর দিকে হাঁটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যে পুরাতন একখানা তারা পায়, তাহলো সেই নিশাচর দুই-যাত্রীর গাড়ি যা প্যারিতে সন্ধ্যার পর লোকের চোখে পড়ে, তার একখানা, যেইদিনে এইগুলি নিজের দুর্দশা দেখাতে লজ্জা পায়।

ঐ খানি তাদের মার্টার স্ট্রিটে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারা ক্লান্তভাবে তাদের কক্ষে গেল। মেয়েটির সব কাজ শেষ। কিন্তু স্বামীর ব্যাপারে, তার মনে পড়ল যে দশটায় তাকে আপিসে গিয়ে পৌঁছাতে হবে।

নিজেকে গৌরবমণ্ডিত রূপে শেষ একবার দেখার জন্য সে আয়নার সামনে গিয়ে তার গলার চাদরখানা খোলে। হঠাৎ সে আর্তনাদ করে উঠল। তার হারখানা গলায় জড়ানো নেই।

তার স্বামীর পোশাক তখন অর্ধেক মাত্র খোলা হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল : 'কী হয়েছে?'

উত্তেজিতভাবে মেয়েটি তার দিকে ফিরে বলল :

'আমার–আমার কাছে–মাদাম ফোরস্টিয়ারের হারখানা নেই।'

আতঙ্কিতভাবে সে উঠে দাঁড়াল : 'কী বললে! তা কী করে হবে? এটা সম্ভব নয়।'

পোশাকের ও বহির্বাসের ভাঁজের মধ্যে, পকেটে, সব জায়গায় তারা খোঁজ করে। কিন্তু তা পাওয়া গেল না।

স্বামী জিজ্ঞাসা করল : 'ঐ বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় তা যে তোমার গলায় ছিল, তোমার ঠিক মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আমরা যখন বিশ্রামকক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, তখনও তা ছিল আমার খেয়াল আছে।'

'কিন্তু তুমি যদি ওটা রাস্তায় হারাতে, ওটা পড়বার শব্দ আমাদের শোনা উচিত ছিল। গাড়ির মধ্যেই নিশ্চয়ই পড়েছে মনে হয়।'

'হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। তুমি গাড়ির নম্বরটি টুকে নিয়েছিলে?'

'না। আর তুমি কি তা লক্ষ করেছিলে?'

'না।'

হতাশভাবে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত লোইসেল আবার পোশাক পরে নিল।

সে বলল, 'আমি যাচ্ছি। দেখি যতটা রাস্তা আমরা হেঁটেছিলাম, সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

তারপর সে গেল। মেয়েটি তার সান্ধ্য গাউন পরেই রয়ে গেল। বিছানায় শুতে যাবার শক্তি তার নেই। কোনো উচ্চাশা বা ভাবনা ছাড়াই সে একখানা চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে রইল।

সকাল সাতটার দিকে তার স্বামী ফিরে এল। কিছুই সে খুঁজে পায়নি।

সে পুলিসের কাছে ও গাড়ির আপিসে গিয়েছিল এবং পুরস্কার ঘোষণা করে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে এসেছে। সে যথাসাধ্য করে এসেছে বলে তাদের মনে কিছুটা আশা হলো।

ঐ ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিভ্রান্ত অবস্থায় কাটাল। সন্ধ্যাবেলা যখন লোইসেল ফিরে এল তখন তার মুখে যন্ত্রণার মলিন ছাপ, কিছুই সে খুঁজে পায়নি।

সে বলল, 'তোমার বান্ধবীকে লিখে দিতে হবে যে হারখানার আংটা তুমি ভেঙে ফেলেছ, তাই তা তুমি মেরামত করতে দিয়েছ। তাতে আমরা ভেবে দেখবার সময় পাব।'

তার নির্দেশমত মেয়েটি লিখে দিল।

এক সপ্তাহ শেষ হওয়ায় তারা সব আশা ত্যাগ করল। বয়সে পাঁচ বছরের বড় লোইসেল ঘোষণা করল :

'ঐ জড়োয়া গহনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।'

পরদিন যেই বাক্সে ওটা ছিল, তার ভিতরে যেই স্বর্ণকারের নাম ছিল, তার কাছে তারা সেটা নিয়ে গেল। সে তার খাতাপত্র ঘেঁটে বলল :

'মাদাম, ঐ হারখানা আমি বিক্রি করিনি, আমি শুধু বাক্সটা দিয়েছিলাম।'

তারপর তারা সেই হারটির মত হার খোঁজ করার জন্য, তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করে এক স্বর্ণকার থেকে অন্য স্বর্ণকারের কাছে যেতে থাকে। দু'জনেরই শরীর বিরক্তি ও উদ্বেগে খারাপ হয়ে গেছে।

প্যালেস রয়েলে তারা এমন এক হীরার কণ্ঠহার দেখল সেটা ঠিক তাদের হারানো হারের মতো। তার দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে তারা তা পেতে পারে।

তিন দিন যেন ওটা বিক্রি না করে সে জন্য তারা স্বর্ণকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। তারা আরও ব্যবস্থা করল যে, যদি ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হওয়ার আগে ঐ হারটি খুঁজে পাওয়া যায়, তারা এটা ফেরত দিলে চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ ফেরত নিতে পারবে।

লোইসেলের কাছে তার বাবার মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত আঠারো হাজার ফ্রাঁ ছিল। বাকিটা সে ধার করল।

মাদাম লোইসেল যখন জড়োয়া গহনা মাদাম ফোরস্টিয়ারকে ফেরত দিতে গেল তখন শেষোক্ত মেয়েটি নির্জীবকণ্ঠে বলল :

'ওটা আরও আগে তোমায় ফেরত দেওয়া উচিত ছিল; কারণ, তা আমারও দরকার হতে পারত।'

তার বান্ধবী সেই ভয় করেছিল, তেমনভাবে সে গহনার বাক্সটি খুলল না। যদি বদলে দেওয়া হয়েছে সে টের পেত, সে কী মনে করত? সে কী বলত? সে কি তাকে অপহারক ভাবত?

এবার মাদাম লোইসেল দারিদ্র্যের জীবনের ভয়াবহতা বুঝতে পারে। সে তার নিজের কাজ সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গেই করে যায়। ঐ দুঃখজনক দেনা শোধ করা প্রয়োজন। সে তা দেবে। দাসীকে তারা বিদায় করে দিল। তারা তাদের বাসা পরিবর্তন করল। নিচু ছাদের কয়েকটি কামরা তারা ভাড়া করল।

ঘরকন্নার কঠিন সব কাজ ও রান্নাঘরের বিরক্তিকর কাজকর্ম সে শিখে নিল। তার গোলাপি নখ দিয়ে সে বাসন ধোয়, তৈলাক্ত পাত্র ও ঝোল রাঁধার কড়াই মাজে। ময়লা কাপড়-চোপড়, শেমিজ, বাসন মোছার গামছা সে পরিষ্কার করে দড়িতে শুকাতে দেয়। রোজ সকালে সে আবর্জনা নিয়ে রাস্তায় ফেলে। সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে শ্বাস নেবার জন্য থেমে থেমে সে জল তোলে। সাধারণ পরিবারের মেয়ের মতো পোশাক পরে সে হাতে ঝুড়ি নিয়ে মুদি, কসাই ও ফলের দোকানে যায় এবং তার দুঃখের পয়সার একটির জন্য পর্যন্ত দর কষাকষি করে।

প্রত্যেক মাসেই সময় চেয়ে কিছু দলিল বদল করতে হয়, কাউকে কিছু শোধ দিতে হয়।

তার স্বামীও সন্ধ্যাবেলা কাজ করে। সে কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে। রাত্রে এক পাতা পাঁচ 'সাও' হিসেবে সে প্রায়ই লেখা নকল করে।

এরকম জীবন দশ বছর ধরে চলল।

দশ বছরের শেষে তারা সব কিছু মহাজনের সুদসহ প্রাপ্য নিয়ে সব ক্ষতিপূরণ করে ফেলতে পারে। তাছাড়া কিছু তাদের সঞ্চয়ও হলো।

মাদাম লোইসেলকে দেখলে এখন বয়স্কা বলে মনে হয়। সে এখন গরিব গৃহস্থঘরের শক্ত, কর্মঠ ও অমার্জিত মেয়ের মতো হয়ে গেছে। তার চুল অবিন্যস্ত, ঘাঘরা একপাশে মোচড়ানো, হাতগুলো লাল। সে চড়াগলায় কথা বলে এবং বড় বড় কলসিতে জল এনে মেঝে ধোয়। কিন্তু কখনও, তার স্বামী যখন আপিসে থাকে, জানালার ধারে বসে বিগত দিনের সেই সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও সেই 'বল' নাচে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল ও এমন অতিরিক্ত প্রশংসা পেয়েছিল, তার কথা সে ভাবে।

যদি সে গলার সেই হারখানা না হারাত তাহলে কেমন হতো? কে জানে কে বলতে পারে? কী অনন্যসাধারণ এই জীবন আর তার মধ্যে কত বৈচিত্র্য! সামান্য একটি বস্তুতে কী করে একজন ধ্বংস হয়ে যেতে আবার বাঁচতেও পারে!

এক রবিবারে সারা সপ্তাহের নানা দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করার জন্য সে যখন চামপস্-এলিসিস-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একটি শিশু নিয়ে ভ্রমণরতা একজন মেয়ে তার চোখে পড়ল। সে হলো মাদাম ফোরস্টিয়ার। সে এখনও যুবতী, সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া। দেখে মাদাম লোইসেলের মন খারাপ হয়ে গেল। সে কি ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে? হ্যাঁ, অবশ্যই বলবে। তাকে যখন সব শোধ করা হয়েছে তখন সব কিছু খুলে সে বলবে। কেন বলবে না?

সে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল : 'সুপ্রভাত, জেনি।'

তার বন্ধু তাকে চিনতে পারল না। এক সাধারণ মানুষ তাকে এমন অন্তরঙ্গভাবে সম্বোধন করায় সে অবাক হলো। সে বিব্রতভাবে বলল :

'কিন্তু মাদাম–আপনাকে তো চিনলাম না–বোধহয় আপনার ভুল হয়েছে–'

'না, আমি মাতিলদা লোইসেল।'

তার বান্ধবী বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল : 'হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! এমনভাবে কী করে তুমি বদলে গেলে–'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমার দুর্দিন যাচ্ছে–বেশ কিছু দুঃখের দিন গেছে–আর সেটা হয়েছে শুধু তোমার জন্য–'

'আমার জন্য? তা কী করে হলো?'

'সেই যে কমিশনারের 'বল' নাচের দিন তুমি আমাকে তোমার হীরার হার পরতে দিয়েছিলে, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, বেশ মনে আছে।'

'কথা হচ্ছে, সেখানা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'কী বলছ তুমি? কী করে তা আমায় তুমি ফেরত দিয়েছিলে?'

'ঠিক সেখানার মতো একটি তোমাকে আমি ফেরত দিয়েছিলাম। তার দাম দিতে দশ বছর লেগেছে। তুমি বুঝতেই পার, আমাদের মতো লোক যাদের কিছুই ছিল না, তাদের পক্ষে তা সহজ ছিল না। কিন্তু তা শেষ হয়েছে এবং সেজন্য আমি এখন ভালোভাবেই নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

মাদাম ফোরস্টিয়ার তাকে কথার মাঝপথে থামিয়ে বলল :

'তুমি বলছ যে, আমারটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তুমি একখানা হীরার হার কিনেছিলে?'

'হ্যাঁ। তা তুমি খেয়াল করনি? ঐ দুটি এক রকম ছিল।'

বলে সে গর্বের ভাবে ও সরল আনন্দে একটু হাসল। দেখে মাদাম ফোরস্টিয়ার-এর মনে খুব লাগল। সে তার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল :

'হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! আমারটি ছিল নকল। তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।'

শব্দার্থ ও টীকা

কনভেন্ট – খ্রিষ্টান নারী মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল। মিশনারিদের আবাস।

মাসিঁয়ে – সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে পুরুষদের মসিঁয়ে সম্বোধন করা হয়।

মাদাম – সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে মহিলাদের মাদাম সম্বোধন করা হয়।

ফ্রাঁ – ফরাসি মুদ্রার নাম। ২০০২ সাল পর্যন্ত এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় ফ্রান্স ইউরো ব্যবহার করে।

'বল' নাচ – বিনোদনমূলক সামাজিক নৃত্যানুষ্ঠান। ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে এই নৃত্য প্রচলিত।

ক্রুশ – খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতীক।

স্যাটিন – মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্র। Satin

প্যারী – প্যারিসের ফরাসি নাম।

প্যালেস রয়েল – রাজকীয় প্রাসাদ।

পাঠ-পরিচিতি

বিশ্ববিখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে 'নেকলেস' অন্যতম। ফরাসি ভাষায় গল্পটির নাম 'La Parure'। ১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফরাসি পত্রিকা 'La Gaulois'-এ গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। একই সালে প্রকাশিত 'নেকলেস' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের মধ্যে গল্পটি স্থান পায়। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এক সন্ধ্যায় মাদাম লোইসেলের স্বামী মঁসিয়ে কী হাতে ঘরে ফিরলেন?

ক. সুন্দর গয়নার বাক্স খ. একটি বড় খাম

গ. উজ্জ্বল রৌপ্য পাত্র ঘ. কারুকার্যপূর্ণ পর্দা

২. মাদাম লোইসেলের সর্বদা দুঃখ, কারণ, সে–

ক. নেকলেস হারিয়ে ফেলেছে
খ. কাঙ্ক্ষিত জীবন পায়নি
গ. রান্নাঘরে কাজ করে
ঘ. দামি পোশাক পরতে পারেনা

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তন্বীর সাজগোজের শখ। কিন্তু প্রসাধনী ক্রয়ের সামর্থ্য তার বাবা-মায়ের নেই। ধনীর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। স্বামী প্রায়ই গরিবের মেয়ে বলে ধিক্কার দিয়ে তন্বীকে শারীরিক নির্যাতন করত। তন্বী এক পর্যায়ে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসে। সে উপলব্ধি করে, বিত্ত-বৈভবই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়।

৩. উদ্দীপকে "নেকলেস" গল্পের যেসব ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো–

i. মানসিক দৃঢ়তা
ii. পরশ্রীকাতরতা
iii. আত্ম-সচেতনতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত ভাবের বৈপরীত্যের প্রতিফলন যে বাক্যে–

ক. যত সব সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু আছে, সেগুলির জন্যই তার জন্ম হয়েছে
খ. মুরগির পাখনা খেতে খেতে মুখে সিংহ-মানবীর হাসি নিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি চুপি বলা প্রণয়লীলার কাহিনি রোজ সকালে সে আবর্জনা নিয়ে রাস্তায় ফেলে
গ. মাদাম লোইসেলকে দেখলে এখন বয়স্কা বলে মনে হয়
ঘ. সামান্য একটি বস্তুতে কী করে একজন ধ্বংস হয়ে যেতে আবার বাঁচতেও পারে

সৃজনশীল প্রশ্ন

মেধাবী রুবিনার বাবা খুব সামান্য বেতনে চাকরি করেন। তার সহপাঠীরা সকলেই অবস্থাপন পরিবারের। সহপাঠীদের পোশাক, জীবনাচরণের সঙ্গে রুবিনার কিছুতেই খাপ খায় না। তবু তা নিয়ে সে মোটেই হীনম্মন্যতায় ভোগে না। তার ধনী সহপাঠীরাও রুবিনার বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে তার মেধাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। নিজের কঠোর পরিশ্রমে রুবিনা পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করে। আজ তিনি একজন বড় কর্মকর্তা।

ক. বন্দুক কিনতে মসিঁয়ে কত ফ্রাঁ সঞ্চয় করেছিল?
খ. মাদাম লোইসেল আমন্ত্রণ-পত্র টেবিলের উপর নিক্ষেপ করেন কেন?
গ. রুবিনার সঙ্গে মাদাম লোইসেলের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বর্ণনা কর।
ঘ. পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও জীবন পরিণতিতে দুজনের জীবন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

কবিতা

কালকেতুর ভোজন
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবি-পরিচিতি
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনুমানিক ১৫৪০-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর পিতা হৃদয় মিশ্র এবং মাতা দৈবকী। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। সম্ভবত ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুকুন্দরাম পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে আশ্রয় নেন এবং সেখানকার জমিদারপুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে জমিদার রঘুনাথ রায়ের সভাকবিরূপে তাঁরই প্রেরণায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য এ কবিকর্মের জন্য জমিদার তাঁকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। মুকুন্দরামের পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল অসাধারণ। মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত সীমার মধ্যে থেকেও তিনি এতে বাস্তব জীবনচিত্র উপস্থাপনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে সাধারণ বাঙালি জীবন, সমকালীন সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা, মানব চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা অসামান্য রূপ লাভ করেছে। গণজীবনের করুণ চিত্র বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্কনের জন্য তাঁকে দুঃখবাদী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও তাঁর কাব্য মানবজীবনরসে পূর্ণ। স্বভাবগত কবিত্বশক্তির প্রসাদে তিনি তাঁর কাব্যে নাট্যগুণ ও উপন্যাসের বর্ণনা-নৈপুণ্যের সমন্বয় ঘটান। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে।

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাল্য সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া ॥
বোঁচা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।
করিল ফুল্লরা তবে ভোজনের স্থল ॥
চরণ পাখালি বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে ॥
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিলা নূতন খাপরা ॥
মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে ॥
চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হান্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া ॥
অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে।
রন্ধন কর্যাছ ভালো আর কিছু আছে ॥
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ি ॥

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আটিয়া তাল ॥
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
হরীতকী খায়্যা কৈল মুখের শোধন ॥
নিশাকাল হইল বীর করিলা শয়নে।
নিবেদিল পশুগণ রাজার চরণে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

শব্দার্থ ও টীকা

হরিণের ছড়া	–	হরিণের ছাল।
বোঁচা নারিকেল	–	নারিকেলের মালার ওপরের অংশ কেটে তৈরি পাত্র।
পাখালি	–	প্রক্ষালন করে। ধুয়ে।
খাপরা	–	খর্পর। মাটির তৈরি একপ্রকার পাত্র।
আমানি	–	পানিযুক্ত ভাত।
হান্ডি	–	হাঁড়ি। পানি বা অন্যান্য তরল পদার্থ রাখার পাত্র।
করঞ্জা	–	টক ফল বিশেষ। করম্‌চা।
বণিতা	–	বধূ। ভার্যা।
আচমন	–	ভোজন শেষে হাত মুখ প্রক্ষালন। ধৌতকরণ।
অভয়া	–	দুর্গা। চণ্ডী। অভয়দানকারিণী দেবী।

পাঠ-পরিচিতি

“কালকেতুর ভোজন” অংশটি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত ‘কালকেতু উপাখ্যান’) হতে সংগৃহীত। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবের অভিশাপে ব্যাধরূপে মর্ত্যলোকে ধর্মকেতুর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। তার নাম হয় কালকেতু। অসীম শক্তিশালী কালকেতু সারাদিনের শিকার কর্মশেষে ঘরে ফিরলে স্ত্রী ফুল্লরা তার যে ভোজনের ব্যবস্থা করে তারই চমকপ্রদ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে এ রচনাটিতে। বৈচিত্র্যময় ও বিপুল খাবারের বিবরণের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজে বাঙালি গৃহের খাবার পরিবেশন রীতি এ কাব্যাংশে লক্ষণীয়। বর্ণনায় অতিরঞ্জন বা আতিশয্য থাকলেও খাবার গ্রহণ ও এর পূর্বাপর বর্ণনার ভঙ্গিটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মধ্যযুগে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তবতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিত্বশক্তি ও বর্ণনা নৈপুণ্যে অসামান্যতা লাভ করেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফুল্লরা কালকেতুকে জল দিয়েছিলেন কিসে?

ক. খাপরাতে
খ. হান্ডিতে
গ. নারকেলে
ঘ. বোঁচা নারকেলে

২. 'ভোজন বিটকাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. খাবারের প্রতি অনুরাগ
খ. খাবারের প্রতি বিরাগ
গ. অশোভনভাবে খাদ্য গ্রহণ
ঘ. বিচিত্র খাদ্যে আগ্রহ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

হামিদ সারাদিন ইটভাটায় প্রচুর পরিশ্রম করেন। দুপুরে তিনি বাসায় খেতে আসেন। তার মধ্যে থাকে তীব্র ক্ষুধা। আর খাবার দিতে না দিতেই তিনি গোগ্রাসে সব গিলতে থাকেন। স্ত্রী হালিমা তার এ জাতীয় আচরণ অপছন্দ করেন।

৩. উদ্দীপকের হামিদের সঙ্গে "কালকেতুর ভোজন" কবিতায় কার আচরণের সাদৃশ্য আছে?

ক. কবিকঙ্কণের
খ. কালকেতুর
গ. ফুল্লরার
ঘ. রাজার

৪. উক্ত আচরণে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. ভোজন রসিকতা
খ. বীরত্ব
গ. উৎকট স্বভাব
ঘ. সর্বগ্রাসী লোভ

সৃজনশীল প্রশ্ন

পান্নার রান্না খুবই চমৎকার। তার রান্না খাবার সুস্বাদু হয় বলে পরিবারের সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে থাকে। পান্নার স্বামী শিশির খাবার খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন। শিশিরের খাবারের চাহিদার যেন কোনো শেষ নেই। তিনি খেতে এতই পছন্দ করেন। পান্না নানা রকমের রান্নার মাধ্যমে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। তবে তার স্বামীর খাবার বাসনা যেন শেষ হতেই চায় না। কোনো খাবারেই তার অরুচি নেই।

ক. ব্যঞ্জনের জন্য ফুল্লরা কী দিয়েছিলেন?

খ. 'বনিতারে পুছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের পান্না যেন "কালকেতুর ভোজন" কবিতার ফুল্লরা' এখানে যে দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিশির "কালকেতুর ভোজন" কবিতার কালকেতুর ভোজনলিপ্সাকে ধারণ করেননি– মূল্যায়ন কর।

ঋতু বর্ণন

আলাওল

কবি-পরিচিতি

আলাওল সতেরো শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহাবাদ পরগনার (বর্তমান ফরিদপুর জেলা) জালালপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে জলপথে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময়ে তাঁর পিতা ও তিনি পর্তুগিজ জলদস্যুদের কবলে পড়েন। এই আক্রমণে তাঁর পিতা নিহত হন। তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে আরাকানে উপস্থিত হন। সেখানে প্রথমে আরাকান রাজের সেনাদলে কাজ পান তিনি; ক্রমে রাজদরবারের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন এবং রাজসভাসদভুক্ত হন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কাব্যপ্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির গুণে আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। রাজসভার শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিদের সাহচর্যে থেকে তিনি কাব্যচর্চা করেছেন। তাঁর রচনায় নাগরিক চেতনা ও রুচির ছাপ সুস্পষ্ট। সংস্কৃত, আরবি, ফারসিসহ বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন আলাওল অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। শিল্পকুশলী এই কবির অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে– কাব্য : 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল', 'হপ্ত পয়কর', 'সিকান্দরনামা'; নীতিকবিতা : 'তোহ্‌ফা'; সঙ্গীতবিষয়ক কাব্য : 'রাগতালনামা'।

আলাওল ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথমে বসন্ত ঋতু নবীন পল্লব।
দুই পক্ষ আগে পাছে মধ্যে সুমাধব॥
মলয়া সমীর হৈলা কামের পদাতি।
মুকুলিত কৈল তবে বৃক্ষ বনস্পতি॥
কুসুমিত কিংশুক সঘন বন লাল।
পুষ্পিত সুরঙ্গ মল্লি লবঙ্গ গুলাল॥
ভ্রমরের ঝঙ্কার কোকিল কলরব।
শুনিতে যুবক মনে জাগে অনুভব॥
নানা পুষ্প মালা গলে বড় হরষিত।
বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দন চর্চিত॥

নিদাঘ সমএ অতি প্রচণ্ড তপন।
রৌদ্র ত্রাসে রহে ছায়া চরণে সরণ॥
চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন।
সতত দম্পতি সঙ্গে ব্যাপিত মদন॥

পাবন সময় ঘন ঘন গরজিত।
নির্ভয়ে বরিষে জল চৌদিকে পূরিত॥
ঘোর শব্দে কৈলাসে মল্লার রাগ গাএ।

দাদুরী শিখীনি রব অতি মন ভাএ ॥
কীটকুল রব পুনি ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে।
শুনিতে যুবক চিত্ত হরষিত ডরে ॥
আইল শারদ ঋতু নির্মল আকাশে।
দোলাএ চামর কেশ কুসুম বিকাশে ॥
নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক।
উপজিত যামিনী দম্পতি মনে সুখ ॥
প্রবেশে হেমন্ত ঋতু শীত অতি যায়।
পুষ্প তুল্য তাম্বুল অধিক সুখ হয় ॥
শীতের তরাসে রবি তুরিতে লুকাএ।
অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহাএ ॥
পুষ্প শয্যা ভেদ ভুলি বিচিত্র বসন।
উরে উরে এক হৈলে শীত নিবারণ ॥
কাফুর কস্তুরী চুয়া যাবক সৌরভ।
দম্পতির চিত্তেত চেতন অনুভব ॥

শব্দার্থ ও টীকা

সুমাধব	–	উত্তম বসন্তকাল; সুবন বসন্তকাল।
মলয়া সমীর	–	দখিনা স্নিগ্ধ বাতাস।
কামের	–	কামদেব-এর। প্রেমের দেবতার।
পদাতি	–	পদচারী সৈনিক। সংবাদ বাহক।
কৈল	–	করিল।
বনস্পতি	–	যে বৃক্ষে ফুল ধরে না শুধু ফল হয়। অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি বৃক্ষ।
কিংশুক	–	পলাশ ফুল বা বৃক্ষ।
সুরঙ্গ	–	সুন্দর রঙ। শোভন বর্ণ।
মল্লি	–	বেলিফুল। বেলফুল।
লবঙ্গ	–	একপ্রকার ফুল। মসলা।
গুলাল	–	আবির। ফাগ।
ঝঙ্কার	–	বীণাযন্ত্রের শব্দ। গুঞ্জন।
নিদাঘ	–	গ্রীষ্মকাল। উত্তাপ।
সরণ	–	শরণ অর্থে ব্যবহৃত। আশ্রয়।
বরিষে	–	বর্ষিত হচ্ছে। অজস্র ধারায় বৃষ্টিপাত।
পূরিত	–	পূর্ণ। ভরা। ভরপুর।

কৈলাস	–	শিবের বাসস্থান। হিমালয় পর্বতের একটি অংশ।
মল্লার	–	মালহার; সংগীতের একটি রাগ; রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হয়।
দাদুরী	–	মাদি ব্যাঙ। ভেকী।
শিখিনী	–	ময়ূরী।
অতি মন ভাএ	–	মনে অনেক ভাব জাগে।
পুনি	–	পুনরায়।
চামর	–	পাখা বিশেষ। চমরী– গরুর পুচ্ছ দিয়ে তৈরি পাখা।
খঞ্জন	–	এক জাতীয় চঞ্চল পাখি।
উপজিত	–	উপস্থিত হয়। উৎপন্ন।
তাম্বুল	–	পান। একপ্রকার পাতা যা সুপারি চুন ইত্যাদি সহযোগে খাওয়া হয়।
তরাসে	–	ভয়ে। ত্রাসে।
তুরিতে	–	দ্রুত। শীঘ্র। তাড়াতাড়ি।
কাফুর	–	কর্পূর। শুভ্র গন্ধদ্রব্য বিশেষ।
কস্তুরী	–	মৃগনাভি।
চুয়া	–	গন্ধদ্রব্য। একপ্রকার সুগন্ধি ঘন নির্যাস।
যাবক	–	আলতা।

পাঠ-পরিচিতি

আলাওলের "ঋতু বর্ণন" কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মাবতী'র ঋতু বর্ণন খণ্ড থেকে সংক্ষেপিত আকারে সংকলিত। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ অভিব্যক্ত হয় আবহাওয়া ও ষড়ঋতুর প্রভাবে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে মানুষ হয়েছে মুগ্ধ। মুগ্ধ হয়েছেন সংবেদনশীল কবিগণও। ঋতু বর্ণনা মধ্যযুগের কাব্যের এক স্বাভাবিক রীতি।

কবি আলাওল এই ঋতু বর্ণনায় প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের সাথে মানব মনের সম্পর্ক ও প্রভাব তুলে ধরেছেন। বসন্তের নবীন পত্রপুষ্প, মলয় সমীর, ভ্রমর-গুঞ্জন ও কোকিলের কুহুতান; গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তপনের রৌদ্র ত্রাস ও ছায়ার গুরুত্ব; বর্ষার মেঘ গর্জন, অবিরল বৃষ্টিজলে স্নাত প্রকৃতি, একটানা দাদুরী শিখীনি রব; শরতের নির্মল আকাশ, ফুলের চামর দোলা, খঞ্জনার নাচ; শরৎ বিদায়ে হেমন্তে পুষ্পতুল্য তাম্বুলের সুখ এবং শীতের ত্রাসে ত্বরিত সূর্য ডুবে যাওয়া, রজনীতে সুখী দম্পতির চিত্তসুখ ইত্যাদি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে কবিতাটিতে। ষড়ঋতুর বর্ণনার ভেতর দিয়ে কবি বাংলার প্রকৃতির রূপ-মাধুরী তুলে ধরেছেন। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য বাংলার নিসর্গ-রূপকে যে সমৃদ্ধ করেছে তা এ কাব্যাংশ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "ঋতু বর্ণন" কবিতায় প্রথমে কোন ঋতুর বর্ণনা আছে?

ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা

গ. শরৎ ঘ. বসন্ত

২. 'নিদাঘ সমএ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. প্রচণ্ড গরমকাল খ. আবহাওয়া ঠাণ্ডা

গ. পীড়নের সময় ঘ. বর্ষার আগমন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আসে বসন্ত ফুলবনে
জাগে বনভূমি সুন্দরী।

৩. কবিতাংশে "ঋতু বর্ণন" কবিতার বসন্ত ঋতুর কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে?

ক. সুন্দর শোভা খ. পুষ্পমাল্য

গ. মল্লার রাগ ঘ. মলয় সমীর

৪. উক্ত দিকটি নিচের কোন পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন

খ. কুসুমিত কিংসুক সঘন বন লাল

গ. পাবন সময় ঘন ঘন গরজিত

ঘ. নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক

সৃজনশীল প্রশ্ন

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।

ক. মল্লার কী?

খ. "রৌদ্র ত্রাসে রহে ছায়া চরণে সরণ" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে "ঋতু বর্ণন" কবিতার বসন্ত ঋতুর সাদৃশ্য আছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকটি "ঋতু বর্ণন" কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি'– মূল্যায়ন কর।

স্বদেশ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবি-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মার্চ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ – উভয়েরই লক্ষণ দেখা যায়। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে পরিচিত। বিচিত্র অলংকারের ব্যবহার এবং ব্যঙ্গ-কৌতুক তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই তাঁকে বিদ্রূপপ্রবণ করে তুলেছিল। তিনি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পাদনায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ রামচন্দ্র গুপ্ত সংগৃহীত ‘কবিতার সংকলন’, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কাব্যসংগ্রহ’ এবং কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ‘সংগ্রহ’।

তিনি ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

জান না কি জীব তুমি, জননী জন্মভূমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমিতে করিয়ে বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কতকাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্রপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ॥

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

জীব – প্রাণী। এ কবিতায় ভারতবাসীকে বোঝানো হয়েছে।
পুরাও – পূর্ণ কর।
বিভাবরী – রাত্রি।
হরিয়াছ – হরণ করিয়াছ। 'এখানে যাপন করেছ' অর্থে ব্যবহৃত।
জঠর – পেট। উদর।
পরিহরি – পরিহার করে।
বলিতেছ – বল লাভ করছ।
চালিতেছ – চালাচ্ছ।
বলী – বলবান।
হেম – স্বর্ণ
সুধাকর – চাঁদ।
সুধা – জ্যোৎস্না। অমৃত।
অধিবাস – বাসস্থান।

পাঠ-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "স্বদেশ" কবিতাটি সংক্ষেপিত আকারে সংকলিত হয়েছে 'কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থ থেকে। এটি একটি স্বদেশপ্রেমের কবিতা। কবি স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করে সন্তানতুল্য দেশবাসীকে তার প্রতি যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মাতৃভূমির শক্তিতে বলীয়ান স্বদেশবাসীকে তিনি ভক্তিভাব নিয়ে স্বদেশের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির স্বাজাত্যবোধ এ কবিতায় এমনই প্রখর যে, তিনি বিদেশের মূল্যবান-কিছু ত্যাগ করেও স্বদেশের তুচ্ছ-কিছুকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। কবির কাছে, স্বদেশের শুভ বা কল্যাণ মণি মুক্তার চেয়ে দামি। নিজ দেশের প্রতি মমত্ব ও প্রেম সে-ই যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে বিদেশে থাকে। দেশবাসীর পক্ষে সত্য ধর্মপথে চলে মাতৃভাষা চর্চা, জ্ঞান অন্বেষণ ও বিদ্যা বিতরণের মাধ্যমেই স্বদেশমাতার আশা পূর্ণ করা সম্ভব।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হেম শব্দের অর্থ–

ক. সুধাকর
খ. রত্ন
গ. মুক্তা
ঘ. স্বর্ণ

২. "থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মাতৃভূমির প্রতি অবজ্ঞা
খ. মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা
গ. জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ
ঘ. জন্মভূমির প্রতি ঋণ স্বীকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার আমার দেশ
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ
... ...
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন আমার দেশ

৩. কবিতাংশের সঙ্গে "স্বদেশ" কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. দুঃখবোধ
খ. হীনম্মন্যতা
গ. দেশপ্রেম
ঘ. জিজ্ঞাসা

৪. উক্ত দিকটি নিচের কোন পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. স্বদেশের সকল ব্যাপার
খ.ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ
গ. স্বদেশের শুভ সমাচার
ঘ. স্বদেশের প্রিয় প্রেম

সৃজনশীল প্রশ্ন

মায়ের দেয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে আমার
তার বেশি আর সাধ্য নাই।

ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকাটির নাম কী?
খ. "তার চেয়ে রত্ন নাই আর" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. কবিতাংশটি যে দিক থেকে "স্বদেশ" কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'কবিতাংশটি "স্বদেশ" কবিতার সমগ্র দিক উন্মোচন করেনি'– মূল্যায়ন কর।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। মায়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। মধুসূদন ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। সেখানে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি পিতৃপ্রদত্ত নামের শুরুতে 'মাইকেল' শব্দ যোগ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হতে হয়। সেখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। মধুসূদন বহু ভাষায় দক্ষ ছিলেন । ইংরেজি ও সংস্কৃতসহ ফরাসি, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। কিন্তু বিদেশি ভাষার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মাতৃভাষার কাছে ফিরে আসেন। মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার ছন্দ ছিল পয়ার। একটি চরণের শেষে আর একটি চরণের মিল ছিল ওই ছন্দের অনড় প্রথা। মধুসূদন বাংলা কবিতার এ প্রথাকে ভেঙে দিলেন। তাঁর প্রবর্তিত ছন্দকে বলা হয় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'। তবে এটি বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই নবরূপায়ণ। বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটেরও প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি। আধুনিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' এবং প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ-কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি' ।

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন।

"এতক্ষণে"– অরিন্দম কহিলা বিষাদে-
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

উত্তরিলা বিভীষণ, “বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?” উত্তরিলা কাতরে রাবণি;–
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে

বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,– ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?”
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
“নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?”
রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,–“ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি; – কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,–এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”

[*নির্বাচিত অংশ*]

শব্দার্থ ও টীকা

বিভীষণ	–	রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর। রাম-রাবণের যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগকারী। রামের ভক্ত।
'এতক্ষণে'–অরিন্দম কহিলা	–	রুদ্ধদ্বার নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের অনুপ্রবেশের অন্যতম কারণ যে পথপ্রদর্শক বিভীষণ, তা অনুধাবন করে বিস্মিত ও বিপন্ন মেঘনাদের প্রতিক্রিয়া।
অরিন্দম	–	অরি বা শত্রুকে দমন করে যে। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
পশিল	–	প্রবেশ করল।
রক্ষঃপুরে	–	রাক্ষসদের পুরীতে বা নগরে। এখানে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে।
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ	–	রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, রাবণ।
তাত	–	পিতা। এখানে পিতৃব্য বা চাচা অর্থে।
নিকষা	–	রাবণের মা।
শূলীশম্ভুনিভ	–	শূলপাণি মহাদেবের মতো।
কুম্ভকর্ণ	–	রাবণের মধ্যম সহোদর।
বাসববিজয়ী	–	দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে যে। এখানে মেঘনাদ। একই কারণে মেঘনাদের অপর নাম ইন্দ্রজিৎ।
তস্কর	–	চোর।
গঞ্জি	–	তিরস্কার করি।
রামানুজ	–	রাম+অনুজ = রামানুজ। এখানে রামের অনুজ লক্ষ্মণকে বোঝানো হয়েছে।
শমন-ভবনে	–	যমালয়ে।
ভঞ্জিব আহবে	–	যুদ্ধদ্বারা বিনষ্ট করব।
আহবে	–	যুদ্ধে।
ধীমান্	–	ধীসম্পন্ন। জ্ঞানী।
রাঘব	–	রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এখানে রামচন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে।
রাঘবদাস	–	রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ।
রাবণি	–	রাবণের পুত্র। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে	–	বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।
বিধু	–	চাঁদ।
স্থাণু	–	নিশ্চল।

রক্ষোরথী — রক্ষকুলের বীর।

রথী — রথচালক। রথচালনার মাধ্যমে যুদ্ধ করে যে।

শৈবালদলের ধাম — পুকুর। বদ্ধ জলাশয়।

শৈবাল — শেওলা।

মৃগেন্দ্র কেশরী — কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ।

মৃগেন্দ্র — পশুরাজ সিংহ।

কেশরী — কেশরযুক্ত প্রাণী। সিংহ।

মহারথী — মহাবীর। শ্রেষ্ঠ বীর।

মহারথীপ্রথা — শ্রেষ্ঠ বীরদের আচরণ-প্রথা।

সৌমিত্রি — লক্ষ্মণ। সুমিত্রার গর্ভজাত সন্তান বলে লক্ষ্মণের অপর নাম সৌমিত্রি।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার — লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞস্থান। এখানে যজ্ঞ করে মেঘনাদ যুদ্ধে যেত। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে নিরস্ত্র মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নিদেবের পূজারত অবস্থায় লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়।

প্রগলভে — নির্ভীক চিত্তে।

দম্ভী — দম্ভ করে যে। দাম্ভিক।

নন্দন কানন — স্বর্গের উদ্যান।

মহামন্ত্র-বলে যথা
নম্রশিরঃ ফণী — মন্ত্রপূত সাপ যেমন মাথা নত করে।

লক্ষি — লক্ষ করে।

ভর্ৎস — ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করছ।

মজাইলা — বিপদগ্রস্ত করলে।

বসুধা — পৃথিবী।

তেঁই — তজ্জন্য । সেহেতু।

রুষিলা — রাগান্বিত হলো।

বাসবত্রাস — বাসবের ভয়ের কারণ যে মেঘনাদ।

মন্দ্র — শব্দ। ধ্বনি।

জীমূতেন্দ্র — মেঘের ডাক বা আওয়াজ।

বলী — বলবান। বীর।

জলাঞ্জলি — সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।

শাস্ত্রে বলে, ...পর

পরঃ সদা!	–	শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়, কেননা গুণবান হলেও পর সর্বদা পরই থেকে যায়।
নীচ	–	হীন। নিকৃষ্ট। ইতর।
দুর্মতি	–	অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।

পাঠ-পরিচিতি

"বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'-র 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে। সর্বমোট নয়টি সর্গে বিন্যস্ত 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে অসমসাহসী বীর মেঘনাদের। রামচন্দ্র কর্তৃক দ্বীপরাজ্য স্বর্ণলঙ্কা আক্রান্ত হলে রাজা রাবণ শত্রুর উপর্যুপরি দৈব-কৌশলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বরণ করে নেন। যুদ্ধজয় নিশ্চিত করার জন্য মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে মনস্থির করে। মায়া দেবীর আনুকূল্যে এবং রাবণের অনুজ বিভীষণের সহায়তায়, লক্ষ্মণ শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশে সমর্থ হয়। কপট লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনা করলে মেঘনাদ বিস্ময় প্রকাশ করে। শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের অনুপ্রবেশ যে মায়াবলে সম্পন্ন হয়েছে, বুঝতে বিলম্ব ঘটে না তার। ইতোমধ্যে লক্ষ্মণ তলোয়ার কোষমুক্ত করলে মেঘনাদ যুদ্ধসাজ গ্রহণের জন্য সময় প্রার্থনা করে লক্ষ্মণের কাছে। কিন্তু লক্ষ্মণ তাকে সময় না দিয়ে আক্রমণ করে। এ সময়ই অকস্মাৎ যজ্ঞাগারের প্রবেশদ্বারের দিকে চোখ পড়ে মেঘনাদের; দেখতে পায় বীরযোদ্ধা পিতৃব্য বিভীষণকে। মুহূর্তে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায় তার কাছে। খুল্লতাত বিভীষণকে প্রত্যক্ষ করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সেই নাটকীয় ভাষ্যই "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" অংশে সংকলিত হয়েছে। এ অংশে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে ঘৃণা। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির গুরুত্বের কথা যেমন এখানে ব্যক্ত হয়েছে তেমনি এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকে অভিহিত করা হয়েছে নীচতা ও বর্বরতা বলে।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাল্মীকি-রামায়ণকে নবমূল্য দান করেছেন এ কাব্যে। মানবকেন্দ্রিকতাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সারকথা। ওই নবজাগরণের প্রেরণাতেই রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ মধুসূদনের লেখনীতে হীনরূপে এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদ যাবতীয় মানবীয় গুণের ধারকরূপে উপস্থাপিত। দেবতাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাম-লক্ষ্মণ নয়, পুরাণের রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদের প্রতিই মধুসূদনের মমতা ও শ্রদ্ধা।

"বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পঙ্ক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির চরণান্তের মিলহীনতার কারণে এ ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সমধিক পরিচিত। এ কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্ক্তি ১৪ মাত্রায় এবং ৮ + ৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত। লক্ষ করার বিষয় যে, এখানে দুই পঙ্ক্তির চরণান্তিক মিলই কেবল পরিহার করা হয়নি, যতিপাত বা বিরামচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারও হয়েছে বিষয় বা বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে। এ কারণে ভাবপ্রকাশের প্রবহমানতাও কাব্যাংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শমন-ভবন কী?

ক. দেবালয় খ. যমালয়

গ. যজ্ঞাগার ঘ. বাসবালয়

২. 'হায় তাত উচিত কি তব এ কাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. কুম্ভকর্ণের সহায়তা খ. লক্ষ্মণের প্রবেশ

গ. বিভীষণের সহায়তা ঘ. রামচন্দ্রের আজ্ঞা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মতিউল একটি সফল অপারেশনের পর তারাপুর গ্রামে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের রাজাকার ইদ্রিস তথ্যটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দিল। হানাদার বাহিনী এসে কমান্ডার মতিউলকে মেরে ফেলে। মতিউল প্রতিরোধের সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না।

৩. উদ্দীপকের ইদ্রিস চরিত্রটি "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে?

ক. কুম্ভকর্ণের খ. বিভীষণের

গ. লক্ষ্মণের ঘ. রামের

৪. উক্ত চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ চরণগুলো হলো–

i. নিজ গৃহপথ, তাত দেখাও তস্করে?

ii. রাঘব দাস আমি; কী প্রকারে/তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব।

iii. গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শপথ নিয়েও পলাশির প্রান্তরে প্রধান সেনাপতি মির জাফর যুদ্ধে অংশ নেননি। রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ যুদ্ধে অসহযোগিতা করেছেন। মোহনলাল ও মিরমর্দান বিশ্বাসঘাতক হননি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয়েছেন। মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

ক. কাকে রাবণি বলা হয়েছে?

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতার সঙ্গে যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি "বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ" কবিতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র– মূল্যায়ন কর।

সুখ
কায়কোবাদ

কবি-পরিচিতি

১৮৫৭ সালে ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে কবি কায়কোবাদের জন্ম। তাঁর প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। 'কায়কোবাদ' কবির সাহিত্যিক নাম। প্রথমে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হলেও পিতার অকালমৃত্যুতে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। পরে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এবং আগলা গ্রামেরই পোস্টমাস্টার পদে চাকরি গ্রহণ করেন।

বাংলা কাব্যধারায় কায়কোবাদ গীতিকবি হিসেবেই খ্যাত। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি 'বিরহবিলাপ' কাব্য রচনা করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতনের কাহিনি নিয়ে তাঁর রচিত 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো : 'কুসুমকানন', 'শিবমন্দির', 'আমিয় ধারা', 'মহরম শরীফ' ও 'শ্মশান-ভস্ম'। কবি কায়কোবাদ ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক 'কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৫১ সালের ২১এ জুলাই তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

"সুখ সুখ" বলে তুমি, কেন কর হা-হুতাশ,
সুখ ত পাবে না কোথা, বৃথা সে সুখের আশ!
পথিক মরুভূ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায় জল,
জল ত মিলে না সেথা, মরীচিকা করে ছল!
তেমতি এ বিশ্ব মাঝে, সুখ ত পাবে না তুমি,
মরীচিকা প্রায় সুখ, – এ বিশ্ব যে মরুভূমি!
ধন রত্ন সুখৈশ্বর্য কিছুতেই সুখ নাই,
সুখ পর-উপকারে, তারি মাঝে খোঁজ ভাই!
'আমিত্ব'কে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবধি!
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু– ঘুচালে পরের ব্যথা!
আপনাকে বিলাইয়া দীনদুঃখীদের মাঝে,
বিদূরিলে পর দুঃখ সকালে বিকালে সাঁঝে!
তবেই পাইবে সুখ আত্মার ভিতরে তুমি,
যা রুপিবে– তাই পাবে, সংসার যে কর্মভূমি!

শব্দার্থ ও টীকা

মরুভূ – মরুভূমি।

জল তো মিলে না... করে ছল – জল, উদ্ভিদ ও জীবশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ স্থান হচ্ছে মরুভূমি। সেই মরুভূমির মাঝে পানীয় জল খুঁজে পাওয়া ভার। কখনো কখনো উত্তপ্ত বিস্তীর্ণ বালুরাশিকে সমুদ্র বলে ভ্রম হয়। এই ভ্রান্তিই হলো মরীচিকা, ছলনা বা মোহ। অর্থাৎ ধন-রত্ন অর্থ-সম্পদ প্রকৃত সুখের নিয়ামক নয়। সুখ খুঁজতে গিয়ে এসব উপকরণের পেছনে ছোটা – মরীচিকার পেছনে ছোটার মতোই।

এ বিশ্ব যে মরুভূমি – অর্থ-বিত্ত, ধন-সম্পদের অধিকারী মানুষ প্রকৃত সুখী নয়। প্রকৃত সুখ হলো আত্ম-সুখ। ধন-সম্পদ বাহ্য-সুখ। বাহ্য-সুখের অধিকারী মানুষের হৃদয়ে মরুভূমি।

'আমিত্ব'কে বলি দিয়া – অহমিকা বিসর্জন দিয়ে।

বিদূরিলে পর দুঃখ ... বিকালে সাঁঝে – সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সারা জীবন সবার দুঃখ ঘোচালে।

তবে পাইবে সুখ আত্মার ভিতরে – সবার দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা দূর করতে পারলে বা করার প্রচেষ্টায় যে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায় কবি সেকথাই এখানে বলেছেন।

যা রুপিবে – তাই পাবে – যা বপন করবে তার ফল পাবে, অর্থাৎ ভালো কাজের জন্য ভালো ফল পাওয়া যায়।

পাঠ-পরিচিতি

কায়কোবাদ রচনাবলির অন্তর্গত 'অমিয়-ধারা' কাব্যগ্রন্থ থেকে "সুখ" কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৩ সালে 'অমিয়-ধারা' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

মরুভূমিতে পানীয় জল খোঁজার মতোই মানুষ সুখের অন্বেষণে মশগুল। ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ইত্যাকার সম্পদের অধিকারী হয়ে মানুষ সুখী হতে চায়। কিন্তু কবি বলেছেন, বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েও প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। প্রকৃত সুখী হতে হলে সবাইকে তার ভেতরকার 'আমিত্ব'কে বিসর্জন দিয়ে নিরহঙ্কারী হতে হবে। বিসর্জন দিতে হবে আপন স্বার্থপর সুখান্বেষা। নিজের সকল কর্ম নিয়োজিত করতে হবে পরহিতে। দীনদুঃখীর ব্যথা দূর করার মধ্যেই খুঁজতে হবে আত্মসুখ। অপরের উপকারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। অপরের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করতে পারার মধ্যেই প্রকৃত অর্থে মানুষের আত্মিক সুখ ও শান্তি নিহিত বলে কবি মনে করেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে ছল করে?

ক. সংসার
খ. কর্মভূমি
গ. মরুভূমি
ঘ. মরীচিকা

২. 'আমিত্ব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. ব্যক্তিগত স্বার্থ
খ. সামষ্টিক সম্প্রীতি
গ. পরহিত ব্রত
ঘ. পারিবারিক স্বার্থ

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন ধার?
পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ ভার?

৩. কবিতাংশের প্রথম দুই চরণের ভাবের সঙ্গে "সুখ" কবিতার সাদৃশ্য হলো–

ক. কর্মের মধ্য দিয়ে সুখ
খ. নিজের সুখই প্রকৃত সুখ
গ. অপরের সুখে সুখী হওয়া
ঘ. পরের জন্য আত্মদানেই সুখ

৪. উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিমালা ও "সুখ" কবিতা উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে–

i. পরের কল্যাণে নিজের স্বার্থ ত্যাগ
ii. অন্যের সুখে নিজের দুঃখ ভুলে যাওয়া
iii. পরশ্রীকাতরতা পরিহার করা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i,ii
খ. i, iii
গ. ii, iii
ঘ. i,ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার চেয়ে সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ, সুখ সুখ করে কেঁদোনা আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয়ভার।

ক. কবি কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?
খ. 'বৃথা সুখের আশ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. কবিতাংশের জীবনদর্শন "সুখ" কবিতার সাথে যে দিক থেকে সাযুজ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "সুখ" কবিতায় কবি কায়কোবাদ উক্ত জীবনদর্শন বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন–মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

মানব-বন্দনা
অক্ষয়কুমার বড়াল

কবি-পরিচিতি
অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার চোরাবাগান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। কলকাতার হেয়ার স্কুলে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু সেখানে অধ্যয়ন শেষ না-করেই কর্মজীবনে চলে যান। কর্মজীবনে তিনি ব্যাংক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করতে না পারলেও নিজের চেষ্টায় তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাঁর প্রথম কবিতা "রজনীর মৃত্যু" প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের কাব্যে আবেগের আতিশয্যের চেয়ে ভাবগত সংহতি ও বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাই প্রধান। তাঁর কাব্যে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর বিশেষ প্রভাব আছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা'। এছাড়াও তাঁর কিছু অনুবাদ কবিতা ও গান রয়েছে।
অক্ষয়কুমার বড়াল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

১

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ পানে – কারে ডেকেছিল,
দেবে না মানবে?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি,
লুটি গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুৎ গর্জনে,
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত-ক্ষুধার্ত
খুঁজিছে স্বজন!

২

আরক্ত প্রভাত সূর্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল
সলিলে শিশিরে!
শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চিৎকারে
কাণ্ডে সর্পকুল,

সম্মুখে শ্বাপদ-সংঘ বদন ব্যাদানি
আছাড়ে লাঙ্গুল;
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে;–
কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব না মানব –
প্রস্তরে লগুড়ে?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তিহীন,
ক্ষুধায় অস্থির;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্বফল,
পত্রপুটে নীর?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলাল কর
সর্বাঙ্গে আদরে?
কে নব পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি সৎকার!
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপনসম্ভার!!

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি
শিকার-সন্ধান?
কে শিখাল ধনুর্বেদ, বহিত্র চালনা,
চর্ম পরিধান?
অর্ধদগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি,
করিনু ভক্ষণ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি কার হস্ত ধরি
কুর্দন নর্তন?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য মেঘে
দেব-দেবী নাম?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি অন্ন ঢালি,
দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর?
সায়াহ্নে কুটির দ্বারে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ উচ্চারি?
কার আশীর্বাদ লয়ে অগ্নি সাক্ষী করি
হইনু সংসারী?
কে দিল ঔষধি রোগে ক্ষতে প্রলেপন –
স্নেহে অনুরাগে?
কার ছন্দে – সোম গন্ধে – ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
দিল যজ্ঞ ভাগে?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর পত্তন,
প্রাসাদ নির্মাণ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ?
কে আজ পৃথিবীরাজ – জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট?
পঞ্চভূত বশীভূত প্রকৃতি উন্নীত
কার জ্ঞানে বলে?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য – জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে?

৭

প্রবীণ সমাজ পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
জুড়ি দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত-বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর!
চরণে ঝটিকাগতি– ছুটিছ উধাও

দলি নীহারিকা।
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র – হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য শিখা।
গ্রহে গ্রহে আবর্তন – গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে?
দোলে মহাকাল – কোলে অণু পরমাণু
বুঝিছ স্পর্শনে?

৮

নমি, হে সার্থক কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!
মর দেহে নহ মর, অমর অধিক
স্থৈর্য ধৈর্য তব?
লয়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে!
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু
উড়ালে পর্বতে!
গড়িলে আপন মূর্তি – দেবতালাঞ্ছন
কালের পৃষ্ঠায়!
গড়িছ ভাঙিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞান
আপন স্রষ্টায়।

৯

নমি তোমা নরদেব! কী গর্বে গৌরবে
দাঁড়িয়েছ তুমি!
সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণি, সুবর্ণ কলস,
ঝলসে কিরণে;
কলকণ্ঠ–সমুত্থিত নবীন উদ্‌গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ
চলিছে সময়;
ভ্রূভঙ্গে – ফিরিছ সঙ্গে – ক্রমব্যতিক্রম
উদয়-বিলয়।

১০

নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড – দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রি-ভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,–
আত্মার আত্মীয়।

শব্দার্থ ও টীকা

মরুৎ – বাতাস।

গরুড় – পুরাণে বর্ণিত পাখির রাজা ও বিষ্ণুর বাহন।

শ্বাপদ – (কুকুরের মতো পা আছে এমন) হিংস্র মাংসাশী পশু।

ব্যাদানি – হা করে। প্রসারিত করে।

লাঙ্গুল – পশুর লেজ। পুচ্ছ।

শ্যেন – একজাতীয় শিকারি পাখি। বাজপাখি।

লগুড় – ছোট লাঠি। গদা।

কে তাহরে উদ্ধারিল? – প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে মানুষ নিজেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে – এই হচ্ছে কথাটির তাৎপর্য।

পত্রপুট – পাতা দিয়ে তৈরি পাত্র। পাতার ঠোঙা।

শৈশবে – কবি মানবসভ্যতার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। এর প্রথম স্তর হচ্ছে শৈশব। এ সময় মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ও পরস্পরকে সহযোগিতা করতে শেখে।

ভ্রমি – ভ্রমণ করে। বিচরণ করে, বেড়িয়ে।

ধনুর্বেদ – তির নিক্ষেপ কৌশল সংক্রান্ত জ্ঞান বা বিদ্যা। প্রাচীন অস্ত্রবিদ্যা।

কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি – মানুষ যখন থেকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে তখন থেকেই সভ্যতার প্রথম ধাপে পা দিয়েছে।

কে শিখাল...করিতে প্রণাম – প্রকৃতির রহস্য ও বিস্ময়কে কেন্দ্র করে প্রথম ধর্মচেতনার উন্মেষ। এই আদি ধর্মবিশ্বাস ছিল মূলত প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা (Natural religion)।

বহিত্র	–	নৌকা। পোত। বৈঠা। দাঁড়।
কুর্দন	–	আনন্দে লাফালাফি করা।
কৈশোরে	–	মানবসভ্যতার দ্বিতীয় স্তরকে কবি কৈশোর বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় বৈদিক যুগেরও আদিকালের লক্ষণ এখানে স্পষ্ট। এই স্তবকের নিবিদ, ইন্দ্র, অগ্নি, যজ্ঞভাগ ইত্যাদি শব্দ লক্ষণীয়। এসব শব্দ বৈদিক সাহিত্যেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।
নিবিদ	–	বৈদিক মন্ত্রবিশেষ।
ইন্দ্র	–	হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দেবতাদের রাজা।
অগ্নি	–	আগুন। বৈদিক দেবতা বিশেষ।
বায়ু	–	বাতাস। অন্তরিক্ষের দেবতা।
যজ্ঞভাগ	–	যজ্ঞে যা আহুতি দেওয়া হতো তার এক-এক অংশ এক-এক দেবতার প্রাপ্য বলে বিবেচিত হয়। এটাই যজ্ঞভাগ।
যৌবনে	–	মানবসভ্যতার এ পর্যায়ে মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, সৃষ্টিক্ষমতা ও অবদানের অসাধারণত্ব লক্ষণীয়। কবি চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমাজ শাসনব্যবস্থা, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রকৌশলবিজ্ঞানের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তবে বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ প্রকৃতির ওপর সার্বিক আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।
ঋক্	–	অন্যতম বেদ গ্রন্থ। হিন্দু পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার চার মুখ থেকে চারটি বেদের সৃষ্টি। এগুলো হলো : ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব।
যজুঃ	–	যজুর্বেদ। চতুর্বেদের অন্যতম বেদ।
চরক	–	প্রাচীন ভারতবর্ষের চিকিৎসক ও ঋষি এবং চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদপ্রণেতা।
সুশ্রুত	–	চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদের রচয়িতা জনৈক প্রাচীন ঋষি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সুশ্রুত-সংহিতা'।
সংহিতা	–	যেখানে কোনো বিষয় সংকলিত বা সংহত করা হয়। যেমন : ঋগ্বেদ-সংহিতা, মনু-সংহিতা। প্রত্যেক বেদের মন্ত্রভাগ কিংবা প্রথম ও প্রধান অংশ।
পুরাণ	–	প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও কিংবদন্তিমূলক ধর্মশাস্ত্র। যেমন : বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি।
পরিখা	–	দুর্গ ইত্যাদির চার পাশের গভীর খাত। গড়খাই।
প্রণালী	–	দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে এমন সংকীর্ণ জলভাগ।
ব্যোম	–	আকাশ।
পঞ্চভূত	–	প্রাচীন ধারণা অনুসারে জগৎ সৃষ্টির পাঁচটি মূল উপাদান : ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।
ভুঞ্জিতে	–	ভোগ করতে।

হরি – নারায়ণ। বিষ্ণু। কৃষ্ণ।

মথুরা – উত্তর প্রদেশের প্রাচীন এ নগরী শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এবং হিন্দুদের তীর্থস্থান।

কোশলে – প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্যে।

জন্মিলেন হরি মথুরা কোশলে – হিন্দু পুরাণ মতে, মানবসভ্যতার মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে স্রষ্টা মানব অবতারের রূপ নিয়ে মথুরায় কৃষ্ণ হয়ে এবং কোশলে রামচন্দ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রবীণ সমাজ পদে – মানবসভ্যতার প্রৌঢ়ত্ব পর্বে মানুষ এক বিশাল মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশাল সমাজের শক্তিতে মানুষ অপরিসীম শক্তির অধিকারী হয়েছে। এই স্তবকে কবি তারই গৌরবকীর্তন করেছেন। এই স্তবকে প্রধানত পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ যেসব শক্তি অর্জন করেছে সেগুলোর উল্লেখ আছে।

বিবর্ত-বুদ্ধি – মানুষের জ্ঞানশক্তি ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ-মোহন – বিদ্যুৎকে বা তড়িৎশক্তিকে যে মুগ্ধ ও বশীভূত করেছে।

বজ্রমুষ্টিধর – বজ্রকে যে হাতের মুঠোয় ধরতে সক্ষম হয়েছে।

নীহারিকা – দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জ যা তুষারের মতো দেখায়।

চরণে ঝটিকাগতি...
দলি নীহারিকা – মানুষের চলার গতি সীমিত। কিন্তু বিজ্ঞানের শক্তিতে মানুষ মহাবিশ্বের নক্ষত্রলোকে যাওয়ার গতি অর্জন করেছে।

তেজসনেত্র – দীপ্তিময় চোখ।

উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র...
সপ্তসূর্য শিখা জ্বলন্ত – মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির সীমা খুব বেশি নয়। কিন্তু টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মানুষ সূর্যের মতো বিভিন্ন নক্ষত্রও পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

গ্রহে গ্রহে... শুনিছ শ্রবণে – মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে মহাজাগতিক ধ্বনি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

দোলে মহাকাল-কোলে
...বুঝিছ স্পর্শনে – মানুষ জগতের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে অণু-পরমাণুর নিত্যগতিশীল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পেরেছে।

নমি, হে সার্থক কাম – মানুষের ইচ্ছা কর্ম ও সৃজনের সাফল্যের জন্য কবি মানুষের বন্দনা করছেন।

মরদেহে নহ মর – মানুষ মরণশীল। কিন্তু কর্ম অবদানে মানুষ অমরত্বের মহিমা অর্জন করেছে।

সলাঙ্গুল – লেজসহ।

লয়ে সলাঙ্গুল দেহ – লেজবিশিষ্ট বানরজাতীয় প্রাণীর বিবর্তিত ও বিকশিত রূপই বর্তমান মানুষ।

রসাইলে মরু	–	জলসেচে মরুভূমির মরুময়তা ঘুচিয়ে তাকে উর্বর ও রসযুক্ত করেছে মানুষ।
গড়িলে আপন মূর্তি		
দেবতা-লাঞ্ছন	–	মানবসভ্যতার বিকাশের ফলে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও অবদানের দিক থেকে মানুষের যে বিশাল মহিমাময় মূর্তি গড়ে উঠেছে তার কাছে দেবতার মহিমা ম্লান ও খাটো হয়ে গেছে।
নরদেব	–	মানবদেবতা। সর্বমানবের শক্তি ও মহিমার এক প্রতীকীরূপ।
শষ্পভূমি	–	তৃণক্ষেত্র। কচি ঘাসে আচ্ছাদিত মাঠ।
উদগীথ	–	বেদমন্ত্র। বৈদিক স্তোত্রগান।
কলকণ্ঠ সমুথিত...গগনে পবনে	–	আকাশে বাতাসে দেবতার মহিমাজ্ঞাপক মন্ত্রের জায়গায় মানুষের মহিমা কীর্তনসূচক নতুন মন্ত্রগীতি অজস্র কণ্ঠে গীত হচ্ছে।
ক্রম-ব্যতিক্রম	–	নিয়ম ও অনিয়ম।
উদয়-বিলয়	–	সৃষ্টি ও ধ্বংস।
হৃদয়-স্পন্দন সনে		
...উদয়-বিলয়	–	পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা এত ব্যাপক ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে যে, নিয়ম ও অনিয়ম, সৃষ্টি ও ধ্বংস সবই মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।
আদ্বিজ-চণ্ডাল	–	ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত। সর্বস্তরের মানুষ।
নমি আমি...প্রভু, ক্রীতদাস	–	সর্বস্তরের সকল মানুষকে কবি বন্দনা করেছেন। এ স্তবকে কবি মানবতার মহিমাকে স্পষ্টভাবে সমুন্নত করেছেন।
কৃষি-তন্তুজীবী	–	কৃষক ও তাঁতি।
তক্ষক	–	ছুতোরের কাজ।
অদ্রি	–	পর্বত।

পাঠ-পরিচিতি

"মানব-বন্দনা" কবিতাটি সংকলিত হয়েছে অক্ষয়কুমার বড়ালের 'প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থ থেকে। "মানব-বন্দনা" কবিতায় কবি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মানুষের অবদান ও মহিমাকে তুলে ধরেছেন। কবি মানুষকেই মানুষের দেবতা বলে গণ্য করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সাক্ষ্যপ্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদীর মতবাদের আলোকে এটি রচিত। পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির রহস্যগাথা বিবৃত হয়েছে এ কবিতায়। বিবৃত হয়েছে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ যে সভ্যতা নির্মাণ করে চলেছে তারও ইতিহাস। মানুষ তার নিজ সৃষ্টিশীল প্রতিভাবলে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছে যে আপন কর্তৃত্ব ও মহিমা তারই বন্দনা করেছেন কবি এ কবিতায়। কবিতাটির ছন্দ অক্ষরবৃত্ত (পয়ার)। পর্ববিন্যাস : যুগল চরণের প্রথমটির পর্ব ৮/৬ এবং দ্বিতীয়টি ৬ মাত্রার। তবে অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে এই যুগল চরণকে ২০ মাত্রার চরণ (৮।৬।৬) হিসেবে ধরাই সংগত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'নরদেব'-এর শিরে কী?

ক. প্রভাতরশ্মি
খ. চূর্ণমেঘ
গ. সুবর্ণ কলস
ঘ. মন্দির-শ্রেণি

২. 'কে আজ পৃথিবীরাজ – জলে স্থলে ব্যোমে/ কার রাজ্য পাট'? বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মানুষের জয়
খ. দেবতার পরাজয়
গ. সভ্যতার বিবর্তন
ঘ. স্রষ্টার আধিপত্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

'আমাদের পাঠশালা' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত প্রাণ কিছু মানুষ দায়িত্ব নিয়েছেন পথ-শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করার। এঁদের হাত ধরেই অবহেলিত শিশুরা নিচ্ছে জীবনের পাঠ। এ শিশুরাই আবার শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবে সর্বত্র।

৩. অনুচ্ছেদের নিবেদিত প্রাণ মানুষেরা "মানব বন্দনা" কবিতায় কার প্রতিনিধি?

ক. দেবতার
খ. রাজার
গ. মানবের
ঘ. স্রষ্টার

৪. উক্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে "মানব বন্দনা" কবিতার যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

i. সামষ্টিক শক্তির বিকাশ
ii. ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা বিনিময়
iii. আধিপত্য বিস্তারের শিক্ষা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বরিশালের মধ্যবয়সী ইউসুফ রূপপুরে ভাতিজার বাড়িতে বেড়াতে এসে জানতে পারেন পাশেই ভবনধসে অনেক মানুষ আটকে পড়েছেন। কৌতূহলী ইউসুফ ছুটে যান সেখানে। ঘটনাস্থলে গিয়ে অসংখ্য মানুষের বাঁচার আর্তনাদ শুনে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সকলের সঙ্গে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। কিন্তু উদ্ধারকাজের এক পর্যায়ে ঘাড়ে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। ডাক্তার জানান, ইউসুফ আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির এই অবস্থায় তার পরিবার দিশেহারা। তখন অনেক ব্যক্তি, সংগঠন ইউসুফ ও তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। আজ ইউসুফ ও তার পরিবার একা নন, সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ আজ তাঁর স্বজন।

ক. 'মরুৎ গর্জন' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'আত্মার আত্মীয়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ইউসুফের কার্যক্রমে "মানব বন্দনা" কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইউসুফ চরিত্রে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের অনুভূতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে– মন্তব্যটি যাচাই কর।

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটি বৃহৎকাল বাংলা সাহিত্যের 'রবীন্দ্রযুগ' নামে পরিচিত। মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য-তৃষ্ণা রোমান্টিক এই কবির কবিতার মূল সুর। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও সংগীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক ও চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও 'বিশ্বভারতী' নামের বিশ্ববিদ্যালয়-এর তিনি স্বাপ্নিক ও প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। 'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্ব-অনূদিত 'Song Offerings' গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এশীয় হিসেবে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলা ছোটগল্পের তিনি পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কাব্যনাট্য 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' এবং কাহিনি-কবিতার সংকলন 'কথা' ও 'কাহিনি' তাঁর ভিন্ন স্বাদের রচনা।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হলো সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা–
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥
একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা–
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা॥
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা–
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,

ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে–
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ॥
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও –
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥
যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে– আর নাই, দিয়েছি ভরে ॥
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে–
এখন আমারে লহো করুণা করে ॥

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

শব্দার্থ ও টীকা

গরজে – গর্জন করে।

ভারা ভারা – 'ভারা' অর্থ ধান রাখার পাত্র। এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্ষুরধারা – ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত।

খরপরশা – ধারালো বর্শা। এখানে ধারালো বর্শার মতো।

আমি	– সাধারণ অর্থে কৃষক। প্রতীকী অর্থে শিল্পস্রষ্টা কবি।
আমি একেলা	– কৃষক কিংবা শিল্পস্রষ্টা কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা।
চারিদিকে বাঁকা জল	
করিছে খেলা	– ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান স্রোতের উদ্দামতা। নদীর 'বাঁকা' জলস্রোতে বেষ্টিত ছোট ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। 'বাঁকা জল' এখানে অনন্ত কালস্রোতের প্রতীক।
তরুছায়ামসী-মাখা	– ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো।
গান গেয়ে তরী বেয়ে কে	
আসে পারে	– ক্ষুরের মতো ধারালো জলস্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পারের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক।
কোনো দিকে নাহি চায়	– মহাকালের প্রতীক এই মাঝি নিরাসক্ত বলেই তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই।
দেখে যেন মনে হয়	
চিনি উহারে	– এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পস্রষ্টা কবির সংশয় থেকেই যায়।
ওগো, তুমি কোথা যাও	
কোন বিদেশে?	– নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। 'বিদেশ' এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
বারেক ভিড়াও তরী	
কূলেতে এসে	– চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাঁই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত।
আমার সোনার ধান	– কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পস্রষ্টা কবির সৃষ্টিসম্ভার।
আর আছে	
আর নাই, দিয়েছি ভরে	– ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালের স্রোতে ভেসে আসা সোনার তরী-রূপী চিরায়ত শিল্পলোকে।
থরে বিথরে	– স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে।
এখন আমারে লহো	
করুণা করে	– ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির স্রষ্টা স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই

ছোট সে তরী – সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি – নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ... সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।"

পাঠ-পরিচিতি

"সোনার তরী" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সঙ্গে, কবিতাটি গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে "সোনার তরী" তেমনি আশ্চর্যসুন্দর এক চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা।

কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চারদিকের 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে সকাতরে মিনতি জানালে ওই সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকের। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে।

এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।

"সোনার তরী" মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি ৮+৫ মাত্রার পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে'– এখানে 'তুমি' কে?

ক. কৃষক খ. তরী

গ. মাঝি ঘ. কবি

২. কবি 'ছোটো খেত' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?

ক. আয়তনে ছোট ক্ষেত খ. নদীর ছোটো চর

গ. মানুষের জীবনপরিধি ঘ. অজানার দেশ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

জয়নুল আবেদিন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি শিল্পাচার্য নামে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা, সংগ্রাম, সাঁওতাল রমণী, ঝড় এবং আরও অনেক ছবি। পৃথিবীর মানুষ এই শিল্পীর পেন্সিলের আঁচড়ে প্রতিফলিত দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষও সেই সময়কে আজও অনুভব করে। বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব।

৩. জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে "সোনার তরী" কবিতার কিসের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. মাঝি　　খ. ভরা নদী

গ. তরী　　ঘ. কৃষক

৪. উক্ত সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়–

ক. জীবন অতি সংক্ষিপ্ত

খ. সৃষ্টি অবিনশ্বর

গ. সম্পদ ক্ষণস্থায়ী

ঘ. সময় অনন্ত প্রবাহী

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাদার তেরেসা অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের আধার ছিলেন। আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত হয়েও তিনি তাঁর কাজের জন্য সারা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতায় মিশনারিজ অব চ্যারিটি নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই চ্যারিটি হোম সমগ্র পৃথিবীর দরিদ্র, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের জন্য কাজ করে। এই কাজের জন্য ১৯৭৯ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেই পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তিনি সেবার কাজে ব্যয় করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আজও তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

ক. বাংলা কত তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন?

খ. 'বাঁকা জল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. "সোনার তরী" কবিতার কোন বিষয়টি মাদার তেরেসার জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মাদার তেরেসার জীবন পরিণতিই "সোনার তরী" কবিতার মূল উপজীব্য'– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

ঐকতান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি : “সোনার তরী” কবিতা অংশে দ্রষ্টব্য

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী–
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে –
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।
আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক –
রয়ে গেছে ফাঁক।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ–
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল–
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার –
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায় –
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

[*সংক্ষেপিত*]

শব্দার্থ ও টীকা

বিপুলা – বিশাল প্রশস্ত। এখানে নারীবাচক শব্দ হিসেবে বিপুলা বলে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।

'বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র
তারি এক কোণ।' – জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। কিন্তু কবির মন জুড়ে রয়েছে তারই ছোট একটি কোণ।

'যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।' – কবি তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে আনেন।

'জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি
ভিক্ষালব্ধ ধনে।' – নানা সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে কবি নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

স্বরসাধনা – এখানে সুর বা সংগীত সাধনা বোঝানো হয়েছে।

‘এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক রয়ে গেছে ফাঁক।’	– কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে কবি যে স্বরসাধনা করেছেন তাতে ঘাটতি রয়ে গেছে।
ঐকতান	– বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট সুর, সমস্বর। এখানে বহু সুরের সমন্বয়ে এক সুরে বাঁধা পৃথিবীর সুরকে বোঝানো হয়েছে। সকল মানুষের কথা বলা সাহিত্য-সুরকে তিনি সাহিত্যের ঐক্যতান বলেছেন।
‘অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।’	– সম্মানবঞ্চিত ব্রাত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চ মঞ্চে কবি আসন গ্রহণ করেছেন। তাই সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেননি।
‘মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।’	– মাঝেমধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়েছেন। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগসূত্র রচনা সম্ভব হয়নি।
‘জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।’	– জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ ঘটাতে না পারলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃত্রিম পণ্যে পরিণত হয়। ব্রাত্য তথা প্রান্তিক মানুষকে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে যোগ্য স্থান দিলেই তবে শিল্প সাধনা পূর্ণতা পায়।
‘এসো কবি অখ্যাতজনের নির্বাক মনের’	– রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করছেন, যিনি অখ্যাত মানুষের, অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন।
রস	– এখানে সাহিত্যরস বা শিল্পরস বোঝানো হয়েছে। কবিরা রসসৃষ্টির জন্য কবিতা রচনা করেন। সেই রস সৃষ্টি হয় পাঠকের অন্তরে।
‘অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।’	– জেলে-তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ সাহিত্যের বিষয়সভায় উপেক্ষার কারণে স্থানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় সাহিত্যের ভুবন আনন্দহীন উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির সেই উষরতাকে রসে পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতের কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান।
উদ্‌বারি	– ওপরে বা ঊর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও। অন্তরে যে উৎস (এখানে রসের উৎস) রয়েছে, তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।
সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়	– সাহিত্যে জীবনের সর্বপ্রান্তস্পর্শী সমস্বর বা ঐকতান।

'একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়'	–	অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত মানুষও যেন সম্মান লাভ করে সে-কথা বলা হয়েছে।
'মূক যারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'	–	দুঃখ-সুখ সহ্য করা নির্বাক মানুষ, যারা এগিয়ে চলা পৃথিবীতে এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

পাঠ-পরিচিতি

"ঐকতান" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা। কবির মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবিতাটি 'ঐকতান'-নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। "ঐকতান" অশীতিপর স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্ম-সমালোচনা ; কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।

দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমণের শেষপ্রান্তে পৌঁছে স্থিতপ্রজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ পেছন ফিরে তাকিয়ে সমগ্র জীবনের সাহিত্যসাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজেছেন "ঐকতান" কবিতায়। তিনি অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন এখানে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ। কবি বুঝতে পেরেছেন, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা রয়ে গিয়েছে। বিশ্বের বিশাল আয়োজনে তাঁর মন জুড়ে ছিল কেবল ছোট একটি কোণ। জ্ঞানের দীনতার কারণেই নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন গ্রন্থের চিত্রময় বর্ণনার বাণী কবি ভিক্ষালব্ধ ধনের মতো সযত্নে আহরণ করে নিজের কাব্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। তবু বিপুলা এ পৃথিবীর সর্বত্র তিনি প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি। চাষি ক্ষেতে হাল চষে, তাঁতি তাঁত বোনে, জেলে জাল ফেলে– এসব শ্রমজীবী মানুষের ওপর ভর করেই জীবনসংসার এগিয়ে চলে। কিন্তু কবি এসব হতদরিদ্র অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে যে জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিল খণ্ডিত তথা অপূর্ণ। ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর মানব-জীবনধারার ঐকতান সৃষ্টি না করতে পারলে শিল্পীর গানের পসরা তথা সৃষ্টিসম্ভার যে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, কবিতায় এই আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেছেন, তাঁর কবিতা বিচিত্র পথে অগ্রসর হলেও জীবনের সকল স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে, জীবন-সায়াহ্নে কবি অনাগত ভবিষ্যতের সেই মৃত্তিকা-সংলগ্ন মহৎ কবিরই আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন, যিনি শ্রমজীবী মানুষের অংশীদার হয়ে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আত্মীয়তার বন্ধন। "ঐকতান" কবিতায় যুগপৎ কবির নিজের এবং তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতার বিষয়গত সীমাবদ্ধতার দিক উন্মোচিত হয়েছে।

কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটিতে ৮+৬ এবং ৮+১০ মাত্রার পর্বই অধিক। তবে এতে কখনো-কখনো ৯ মাত্রার অসমপর্ব এবং ৩ ও ৪ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি কী কুড়িয়ে আনেন?

ক. চিত্রময়ী বাণী খ. ভিক্ষালব্ধ ধন

গ. আনন্দের ভোগ ঘ. গানের পসরা

২. সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে– এখানে 'সংকীর্ণ বাতায়ন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. ছোট জানালা খ. ক্ষুদ্র গণ্ডী

গ. জনবিচ্ছিন্নতা ঘ. কোলাহলপূর্ণতা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুকান্ত ভট্টাচার্য শ্রমজীবী মানুষের কবি। তিনি কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও অধিকারের কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে তিনি তাদের শক্তি জুগিয়েছেন। তাঁর ওপর আঘাত এসেছে কিন্তু তিনি আপন পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

৩. সুকান্তের মধ্যে "ঐকতান" কবিতার কোন দিকটি বিদ্যমান?

ক. জন-সম্পৃক্ততা
খ. নিরহঙ্কারী
গ. মহত্ত্ব
ঘ. জনপ্রিয়তা

৪. "ঐকতান" কবিতায় কবি সুকান্তের মতোই এমন আরও কবির আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন। কারণ এই কবিরা—

i. জনগণের মর্মের ব্যথা বোঝে
ii. কাজে ও কথায় তারা এক
iii. এরা সাধারণের জীবনঘনিষ্ঠ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i, ii
খ. i, iii
গ. ii, iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে রফিকুল বারি রাজনীতিতে মনোযোগী হতে চান। সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন তার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন এবং সভা-সমিতিতে যোগ দেন। একজন সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে শহরের একটি বিশেষ শ্রেণির সবাই তাঁকে চেনে। একবার ঈদে গ্রামের বাড়ি গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, দেশের মানুষের কথা ভাবলেও গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর নতুন উপলব্ধি হয় যে, দেশের সাধারণ মানুষের উন্নয়নকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরপর থেকে তিনি গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশতে শুরু করেন, তাদের জন্য কাজ করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি সাধারণের প্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন।

ক. কাছে থেকে দূরে যারা, কবি তাদের কী শুনাতে চেয়েছেন?

খ. কবি সর্বত্র প্রবেশের দ্বার পান না কেন?

গ. রফিকুল বারির মধ্যে "ঐকতান" কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "জীবনে জীবন যোগ করা/না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা"— কবির এই উপলব্ধির আলোকে রফিকুল বারির নেতা হয়ে ওঠার বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

নবান্ন
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবি-পরিচিতি
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬এ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথ পেশায় ছিলেন একজন প্রকৌশলী। দুঃখকেই জীবনের চূড়ান্ত সত্য বলে জেনেছিলেন তিনি। মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাতকে তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন। কল্পনাবিলাস কিংবা ভাবালুতায় ছিল তাঁর চরম অবিশ্বাস। নতুন ধরনের কবিতা রচনা করে রবীন্দ্রনাথের অনুসারী কবিদের নতুন দৃষ্টি দিয়ে চারপাশের জগৎকে দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই নবীন দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালের অনেক কবিকেই প্রভাবিত করেছিল। বিষয় ও গঠনের দিক থেকে তিনি কবিতাকে ঢেলে সাজাতে আগ্রহী ছিলেন। একেবারেই দৈনন্দিন জীবনের নানাকিছু যে শিল্পের সীমা লঙ্ঘন না করেও অনায়াসে কাব্য-বিষয় হতে পারে তার পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে গদ্যসুলভ শব্দ ও উপমার অভিনবত্ব। তাঁর কবিতার বক্তব্য যেমন সমকালীন সাহিত্যিকদের চমক লাগিয়েছিল তেমনি তাঁর বলার ভঙ্গি পাঠককে করেছিল মুগ্ধ। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা' প্রভৃতি। শেষ বয়সে তিনি 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো', 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্যের অনুবাদ করেছিলেন।
তিনি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

এসেছ বন্ধু? তোমার কথাই জাগছিল ভাই প্রাণে,–
কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রানে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।
লেপিয়া আঙিনা দ্যায় আল্‌পনা ভরা মরাইএর পাশে;
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যাজি' এবার নিবসে চাষে।
এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পড়ে মই!
দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে বসো,– সে দুখের কথা কই;
বোশেখ, জ্যষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন,–
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল কোরে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা।
কার্তিকে দেখি চারিদিকে,– একি! এবার ত নহে ফাঁকি!
পাঁচরঙা ধানে ছক্-কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।
অঘ্রানে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি– ফসলটা নাবি, আরও ক'টা দিন যাক্,
ভরা অঘ্রানে ঘটেনা– ত কোনো দৈব দুর্বিপাক।
মরাই-সারাই শেষ কোরে, সবে খামারে দিইছি হাত,
কাল্‌কে হঠাৎ,–
বন্ধু, দোহাই, তুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্‌ভ,–
ক্ষমা করো সখা,– বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

শব্দার্থ ও টীকা

নবান্ন — ফসল কাটার উৎসব। গ্রাম-বাংলায় প্রতিবছর হেমন্তকালে ঘরে ফসল তোলার উপলক্ষে নাচ-গানসহ নতুন ধানে তৈরি নানারকম খাবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হয় নবান্ন উৎসব।

মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে — "পাকা ধানে মই দেওয়া" একটি বাংলা প্রবাদ। এর অর্থ হলো প্রায়সম্পন্ন কোনো কাজ পণ্ড করা। অন্যের ক্ষতি করা। জমিতে মই দেওয়া হয় বীজ বোনা কিংবা চারা লাগানোর আগে; মাটিকে নরম ঝুরঝুরে করার জন্য। কিন্তু যে জমি ফসলে পূর্ণ, যখন ফসল কাটার সময় আসন্ন তখন মই দিলে তো সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষতি বোঝাতে ব্যবহৃত এই প্রবাদটিকে কবি কৌশলে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

আল্‌পনা — গ্রামে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বাড়ির আঙিনায় হাতে আঁকা নকশা। ঐতিহ্যগতভাবে আতপ চাল বেটে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল এবং নানারকম রং মিশিয়ে আল্‌পনার উপকরণ প্রস্তুত করা হয়। ইদানীং সিনথেটিক রং দিয়েও আল্‌পনা আঁকা হয়।

মরাই — হোগলা, বেত ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শস্য জমা রাখার বড় আধার। ধানের গোলা।

লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যাজি এবার নিবসে চাষে — প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে– "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"। অর্থাৎ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রচুর অর্থলাভ হয় তথা ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর আগমন ঘটে। আলোচ্য কবিতায় কবি প্রবাদটিকে পাল্টে দিয়েছেন। কবিতায় বর্ণিত কৃষকের মাঠে এবার এমন ফসল হয়েছে যে, কৃষকের মনে হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী এবার বাণিজ্যের পরিবর্তে ফসলের ক্ষেতে বিরাজ করছেন। আর তাই প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কৃষককে আনন্দ-স্বপ্নে বিভোর করছে।

দাওয়া — ঘরের আঙিনা।

বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা — বাংলা প্রবাদ "বালির বাঁধ"কে কবি শৈল্পিকভাবে এই কবিতায় ব্যবহার করেছেন। "বালির বাঁধ"-এর অর্থ হলো এমন কিছু যা ক্ষণভঙ্গুর। কবি ফসল বাঁচানোর লক্ষ্যে সকল দুর্যোগ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে নিজের যথাসাধ্য চেষ্টাকে কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু তার সবই বালির বাঁধের মতো শেষ পর্যন্ত বিফলে গেছে।

বুকের রক্ত জল কোরে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা — কৃষকের ফসল ফলানোর অপরিহার্য শর্ত হলো পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা। এদেশের প্রেক্ষাপটে এই সেচ ব্যবস্থাও কখনও হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বাংলার কৃষক তার ফসলের মাঠ সেচ দিয়ে সজীব রাখে। মলিন মৃতপ্রায় চারাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ শ্রম ঢালে।

পাণ্ডু	—	ফ্যাকাশে মলিন।
পাঁচরঙা ধানে ছক-কাটা মাঠ	—	গ্রাম-বাংলায় কাঁচা-পাকা ধানে ভরে থাকা সীমানা নির্দেশিত ফসলের মাঠগুলোর সৌন্দর্য এই পঙ্‌ক্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।
নাবি	—	দেরিতে হয় এমন।
দুর্বিপাক	—	বিপদ। দুর্যোগ।
মরাই-সারাই	—	গোলা মেরামত।
অপ্রগল্‌ভ	—	অচঞ্চল বিনয়ী, আচরণে শালীন।

পাঠ-পরিচিতি

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "নবান্ন" কবিতাটি তাঁর 'মরুমায়া' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। একদিকে বাংলার কৃষকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাময় বাস্তবতা এই কবিতায় শিল্প-অবয়ব লাভ করেছে; অপরদিকে, 'কৃষক' আর 'পাকা ধান'-এর প্রতীকে কবির আপন সৃষ্টির ধ্বংস হওয়ার বেদনা দ্যোতিত হয়েছে।

জনৈক বন্ধুর সঙ্গে কবি তাঁর মনের দুঃখকথা বলে চলেছেন — এমন ভঙ্গি ব্যবহার করে কবিতাটির সূচনা। কবির সেই বেদনা-কাহনে উঠে এসেছে তাঁর ক্ষেতভরা পাকা ধান কীভাবে এক রাতে ধ্বংস হয়ে গেছে সেই কথা। ফসল কাটার সময় সমাগত বিবেচনা করে কৃষক-কবির বাড়ি সেজে উঠেছিল আল্‌পনায়, গোলাঘর মেরামত করে ধান সংগ্রহের সকল আয়োজন হয়েছিল সম্পন্ন। একদিকে বাড়িতে এতসব আয়োজন আর অন্যদিকে মাঠে ফসল কাটার প্রতীক্ষা। এ যেন বাংলার কৃষক-জীবনের অকৃত্রিম রূপায়ণ। কৃষকেরা মাসের পর মাস ধরে রক্ত জল করা শ্রমে চারাগাছ থেকে তিল তিল করে বড় করে তোলে পাকা ধান। এই সময় জুড়ে বিভিন্ন প্রকৃতিসৃষ্ট ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের আশঙ্কায় দুলে ওঠে তাদের হৃদয়। তবু তারা স্বপ্ন দেখে, বিভোর হয় আসন্ন সুখময় দিনের কল্পনায়। কবিও একইভাবে ধান কাটার অপেক্ষায় দিন গুনেছেন। অগ্রহায়ণ মাসে দুর্বিপাক ঘটার শঙ্কা না থাকায় ভেবেছেন ফসলগুলো আরেকটু পরিপক্ব হলে তবে কাটবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁর পাকা ধানে মই পড়ে গেছে। কিন্তু মই দেওয়া তো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়। তবে কি কবি কারও শত্রুতার শিকার? এই প্রশ্নের উত্তর কবিতায় নেই। এর কারণ অনুসন্ধানের তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির দুঃখ শেষ হয় না। কবির এই কষ্টের কথা শোনার ধৈর্যও কারও হয় না। কবির বন্ধুর অসহিষ্ণুতা থামিয়ে দেয় কবিকে। ফসল হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার এই অমোঘ বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক অসমাপ্ত গল্পে। এভাবেই বেদনার রেশ টেনে নবান্নের আনন্দ মুছে দিয়ে সমাপ্ত হয় কবিতাটি।

কবিতাটির একটি প্রতীকী তাৎপর্যও লক্ষণীয়। 'পাকা ধান'-এর প্রতীকে, কৃষকের রূপকল্পে যতীন্দ্রনাথ আপন সৃষ্টিকে আরও নিজের করে পেতে চান। কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্ম যখন সমালোচিত হয়, সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না তখন কবি বেদনাহত হন। পাকা ধান নষ্ট হওয়া হৃতসম্বল কৃষকের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পান তিনি। এভাবে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবকে শিল্পায়িত করেছেন আলোচ্য "নবান্ন" কবিতায়।

কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্ব বিভাগ মুখ্যত ৬+৬+৬+২। অর্থাৎ, চরণের শেষে ২ মাত্রার একটি পর্ব বিদ্যমান। অবশ্য কোনো কোনো চরণে এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "নবান্ন" কবিতায় কবি কোথায় বসে তার বন্ধুকে গল্প শোনার কথা বলেছেন?
   ক. ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে
   খ. দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে
   গ. বসার ঘরের চেয়ারে বসে
   ঘ. বারান্দায় রাখা মাদুরে বসে

২. 'দৈব-দুর্বিপাক' বলতে কোন ধরনের দুর্যোগকে বোঝানো হয়েছে?
   ক. প্রাকৃতিক
   খ. দেবতাসৃষ্ট
   গ. আকস্মিক
   ঘ. মানবসৃষ্ট

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

আগামীকাল বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। করতোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই। সবাই মিলে আজ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি আলপনায় ভরে তুলতে কাজে নেমেছে। ছোট ছোট হাত, কচি মন আর নানা রংয়ের মিশ্রণে রাস্তাটি হয়ে উঠেছে আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের আধার। কিন্তু সন্ধ্যা বেলার আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি কচি মনের সব স্বপ্ন মুছে দেয়।

৩. উদ্দীপকে "নবান্ন" কবিতার যে দিকগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো–
   i. উৎসবের প্রস্তুতি
   ii. স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা
   iii. প্রতিহিংসার বহির্প্রকাশ

   নিচের কোনটি ঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত বক্তব্য পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে "নবান্ন" কবিতাটিকে কোন শ্রেণিভুক্ত করা যায়?
   ক. সংলাপধর্মী
   খ. কাহিনিধর্মী
   গ. প্রতীকধর্মী
   ঘ. রূপকাশ্রয়ী

সৃজনশীল প্রশ্ন

অকালে ঝরে গেল একটি স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'দৈনিক দর্পণ' # আগৈলঝাড়া, বরিশাল। তারিখ : ১৫/০৫/২০১৬

এক নিমেষেই চুরমার হলো ধনঞ্জয়ের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। চিকিৎসার অভাবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান মৃত্যুঞ্জয়কে অনেক বড় ডাক্তার বানানোর প্রত্যয় গ্রহণ করেন তিনি। উদ্দেশ্য, তার স্ত্রীর মতো আর কেউ যেন অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। অন্যের জমিতে কাজ করে কখনোবা এলাকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়িয়ে ছেলের পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছেন ধনঞ্জয়। গতকাল তিনি জানতে পেরেছেন যে, ছেলে তার ডাক্তারি পাস করেছে। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবার পূরণ হবে। কিন্তু স্বপ্ন তাঁর চুরমার হয়ে গেল। সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণ।

ক. "নবান্ন" কবিতায় কোথায় আলপনা আঁকার কথা বলা হয়েছে?
খ. 'মই পড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে'।– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে ধনঞ্জয়ের মধ্যে "নবান্ন" কবিতার যে দিকটির আভাস পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও "নবান্ন" কবিতার মূল বক্তব্যের পার্থক্য অনেক'– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

জীবন-বন্দনা
কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য শিল্পী। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে কবির পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাস করে সেখানেই এক বছর শিক্ষকতা করেন নজরুল। বারো বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং দলের জন্য পালাগান রচনা করেন। বস্তুত তখন থেকেই তিনি সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হওয়ার পর ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে তিনি যোগদান করেন এবং করাচিতে যান; পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হন।

১৯২০ সালের শুরুতে বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে "বিদ্রোহী" কবিতা প্রকাশিত হলে চারদিকে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি 'লাঙল', 'নবযুগ', 'ধূমকেতু'-সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যসমূহ : 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশি', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা'। এছাড়াও তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অসংখ্য সংগীতের স্রষ্টা নজরুল। দেশাত্মবোধক গান, শ্যামাসংগীত, গজল রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০) উপাধিতে ভূষিত করে। 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', 'একুশে পদক'সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন।

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হলো সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।
এলো দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
—তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী-মেরির যিশু—
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে!

খেয়াল-খুশিতে কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুন চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র–মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মরু-কবি-গাহি সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্র সুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোনো বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

শব্দার্থ ও টীকা

ফরমান – বাণী। সংবাদ। খবর।

কিণাঙ্ক – ঘর্ষণের ফলে হাত বা পায়ের শক্ত হওয়া চামড়া বা মাংস। কড়া।

শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন – পরিশ্রমে কড়া-পড়া ও দৃঢ়।

ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান – যারা পৃথিবীর হাতে ফসলের খবর তুলে দিল। অর্থাৎ কবি সেই সব কৃষকের জয়গান গাইছেন যারা মাটির বুকে ফসল ফলায়।

ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় – কৃষকের দৃঢ় কঠিন হাতের কবলে পড়ে পৃথিবীর মাটি যেন ফুল, ফল ও ফসলের উপঢৌকন দিতে বাধ্য হয়।

বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল – হিংস্র মাংসাশী জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ।

জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা – বার্ধক্য ও মৃত্যু সমাকীর্ণ ভয়ংকর পৃথিবী।

যাদের শাসনে হলো সুন্দর
কুসুমিতা মনোহরা – যেসব শ্রমনিষ্ঠ মেহনতি মানুষের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে পৃথিবী অনুপম সুন্দর, পুষ্পময় ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে, কবি তাদের জয়গান গাইছেন।

বর্বর – সভ্যতা বিকাশের আগেকার আদিম অসভ্য মানুষ।

অকুতোভয়ে – নির্ভয়ে। নির্ভীকচিত্তে।

বিবর – গর্ত। গহ্বর।

যাযাবর – কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই এমন ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠীবিশেষ।

ধরণী-মেরির যিশু – পৃথিবী-মাতার আত্মোৎসর্গকারী পুত্র। মা মেরির সন্তান যিশুখ্রিষ্ট যেমন মানব-মঙ্গলের জন্য আত্মাহুতি দেন তেমনি যেসব মানবসন্তান মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করেন কবি তাদের বন্দনা করেন।

যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী
শূন্যে অমিত বেগে – মহাবিশ্বে পৃথিবী প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। কবি কল্পনা করছেন যাঁরা স্থবিরতার বিরুদ্ধে, চলার গতিতে আস্থাবান তাঁদের চলার গতিতেই যেন পৃথিবীর এই গতি।

অমরাবতী – স্বর্গ।

যাহারা করিল ধ্বংস
সাধন পুন চঞ্চলমতি – অস্থির আবেগের বশে যারা পুনরায় ধ্বংস করেছে।

উদ্ধত-শির – যারা সহজে মাথা নোয়ায় না। দুর্বিনীত।

গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর – সাগর ভরাট বা নিয়ন্ত্রণ করে নগর-বন্দর প্রতিষ্ঠা করতে গেল।

যারা জীবনের পসরা
বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি – যারা প্রাণের মায়া করে না, মৃত্যুকে পরোয়া করে না।

ভীম রণভূমে – ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে।

বেদে – ভারতবর্ষ অঞ্চলের যাযাবর জনগোষ্ঠীবিশেষ।

বেদুঈন – আরব দেশের যাযাবর জাতিবিশেষ।

গরল-পিয়ালা – বিষপাত্র।

গিরি-নিঃস্রাব – পর্বত-নিঃসৃত ঝরনা বা নদী।

আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব – বর্ষাকালে নদী বা ঝরনার জলস্রোত প্রচণ্ড গতিশক্তি পায়।

বর্বর বলি যাহাদের গালি
পাড়িল ক্ষুদ্রমনা – সংকীর্ণচিত্ত লোকেরা যেসব কৃষক-মজুরদের অসভ্য ও অশিক্ষিত বলে গালাগাল দিয়েছে তাদের।

কূপ-মণ্ডূক – কুয়োর ব্যাঙ। বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তি। অল্পজ্ঞ।

অসংযমী – উচ্ছৃঙ্খল।

কূপ-মণ্ডূক 'অসংযমী'র
আখ্যা দিয়াছে যারে – যাকে অল্পজ্ঞান ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে 'উচ্ছৃঙ্খল' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

"জীবন-বন্দনা" কবিতাটি নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। যুগের যথার্থ চারণকবি নজরুলের কবিতায় সমকালে মানবমুক্তির যে উদাত্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল "জীবন-বন্দনা" কবিতাতেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে। এ কবিতায় কবি তাদের জয়গান গাইছেন, যারা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয় ফল ও ফসলে, যারা মৃত্যু সমাকীর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তুলেছে মনোরম ও সুন্দর, যারা মানবকল্যাণে আত্মাহুতি দিয়েছে দেশে দেশে কালে কালে।

কবি তারুণ্যের সেই শক্তিকে বন্দনা করেন যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত জয় করে, সাগরকে ভরাট করে নগর গড়ে, মেরুর বুকে অভিযান চালায়, আকাশ জয়ে ছুটে যায় গ্রহে গ্রহান্তরে।

কবি মানবের মুক্তিসংগ্রামে আগুয়ান সেই শক্তির জয়গান গান, যারা মানবমুক্তির পথে কোনো বাধা মানে না, নির্দ্বিধায় আত্মাহুতি দেয় বিপ্লবী সংগ্রামে।

সংকীর্ণমনার দল এদের উচ্ছৃঙ্খল বলে আখ্যা দিলেও কবির কাছে এদের মহিমা অসীম। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে এদেরই জয়গান রচনা করেন।

"জীবন-বন্দনা" কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। শেষ অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার। নজরুলের একটি প্রিয় ছন্দ এই ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। তাঁর বহু কবিতা এই ছন্দে রচিত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

ক. চক্রবাক খ. বিজলী

গ. ধূমকেতু ঘ. নবযুগ

২. "জীবন-বন্দনা" কবিতায় কবি শ্রমজীবীদের জয়গান গেয়েছেন, কারণ তারা–

ক. খুবই পরিশ্রমী খ. দরিদ্র, অসহায়

গ. আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা ঘ. কাউকে পরোয়া করেন না

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি
তোমারে বহিতে যাহারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি
তারাই মানুষ তারাই দেবতা গাহি তাহাদের গান
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান

৩. উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে "জীবন-বন্দনা" কবিতার সংগতিপূর্ণ চরণ–

i. শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

ii. নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।

iii. তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii | খ. i ও iii
গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii

৪. "জীবন-বন্দনা" কবিতায় ফুটে উঠেছে–

ক. তারুণ্যের জয় গান | খ. মানব মুক্তির উদাত্ত বাণী
গ. শ্রমজীবীদের অসহায়ত্বের বর্ণনা | ঘ. তারুণ্য শক্তির সাহসিকতার বর্ণনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাশিমপুরে চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে বিরাট আয়োজন। এলাকার ধনী-গরিব সবাই এসেছেন দাওয়তে। দরিদ্র কৃষক সেলিম মিয়াও মেয়ে সেলিনা ও ছেলে সুমনকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটল সুমনের হাত থেকে পড়ে একটি গ্লাস ভেঙে যাওয়ায়। চেয়ারম্যান সাহেবের স্ত্রী চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে বললেন– "এসব অসভ্য ছোটলোকদের দাওয়াত দেওয়াই ভুল হয়েছে।" চেয়ারম্যান তাকে থামানোর চেষ্টা করে বললেন, "এরাইতো আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। এদের কারণেই আমরা এত সুখ আর প্রাচুর্য পেয়েছি।" তিনি সুমন ও সেলিনাকে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন এবং সেলিমের কাছে স্ত্রীর আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ক. "জীবন-বন্দনা" কবিতায় কবি নিজেকে কী বলে অভিহিত করেছেন?

খ. 'ফসলের ফরমান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. চেয়ারম্যানের স্ত্রী "জীবন-বন্দনা" কবিতায় বর্ণিত যে মানসিকতার পরিচয় বহন করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত মানসিকতাই এই কবিতার মূলসুর– বিশ্লেষণ কর।

সাম্যবাদী

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি : "জীবন-বন্দনা" কবিতা অংশে দ্রষ্টব্য

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?– পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক–চেলা? বলে যাও, বল আরও!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক–
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ, –
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি? – পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি–কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,

এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য – সমদর্শিতা। সমতা।

সাম্যবাদ – জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ।

পার্সি – পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক।

জৈন – জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতি।

ইহুদি – প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ।

সাঁওতাল, ভীল – ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ।

গারো – গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীবিশেষ।

কন্‌ফুসিয়াস – চীনা দার্শনিক। এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে।

চার্বাক – একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না।

জেন্দাবেস্তা – পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা।

সকল শাস্ত্র ... দেখ নিজ প্রাণ – ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বাইবেল–এভাবে পৃথিবীর নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি।

যুগাবতার – বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ বা আবতার।

দেউল – দেবালয়। মন্দির।

ঝুট – মিথ্যা।

নীলাচল – জগন্নাথক্ষেত্র। নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না।

কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া – হিন্দুদের ধর্মীয় কয়েকটি পবিত্র স্থান।

জেরুজালেম – বায়তুল-মোকাদ্দস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান।

মসজিদ এই ... এই হৃদয়	–	মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দির গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র।
বাঁশির কিশোর গাহিলেন		
মহা-গীতা	–	হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।
শাক্যমুনি	–	শাকবংশে জন্ম যার। বুদ্ধদেব।
কন্দরে	–	পর্বতের গুহা। (হৃদয়ের) গভীর গোপন স্থান।
আরব-দুলাল	–	আরব সন্তান। এখানে হজরত মুহম্মদ (স) কে বোঝানো হয়েছে।
কোরানের সাম-গান	–	পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী।

পাঠ-পরিচিতি

আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলি'র প্রথম খণ্ড থেকে "সাম্যবাদী" কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটিতে বৈষম্যবিহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবি এই 'সাম্যের গান' গেয়েই গোটা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী। কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। নজরুলের এই আদর্শ আজও প্রতিটি সত্যিকার মানুষের জীবনপথের প্রেরণা। কিন্তু মানুষ এখনও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করছে, মানুষকে শোষণ করছে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কে দিচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। নজরুল এই কবিতায় সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : "মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর"। তাই তিনি জোর দেন অন্তর-ধর্মের ওপর। ধর্মগ্রন্থ পড়ে যে জ্ঞান মানুষ আহরণ করতে পারে, তাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই, এই প্রতীতি কবির স্বোপার্জিত অনুভব। এ কারণেই কবি মানবিক মেলবন্ধনের এক অপূর্ব সংগীত পরিবেশন করতে আগ্রহী। এ গানে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে যাবে। মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই জীবনকে পবিত্রতম করে তোলা সম্ভব, এই মর্মবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই এই কবিতায় নজরুলের অন্বিষ্ট।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'জেন্দা' একটি–

ক. গ্রন্থ　　খ. জাতি

গ. ব্যক্তি　　ঘ. ভাষা

২. মৃত পুঁথি-কঙ্কাল কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. পুরনো বই পুস্তক　　খ. মানুষের কঙ্কাল

গ. অতীত ইতিহাস　　ঘ. পুরনো ধ্যান-ধারণা

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রীতি ও প্রেমের পূর্ণ বাঁধনে
যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
আমাদের কুঁড়ে ঘরে।

৩. উদ্দীপকে "সাম্যবাদী" কবিতার যে দিকটি উচ্চারিত হয়েছে তা হলো–

i. সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাণী

ii. অসাম্প্রদায়িকতার বাণী

iii. পারস্পরিক ভালোবাসার বাণী

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। কাজী নজরুল ইসলামকে সাম্যবাদী কবি বলা হয়, কারণ তিনি–

i. নারী-পুরুষের সমতা চেয়েছেন

ii. ধনী-গরিবের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন

iii. ধর্মীয় বিভেদ ভুলে যেতে বলেছেন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শুধাও আমাকে "এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে
তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শোন নাই
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"
এক সাথে আছি একসাথে বাঁচি আরও একসাথে থাকবই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।

ক. 'যুগাবতার' অর্থ কী?

খ. কবি কেন সাম্যের গান গেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে "সাম্যবাদী" কবিতার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দিষ্ট দিকটি হৃদয়ে লালন করার মাধ্যমে আমরা সুন্দর-সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারব।'– বিশ্লেষণ কর।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে
জীবনানন্দ দাশ

কবি-পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবি। মায়ের কাছ থেকে তিনি কবিতা লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্বল্প সময়ের জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করলেও মূলত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে গ্রামবাংলার নিসর্গের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা চলে না। সেই নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তাঁর হাতে অনন্যসাধারণ কবিতাশিল্প রচিত হয়েছে। এই অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চিত্ররূপময়’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্য ও মাহাত্ম্য সন্ধানে তিনি এক অপ্রতিম কবিভাষা সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন ‘নির্জনতম কবি’ বলে। উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন, আলো-আঁধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার এবং অনুভবের বিচিত্র মাত্রার ব্যবহারে তাঁর কবিতা লাভ করেছে অসাধারণত্ব। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান রয়েছে। জীবনানন্দের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : ‘ঝরা পালক’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’, ‘রূপসী বাংলা’। ‘কবিতার কথা’ তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ এবং ‘মাল্যবান’ ও ‘সুতীর্থ’ তাঁর বিখ্যাত দুইটি উপন্যাস ।

জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২এ অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে–সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ’রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে–সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;
সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের ’পর–
শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো–বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

শব্দার্থ ও টীকা

এই পৃথিবীতে...সুন্দর করুণ – কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন দেশ বাংলাদেশ।

নাটা – লতাকরঞ্জ; গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ।

সেখানে ভোরের...জাগিছে অরুণ	–	বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা আঁকতে গিয়ে ভোরে মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো বিচ্ছুরণ যেন ধারণ করেছে করমচা বা করমচা ফুলের রং।
বারুণী	–	বরুণানী। বরুণের স্ত্রী। জলের দেবী।
সেখানে বারুণী থাকে...অবিরল জল	–	জলে পরিপূর্ণ এদেশের অসংখ্য নদী-নালার স্রোতধারার প্রাণৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যের রূপ আঁকা হয়েছে এই পঙ্ক্তি দুটির মধ্যে।
সেইখানে শঙ্খচিল ... অস্ফুট, তরুণ	–	জীবন আর প্রকৃতির ঐক্য ও সংহতিতে বাংলাদেশ একাকার। পানের বরজে হাওয়ায় যে চঞ্চলতা জেগে ওঠে সেই চঞ্চলতা সম্প্রসারিত হয় দূর আকাশের শঙ্খচিলের ডানায়। আর মিষ্টি ও ম্রিয়মাণ ধানের গন্ধের মতো লক্ষ্মীপেঁচাও মিলেমিশে থাকে প্রকৃতির একান্ত পরিবেষ্টনীতে।
বিশালাক্ষী	–	যে রমণীর চোখ আয়ত ও টানাটানা। এখানে আয়তলোচনা দেবী দুর্গার কথা বলা হয়েছে।
সুদর্শন	–	এক ধরনের পোকা।
বর	–	এখানে আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত।

পাঠ-পরিচিতি

অসাধারণ অনন্য সুন্দর এই দেশ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর কোথাও নেই আর। অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে-অরণ্যে। মধুকূপী, কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল তাদেরই কোনো-কোনোটির নাম। এদেশের পূর্বাকাশে যখন সূর্য ওঠে মেঘের আড়াল থেকে তার রং হয় করঞ্জা রঙিন। আর এদেশের প্রতিটি নদ-নদী ভরে থাকে স্বচ্ছ জলে। সেই জল ফুরায় না কখনই। জলের দেবতা অনিঃশেষ জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রাখে এদেশের অসংখ্য নদীকে। প্রকৃতি আর প্রাণিকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির-অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। তাই হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন দূর আকাশের শঙ্খচিল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মীপেঁচাও মিশে থাকে প্রকৃতির গভীরে, অন্ধকারের বিচিত্ররূপ এই দেশে। অন্ধকার ঘাসের ওপর নুয়ে থাকে লেবুর শাখা কিংবা অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। জন্ম দেয় শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়ির বর্ণশোভা। কবির বিশ্বাস, পৃথিবীর অন্য কোথাও শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না। কেননা বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল বলেই নীল-সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীবনানন্দ দাশ রচিত উপন্যাস কোনটি?

ক. কবিতার কথা খ. ধূসর পাণ্ডুলিপি
গ. মহাপৃথিবী ঘ. মাল্যবান

২. 'সুন্দর করুণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

i . সাধারণ সৌন্দর্য
ii . বেদনামলিন সৌন্দর্য
iii . দুঃখের মাঝেও সৌন্দর্য

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

এইচএসসি পাসের পর পড়াশোনার জন্য কানাডা পাড়ি জমায় সৈকত। কিন্তু তার মনকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে স্বদেশে রেখে যাওয়া ছোট গ্রাম, সেখানকার আম্রকানন, বিস্তৃত ধানক্ষেত। তার ভাষায় স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ তার প্রিয় স্বদেশ।

৩. সৈকতের অনুভূতি "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে" কবিতার নিচের যে যে চরণে বিদ্যমান তা হলো–

i. এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে–সবচেয়ে সুন্দর করুণ

ii. সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল হিজল

iii. তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত অনুভূতির প্রধান শক্তি কী?

ক. স্বদেশপ্রেম

খ. বিদেশপ্রীতি

গ. স্মৃতিকাতরতা

ঘ. স্বাজাত্যবোধ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

২. আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

ক. জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?

খ. 'জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল'– কথাটির দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের উভয় অংশে কোন বিশেষ দিকটি "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে" কবিতায় উপস্থিত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত বিশেষ দিকটি "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে" কবিতার প্রাণ— উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।

নতুন কবিতা
জসীমউদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আনসারউদ্দীন মোল্লা এবং মায়ের নাম আমিনা খাতুন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে ''কবর'' কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই কবিতাটি স্কুল পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়।

জসীমউদ্‌দীন 'পল্লি-কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হন। পল্লিজীবন তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহ, সহজ-সরল প্রাকৃতিক রূপ উপযুক্ত শব্দ উপমা ও চিত্রের মাধ্যমে তাঁর কাব্যে এক অনন্য সাধারণ মাত্রায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য জনপ্রিয় ও সমাদৃত গ্রন্থ হচ্ছে : 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'ধানখেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রদান করে।

জসীমউদ্‌দীন ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

রামধনুরে ধরতে পারি রঙের মায়ায়,
            ধরব না তা :
বিজলি এনে ভরতে পারি রঙের খাঁচায়
            আনব না তা।
আঁকশি দিয়ে পাড়তে পারি চাঁদের চুমো,
ছড়ার নূপুর বাজিয়ে তোমায় করতে পারি ঘুমোঘুমো;
পাতালপুরীর রাজকন্যে সাত মানিকের প্রদীপ জ্বালি,
ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমলী স্বপন হাসছে খালি,
এসব কথা ছড়ায় গেঁথে বলতে পারি,
            বলব না তা,
পাখির পাখায় লিখন তারে লিখতে পারি,
            লিখব না তা;
লিখব আজি তাদের কথা, কথা যারা বলতে নারে,
একশ হাতে মারছে যাদের সমাজ-নীতি হাজার মারে।

না ফুটিতে পড়ছে ঝরে শিশু-কুসুম যাদের কোলে,
পলে পলে মরছে যারা অনাহারের চিতায় জ্বলে;
লিখব আজি তাদের কথা, চোখ থাকতে অন্ধ যারা,
অন্ধ যারা— বন্ধ যারা জ্যান্ত মৃত পশুর পারা;
অজ্ঞ পিতা সন্তানেরে অজ্ঞানতার টানছে কারায়,
মূর্খ মাতা ছেলের মুখে আপন হাতে বিষ তুলে দ্যায়।
তাদের কথা লিখব আমি লিখব আজি আগুন দিয়ে,
লিখব আজি ঝড়ের রাতের অট্টহাসি বিজলি নিয়ে।
লিখব আজি বজ্র দিয়ে ধ্বংস-পাখির প্রলয় পাখায়,
লিখব আজি সোয়ার হয়ে জীবনদানের রক্তঘোড়ায়।
নগর ছাড়া শহর ছাড়া অজ্ঞানতার অন্ধকারা,
যুগের যুগের অত্যাচারে তিলে তিলে মরছে যারা।
আশা-হারা ভাষা-হারা সুদূর গাঁয়ের একটি কোণে,
রোগ, ব্যাধি আর শোষণকারী, সমান যুঝে সবার সনে;
আজকে রণে ক্লান্ত হয়ে, নির্বাসিত ভাইরা আমার,
গণছে করে বাকি আছে মরণ-ঘুমের কদিন বা আর।
যাব আমি তাদের কাছে বলব ডেকে, ভাইরা ওরে,
আকাশভরা শূন্যতারে এনেছি আজ বক্ষে ধরে।

শব্দার্থ ও টীকা

রঙের খাঁচায়	–	রঙ দিয়ে তৈরি কাঠামো।
আঁকশি	–	গাছ থেকে ফুলফল সংগ্রহের জন্য বক্রমুখ বিশিষ্ট সরু লম্বা দণ্ড।
ঘুমলী স্বপন	–	ঘুম-ঘুম স্বপ্ন।
চোখ থাকতে অন্ধ যারা	–	নিরক্ষর। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চায় পিছিয়ে থাকা মানুষ।
পশুর পারা	–	পশুর ন্যায়। যারা পশুর মতো জীবন-যাপন করে।
অজ্ঞানতার টানছে কারায়	–	অজ্ঞানতা ও মূর্খতার কারাগারে বন্দি করে রাখছে।
লিখব আজি আগুন দিয়ে	–	অগ্নিক্ষরা বাণী দিয়ে। বিদ্রোহের ভাষা দিয়ে কবি তাদের কথা লিখবেন।
ঝড়ের রাতের অট্টহাসি বিজলি নিয়ে	–	ঝড়ে রাতে ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডবের মধ্যে যেমন বিদ্যুতের আলো জ্বলে ওঠে, তেমনি সেই বিদ্যুতের আলো নিয়ে তিনি নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-বঞ্চনার কথা লিখবেন।

বজ্র দিয়ে ধ্বংস পাখির প্রলয় পাখায়	– যে পাখি তার পাখায় বজ্র প্রলয় তুলে ধ্বংস ডেকে আনে কবি তার পাখায় বজ্র দিয়ে নতুন কবিতা লিখবেন।
জীবন দানের রক্তঘোড়ায়	– যে তেজি ঘোড়া নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য ছুটে চলে।
নগর ছাড়া শহর ছাড়া	– নগর-শহরের বাইরে।
অজ্ঞানতার অন্ধকারা	– নিরক্ষতার অন্ধকার রূপ কারাগার।
যুগের যুগের অত্যাচারে	– দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচারে।
আশা-হারা, ভাষা-হারা	– যাদের মনে একটুকু আশা নেই, নিজের দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করার ভাষা নেই, অধিকার নেই।
রোগ-ব্যাধি আর শোষণকারী	– গ্রামের অবহেলিত মানুষ একদিকে যেমন রোগব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করছে তেমনি যুদ্ধ করছে শোষণকারী এক শ্রেণির ক্ষমতাবান মানুষের বিরুদ্ধে।
রণে-ক্লান্ত হয়ে	– জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে।
মরণ-ঘুমের	– মৃত্যুর।
আকাশভরা শূন্যতা	– বিশাল আকাশের উদার-মুক্তির বার্তা।

পাঠ-পরিচিতি

কবি কল্পনা ও স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে আঁকা কবিতা আর লিখবেন না। রঙের সাতটি পাখায় আঁকা যে রঙধনু তিনি তাকে মনের রং দিয়ে আঁকতে পারেন, কল্পনার হাতছানিতে ধরতে পারেন। কিন্তু এখন আর ধরবেন না। তেমনিভাবে চাঁদের মধুর জোছনার সৌন্দর্য নিয়ে পাতালপুরীর রাজকন্যার গল্প নিয়েও আর কবিতা লিখবেন না। ছড়ায় ছড়ায় অনেক ছন্দের সুর তুলতে পারেন তাও তিনি করবেন না। সমাজের যারা নিপীড়িত, যারা প্রতিনিয়ত দলিত হচ্ছে তাদের জন্য কবি নতুন কবিতা লিখবেন। যে ফুল না ফুটতে অজ্ঞাতে অবহেলায় ঝরে যাচ্ছে, ফুলের মতো সেসব মানব শিশুর কথা তিনি লিখবেন। যারা চোখ থাকতেও অন্ধ, যারা নিরক্ষর, মূর্খ, অসহায়, বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে, বিদ্রোহের ভাষা দিয়ে তিনি তাদের কথা লিখবেন। কবি তাদের জন্য লিখবেন অন্য ধারার নতুন কবিতা। তাদের শোনাবেন বুকভরা আশার বাণী।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. নকসী কাঁথার মাঠ

গ. রঙিলা নায়ের মাঝি ঘ. বালুচর

২. “আমি লিখব আজি আগুন দিয়ে”–“আগুন দিয়ে” বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ক. অনল বাণী খ. প্রচণ্ড প্রতিবাদ

গ. বাস্তবতা ঘ. সর্বশক্তি

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

৩. উভয় কবির মধ্যে মিল পাওয়া যায়–

i. অতৃপ্তিতে

ii. প্রত্যাশায়

iii. প্রাপ্তিতে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উপর্যুক্ত মিলের যথার্থ্য পরিলক্ষিত হয় নিচের কোন চরণে?

ক. তৃপ্ত হতে না পারলে অতৃপ্তি থেকেই যাবে।
খ. মানুষ যা পায় তা চায় না।
গ. প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী।
ঘ. একজনের পক্ষে সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো,
পদ লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা–
কবিতা তোমায় দিলেম আজিকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

ক. কে ছেলের মুখে আপন হাতে বিষ তুলে দেয়?

খ. "আকাশ ভরা শূন্যতারে এনেছি আজ বক্ষে ধরে"– উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটিতে "নতুন কবিতা"র কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

ঘ. উদ্দীপকটি "নতুন কবিতা"র সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করতে পারেনি– যাচাই কর।

তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ জুন বরিশালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। কবির পিতার নাম সৈয়দ আবদুল বারী এবং মায়ের নাম সাবেরা বেগম। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙালি মুসলমান নারীদের কাটাতে হতো গৃহবন্দি জীবন। স্কুল কলেজে পড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। ওই বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। পারিবারিক নানা উত্থান পতনের মধ্যে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তারই মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে তিনি শুধু কবি হিসেবেই বরণীয় হননি, জননী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন।

সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'কেয়ার কাঁটা', 'উদাত্ত পৃথিবী' ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০এ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

"হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"
"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম, "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"
কহিল সে সুদূরে চাহিয়া–
"অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।"

কহিলাম, "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি– এ মোর মিনতি।"
কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে–
"নাই হলো, না হোক এবারে–
আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া–
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।"

কহিলাম : "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।"
কহিল সে পরম হেলায়–
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?"
"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরে আসি–
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।"

শব্দার্থ ও টীকা

হে কবি – কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করেছেন।

নীরব কেন – উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছেন না।

ফাগুন যে এসেছে ধরায় – পৃথিবীতে ফাল্গুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

তব বন্দনায় – তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা–গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না?

দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি? – কবির জিজ্ঞাসা– বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কি না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেননি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়।

বাতাবি নেবুর ফুল...
অধীর আকুল – বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্মনা কবি এসব কিছুই লক্ষ করেননি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট করে।

এখনো দেখনি তুমি? – কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ করছেন না।

কোথা তব নব পুষ্পসাজ – বসন্ত এসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজাননি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেননি।

অলখ – অলক্ষ। দৃষ্টি অগোচরে।

পাথার	–	সমুদ্র।
বসন্তেরে আনিতে...		
ফাগুন স্মরিয়া	–	কবি বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা করলেও বসন্ত অপেক্ষা করেনি। ফাল্গুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে।
করিলে বৃথাই	–	ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি-ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে।
পুষ্পারতি	–	ফুলেল বন্দনা বা নিবেদন।
পুষ্পারতি লভে নি কি		
ঋতুর রাজন?	–	ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে গাছে ফুল ফোটেনি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে।
মাধবী	–	বাসন্তী লতা বা তার ফুল।
অর্ঘ্য বিরচন	–	অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে।
উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন		
কবি দাও তুমি ব্যথা	–	কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন।
কুহেলি	–	কুয়াশা।
উত্তরী	–	চাদর। উত্তরীয়।
কুহেলি উত্তরী তলে		
মাঘের সন্ন্যাসী	–	কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। যে সন্ন্যাসী কুয়াশার চাদর পরিধান করে আছে।
পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে	–	শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।
তাহারেই পড়ে মনে	–	প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা-পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

পাঠ-পরিচিতি

"তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে। সাধারণভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বসন্ত-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যে কবিমনে আনন্দের শিহরণ জাগাবে এবং তিনি তাকে ভাবে ছন্দে সুরে ফুটিয়ে তুলবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কবিমন যদি কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন কিংবা বেদনা-ভারাতুর থাকে তবে বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৩২) কবির জীবনে প্রচ শূন্যতা নেমে আসে। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে নেমে আসে এক দুঃসহ বিষণ্নতা। কবিমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় রিক্ততার হাহাকারে। "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এই বিষাদময় রিক্ততার সুর। তাই বসন্ত এলেও উদাসীন কবির অন্তর জুড়ে রিক্ত শীতের করুণ বিদায়ের বেদনা।

কবিতাটির আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর নাটকীয়তা। গঠনরীতির দিক থেকে এটি সংলাপনির্ভর রচনা। কবিতার আবেগময় ভাববস্তুর বেদনাঘন বিষণ্নতার সুর এবং সুললিত ছন্দ এতই মাধুর্যমতি যে তা সহজেই পাঠকের অন্তর ছুঁয়ে যায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী?

ক. চাদর খ. কুয়াশা

গ. সমীর ঘ. উত্তর দিক

২. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি'–চরণটিতে 'স্নিগ্ধ আঁখি' বলতে বোঝায়–

ক. মায়াবী দৃষ্টি খ. কোমল নেত্র

গ. অশ্রুসিক্ত নয়ন ঘ. উৎসুক চাহনি

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

শাহজাহানের অমর সৃষ্টি তাজমহল। তাজমহলকে ঘিরে আছে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী মমতাজের স্মৃতি। তাই পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য একত্র করে তিনি সাজিয়েছেন প্রিয়তম স্ত্রীর সমাধি।

৩. নিচের কোন চরণটিতে উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।

খ. তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।

গ. তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?

ঘ. বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?

৪. শাহজাহান ও সুফিয়া কামালের আচরণের ভিন্নতা থাকলেও বলা যায় উভয়ই–

ক. আবেগাশ্রয়ী ও অহঙ্কারী খ. অভিমানী ও স্নেহ পরায়ণ

গ. স্মৃতিকাতর ও প্রেমময় ঘ. উদাসীন ও মেধাবী

সৃজনশীল প্রশ্ন

যারে খুব বেসেছিনু ভালো
সে মোরে ছেড়ে চলে গেল
যে ছিল মোর জীবন ছায়া
রেখে গেছে শুধু মায়া।
লাগে না ভালো অপরূপ প্রকৃতি
যতই করুক কেউ মিনতি
আমি এখন রিক্ত শূন্য
মন পড়ে রয়েছে তার জন্য
সে দিল মোরে কেমনে ফাঁকি
আমি এখন বড় একাকী।

ক. "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

খ. "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"– উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি "তাহারেই পড়ে মনে" কবিতার সুরকে প্রকাশ করতে পারেনি।'–তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
শাহ আবদুল করিম

কবি-পরিচিতি

শাহ আবদুল করিম ১৯১৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ধল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইব্রাহিম আলী, মা নাইওরজান বিবি। বাউল করিম বাংলা লোকগানের অগ্রগণ্য সাধকদের একজন। জীবনের প্রতি, ভাবাদর্শের প্রতি, অনাবিল ভালোবাসার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে তাঁর গান। ভাটি বাংলার এই লোককবির ভাবমানস জুড়ে রয়েছে মরমি সাধনার বহুমাত্রিক বিস্তার। তবে কেবল অধ্যাত্মচেতনা নয়, মাটি ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততায়ও উজ্জ্বল তাঁর শিল্পলোক। জনপ্রিয় ও তত্ত্ববহুল গানের পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন অজস্র গণসংগীত, যা দুঃখজয়ের গান হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আফতাব সংগীত' প্রকাশিত হয়। 'গণসংগীত', 'কালনীর ঢেউ', 'ধলমেলা', 'ভাটির চিঠি', 'কালনীর কূলে' ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনি একুশে পদকসহ (২০০১) বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। শাহ আবদুল করিম ২০০৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাটুগান গাইতাম ॥
বর্ষা যখন হইত গাজির গাইন আইত
রঙ্গে-ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম
বাউলা গান ঘাটুগান আনন্দের তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥
হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রাগান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম
কে হবে মেম্বার কে হবে গ্রামসরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম ॥
বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতের বলে
গরিব কাঙালে বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল–বড়লোক হইতাম ॥

করি ভাবনা সেদিন আর পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ॥

শব্দার্থ ও টীকা

বাউলা গান	–	বাউল সাধক সম্প্রদায়ের গান। বাংলা লোকগীতির একটি প্রধান ধারা।
ঘাটুগান	–	ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার ভাটি অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার লোকগীতি। সাধারণত বর্ষাকালে বড় বড় নৌকায় এই গানের আসর বসে। নদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরে এই গান পরিবেশিত হয়। এই গানের কেন্দ্রীয় চরিত্র যে কিশোরটি মেয়ে সেজে নেচে নেচে গান গায়, তাকেও ঘাটু বলা হয়ে থাকে। ঘাটুগান মূলত প্রণয়-গীতি।
গাজির গাইন	–	গাজির গান। গাজি পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক লোকগীতি। গাজি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাঘের অধিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত। গাজির গান গেয়ে বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ কামনা করা হয়।
সারিগান	–	একপ্রকার কর্মগীতি। সারিবদ্ধ বা একত্রে কাজ করার সময় গাওয়া হয় বলে একে সারিগান বলে। সাধারণত নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় মাঝিরা সম্মিলিতভাবে এই গান গায়। কোথাও কোথাও ছাদপেটা, গাড়িঠেলা প্রভৃতি কায়িকশ্রমের কাজেও সারিগান গাওয়া হয়।
নাও দৌড়াইতাম	–	নৌকা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম। নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলায় বর্ষাকালে এই ‘নৌকা বাইচ’ অনুষ্ঠিত হয়।
বাড়িন্ত	–	বাড়িগুলোতে।
যাত্রাগান	–	দেশীয় একপ্রকার নাট্যাভিনয়। যাত্রাপালা হিসেবে সমধিক পরিচিত। সূচনাকালে যাত্রাপালায় সংগীতের প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এতে সংলাপের প্রাধান্য সূচিত হয়।
পঞ্চাইত	–	গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারসভা।
বড়লোক হইতাম	–	বড়লোক হতে চাই।
দীনহীন	–	ধর্মপথের দিশাহীন। সহায় সম্বলহীন।

পাঠ-পরিচিতি

শাহ আবদুল করিমের “আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম” রচনাটি ২০১০ সালে প্রকাশিত শুভেন্দু ইমাম সম্পাদিত ‘শাহ আবদুল করিম : পাঠ ও পাঠকৃতি’ শীর্ষক সংকলন থেকে সংগৃহীত।

আবহমান গ্রাম-বাংলার চিরচেনা ঐতিহ্য, পুরনো দিনের স্মৃতি কবিতাটিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। আগে গ্রামের মানুষের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের বন্ধন ছিল, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ছিল সর্বদা অটুট। বছরের বিভিন্ন সময়ে সবাই মিলে উপভোগ করত বাউল গান, ঘাটুগান, গাজির গান, সারি গান, যাত্রাগান, নৌকা-বাইচ ইত্যাদি। অর্থাৎ বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির মধ্যে আবাহন করেই সকলের চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হতো। কখনো বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটলে সাধারণ মানুষ গ্রামের প্রধানদের কাছেই বিচার পেত। সহজ, সরল, ধর্মবলে বলীয়ান এ মানুষগুলো এখনকার মতো দ্রুত বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখত না। বর্তমানের কঠিন বাস্তবতায় মানবিক অশান্তির শিকার কবি স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেছেন। তিনি ঐতিহ্যের রসে সিক্ত হয়ে সুখী হওয়ার পুরনো পথই খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাওয়া হয়

ক. বাউলা গান খ. গাজির গান

গ. ঘাটু গান ঘ. জারি গান

২. "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম" চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. আগের দিন সুখের ছিল খ. পূর্বে মানুষ সমৃদ্ধ ছিল

গ. আগে মানুষ নির্লোভ ছিল ঘ. অতীতে মানুষ সহানুভূতিশীল ছিল

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

"মনে পড়ে যায় কতো স্মৃতি মায়া-ভরা"– গানটি শুনলেই বৃদ্ধ হামিদ সাহেব তাঁর ছেলেবেলায় ফিরে যান। তাঁর মনে পড়ে কত কথা– সেসময় মানুষে মানুষে কত মিল ছিল, ধনী-গরিবে এত দূরত্ব ছিল না, উৎসবে-পার্বণে কতোইনা আনন্দ হতো! তাঁর মনে হয়, আবারও যদি সেই দিনগুলো ফিরে আসত!

৩. উদ্দীপকের সাথে "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম" কবিতার কবির অনুভূতির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো হলো–

i. অতীতচারিতা

ii. স্বপ্নচারিতা

iii. বাস্তবতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উপর্যুক্ত সাদৃশ্যের যথার্থ্য পরিলক্ষিত হয় নিচের কোন চরণে?

ক. এখন সবাই পাগল–বড়লোক হইতাম

খ. গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম

গ. দিন হতে দিন আসে যে কঠিন

ঘ. করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

একতারা বাজাইও না দোতারা বাজাইও না
একতারা বাজাইও না ঢাকঢোল বাজাইও না
গটার আর বংগো বাজাও রে
একতারা বাজাইলে মনে পইড়া যায়
আমার একতারা বাজাইলে মনে পইড়া যায়
একদিন বাঙালি ছিলাম রে।

ক. বর্ষায় কোন গান গাওয়া হতো?

খ. "দিন হতে দিন আসে যে কঠিন"– উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সাথে "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম" গীতি-কবিতার কী মিল আছে?– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি "আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম" কাবতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র– বিচার কর।

সেই অস্ত্র
আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

আহসান হাবীব বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হামিজুদ্দিন হাওলাদার এবং মাতার নাম জমিলা খাতুন। স্কুলজীবনেই তাঁর কবিতা লেখার হাতেখড়ি। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় কবিকে কলেজ ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় চলে আসতে হয়। পত্রিকা, রেডিও, প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও আহসান হাবীব শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতা, বিশেষ করে পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবেই জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেন। ১৯৫০-এর দিকে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসেন। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় কাজ করবার পরে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যোগ দেন 'দৈনিক বাংলা' (তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান') পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে। আমৃত্যু এই পত্রিকার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। স্বল্পভাষী, আত্মমগ্ন, স্পষ্টবাদী এই কবি ছিলেন মূলত মানবদরদি শিল্পী। দেশ ও জনতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা। ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, যুক্তিবিচারের আলোকে এক সুগভীর জীবনঘনিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা তাঁর কবিপ্রতিভার মূল সুর। কবি আহসান হাবীবের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : 'রাত্রিশেষ', 'ছায়াহরিণ', 'সারা দুপুর', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো', 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর', 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' প্রভৃতি। এছাড়া উপন্যাস ও শিশুসাহিত্যেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।
তিনি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও।

সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।

সেই অস্ত্র আমাকের ফিরিয়ে দাও

যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
মানব বসতির বুকে
মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত
লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত
আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী।

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
    এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।

যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
                    করে সমাবিষ্ট

সেই অমোঘ অস্ত্র–ভালোবাসা
            পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

শব্দার্থ ও টীকা

অমোঘ – অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যম্ভাবী।

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত – কবি ভালোবাসা আর শান্তির অস্ত্র দিয়ে সকল মারণাস্ত্রকে পরাভূত করবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না – কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। ভালোবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার আসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না।

যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না – কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন। কবি চান, মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়।

মানব বসতির বুকে মুহূর্তের
অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে
করবে পঙ্গু-বিকৃত – ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকণ্ঠা কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিচৈতন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। তাই আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী বহু মানুষের আর্তনাদ কবির এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে।

ট্রয়নগরী – প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যকলায় নন্দিত এক শহর। মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা আর দম্ভের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়।

জাত্যভিমান – কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।

সমাবিষ্ট – সমভাবে আবিষ্ট। সমাবেশ হয়েছে এমন; সমবেত হওয়া অর্থে।

পাঠ-পরিচিতি

"সেই অস্ত্র" কবিতাটি আহসান হাবীবের 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এই কবিতায় কবির একমাত্র প্রত্যাশা – ভালোবাসা নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া। কবির কাছে ভালোবাসা কেবল কোনো আবেগ কিংবা অনুভূতির দ্যোতনা জাগায় না। তাঁর বিশ্বাস, এটি মানুষকে সকল অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেয়। তাই কবি বিশ্বের মানবকুলের কাছেই এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। মানুষ যদি অপর মানুষের হিংসা, লোভ, ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকে তবে পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি; পৃথিবী এগিয়ে যাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিদ্বেষের বিষবাষ্পকে যদি অপসারণ করতে হয় তবে ভালোবাসা নামক অস্ত্রকে কবির কাছে এবং কবির মতো আরও বহু মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কবি জানেন, হিংসা আর স্বার্থপরতার করাল গ্রাসে অনেকেই মানবিকতাশূন্য হয়ে পড়ে। আর তাই কবি মানবিকতার সেই হৃতবোধকে ফিরে পেতে চান তথা মানব সমাজে ফিরিয়ে দিতে চান। পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চান অফুরান ভালোবাসা।

কবিতাটির গঠনগত বিশেষত্ব হলো, এর অনাড়ম্বর সহজ গতিময়তা। কোনো ভারি শব্দ ব্যবহার না করে সাবলীল ভাষায় কবি তাঁর একান্ত প্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন। এই কবিতাটি শান্তিপ্রিয় পৃথিবীবাসীর জন্য এক চিরায়ত প্রার্থনাসংগীত।

কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "সেই অস্ত্র" কবিতাটি আহসান হাবীবের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. রাত্রিশেষ খ. ছায়াহরিণ
গ. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ ঘ. মেঘ বলে চৈত্রে যাবো

২. "সেই অস্ত্র" কবিতায় 'অমোঘ অস্ত্র' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মোহাবিষ্ট অস্ত্র খ. অব্যর্থ অস্ত্র
গ. অনন্য অস্ত্র ঘ. খেলনা অস্ত্র

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।
... ...
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

৩. উদ্দীপকের সাথে "সেই অস্ত্র" কবিতার মিল রয়েছে–

i. অহিংসায়
ii. আত্মত্যাগে
iii. সৌহার্দ্যে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উপর্যুক্ত মিলের যথার্থ্য পরিলক্ষিত হয় নিচের কোন চরণে?

ক. ভালোবাসা দিয়ে সব জয় করা সম্ভব।
খ. অর্থবিত্ত দিয়ে সব জয় করা যায়।
গ. পারস্পরিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধি সাধিত হয়।
ঘ. স্বার্থপরতা ভালোবাসার অন্তরায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ
মানুষের মাঝে কভু রবে না বিচ্ছেদ–
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
... ...
হিংসা দ্বেষ রহিবে না কেহ কারে করিবে না ঘৃণা
পরস্পরে বাঁধি দিব প্রীতির বন্ধনে
বিশ্বজুড়ে এক সুরে বাজিবে গো মিলনের বীণা
মানব জাগিবে নব জীবন স্পন্দনে।

ক. "সেই অস্ত্র" কবিতায় বর্ণিত নগরটির নাম কী?
খ. "লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু–বিকৃত।"– উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে "সেই অস্ত্র" কবিতার কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত ভাবই যেন "সেই অস্ত্র" কবিতার চূড়ান্ত প্রতিফলন"– মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিচার কর।

পাঞ্জেরি
ফররুখ আহমদ

কবি-পরিচিতি

ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাতেম আলী। কর্মজীবনে বহুবিচিত্র পেশা অবলম্বন করেছেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন ঢাকা বেতারে 'স্টাফ রাইটার' হিসেবে। চল্লিশের দশকে আবির্ভূত শক্তিমান কবিদের অন্যতম ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। এর পর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনিকাব্য প্রকশিত হয়েছে। ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী এ কবির কবিতায় প্রধানত প্রকাশ ঘটেছে ইসলামি আদর্শ ও জীবনবোধের। তাঁর অন্য গ্রন্থগুলোর নাম– কাব্যগ্রন্থ : 'সিরাজাম মুনীরা'; কাব্যনাট্য : 'নৌফেল ও হাতেম'; সনেট সংকলন : 'মুহূর্তের কবিতা' এবং কাহিনিকাব্য : 'হাতেম তায়ী'। এছাড়া তিনি ছোটদের জন্য বেশ কিছু ছড়া ও কবিতা লিখে গেছেন। সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেছেন এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ অক্টোবর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন্ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে?
এ কী ঘন-সিয়া জিন্দেগানির বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান–শ্রান্ত খাব
অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে,
বুঝি মৌসুমি হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে,
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা, পেরেশান মুসাফির দল

দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে
নিরাশার ছবি এঁকে!
পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে
চলেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি।

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।
মোদের খেলার ধুলায় লুটায়ে পড়ি
কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।
সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুন্‌ছি তারি।
ও কি বাতাসের হাহাজার,— ও কি
রোনাজারি, ক্ষুধিতের!
ও কি দরিয়ার গর্জন, – ও কি বেদনা মজলুমের!
ও কি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী।
পাঞ্জেরি!

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি!
দেখ চেয়ে দেখ, সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি!
পাঞ্জেরি?

শব্দার্থ ও টীকা

পাঞ্জেরি – যে নৌ-কর্মচারী জাহাজের অগ্রভাগে বা মাস্তুলসংলগ্ন বাতি দিয়ে চারপাশ দেখে মাঝিকে পথনির্দেশক সংকেত দেয়। প্রতীকী অর্থ – জাতির পথপ্রদর্শক।

সেতারা – তারা। নক্ষত্র।

হেলাল – চাঁদ।

মাস্তুল – নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিতে পাল খাটানোর দণ্ড।

ঘন-সিয়া	– নিবিড় কালো (অন্ধকার)।
জিন্দেগানির বা'ব	– জীবনের অধ্যায় বা পর্যায়।
মর্সিয়া	– শোকগীতি।
খাব	– খোয়াব। স্বপ্ন।
হেরি	– দেখি। প্রত্যক্ষ করি। অবলোকন করি।
পেরেশান	– উদ্বিগ্ন। চিন্তিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্লান্ত।
মুসাফির	– পথিক। সফরকারী। যাত্রী। পর্যটক।
তক্‌দির	– ভাগ্য। অদৃষ্ট। কপাল। নসিব।
জুলমাত	– অন্ধকার।
গাফলত	– অবহেলা। ঔদাসীন্য। অমনোযোগিতা। ভুলচুক।
শর্বরী	– রাত্রি।
আহাজারি	– হাহাকার।
রোনাজারি	– আহাজারি করে কান্না।
মজলুম	– অত্যাচারিত।
ভ্রূকুটি	– ক্ষোভ। ক্রোধ ইত্যাদির কারণে ভুরুর কুঞ্চন বা কুঞ্চিত অবস্থা।
কৈফিয়ত	– জবাবদিহি। কারণ দেখিয়ে জবাব।

পাঠ-পরিচিতি

ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' থেকে "পাঞ্জেরি" কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। এ কাব্যের নাম-কবিতায় জাতীয় জীবনের অগ্রযাত্রার কাণ্ডারিকে যেমন প্রতীকী তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে, "পাঞ্জেরি" কথাটিও অনুরূপ এবং একই তাৎপর্যমণ্ডিত।

"পাঞ্জেরি" ফররুখ আহমদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এটি একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় পাঞ্জেরি জাতির কর্ণধারের প্রতীক। কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ ও চিত্রকল্প নানা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। কবিতাটিতে সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে কবি জাতীয় জীবনে বিরাজমান সংকট উত্তরণে জাতীয় নেতৃত্বের সচেতন ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন। এ কবিতায় ভাবকল্পনা ও আবেগ-মাধুর্য রূপায়ণে এবং ধ্বনিসৌকর্য, চিত্রকল্প রচনা ও রূপক-প্রতীক সৃষ্টিতে কবি চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবিতায় ভাবানুষঙ্গ রচনায় কবি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। চরণের পর্ববিন্যাস : ৬+৬+২। ব্যতিক্রমও রয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'রোনাজারি' কথার অর্থ কী?

ক. হাহাকার খ. কান্না

গ. অত্যাচার ঘ. অবহেলা

২. 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?'—এ চরণে রাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. অন্ধকার
খ. পরাধীনতা
গ. দুর্দিন
ঘ. দুঃখ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইসলাম রবি জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে, জোনাকীর আলো ক্ষীণ।
উমর! ফারুক! আখেরি নবির ওগো, দক্ষিণবাহু
আহ্বান নয়, রূপ ধরে এসো, গ্রাসে অন্ধতা রাহু।

৩. উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'পাঞ্জেরি' কবিতার যেসব ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো–

i. জাতির বিপর্যস্ত অবস্থা
ii. কাঙ্ক্ষিত উত্তরণ প্রত্যাশা
iii. অধঃপতিত মানুষের সকরুণ চিত্র

নিচের কোন উত্তরটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের বাণী নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?

ক. সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি
খ. দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
গ. তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে
ঘ. জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি

সৃজনশীল প্রশ্ন

উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—শাসকগোষ্ঠীর এহেন দম্ভোক্তিতে সারা বাংলার মানুষ গর্জে ওঠেন। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সর্বত্র। গঠিত হয় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ। এ পরিষদের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় ছিল সর্বস্তরের ঐক্যবদ্ধ মানুষের প্রতিনিধিত্ব। একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতা অগ্রসর হন সচিবালয়ের দিকে। মিছিলে মিছিলে কেঁপে ওঠে রাজপথ। শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে বেশ কজন শহিদ হলেও শেষ পর্যন্ত শাসকেরা মেনে নেয় বাংলার মানুষের ন্যায্য দাবি। বিজয় হয় যোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের।

ক. "পাঞ্জেরি" কথার অর্থ কী?

খ. "পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে চলেছি কোথায়?"—লেখকের এরূপ আশঙ্কার কারণ কী?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির সাথে "পাঞ্জেরি" কবিতায় বর্ণিত পরিস্থিতির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

ঘ. জাতীয় জীবনের সংকট উত্তরণে কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে তা উদ্দীপক ও "পাঞ্জেরি" কবিতার আলোকে যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

আলো চাই

সিকান্‌দার আবু জাফর

কবি-পরিচিতি

সিকান্‌দার আবু জাফর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম সৈয়দ আল্‌ হাশেমী আবু জাফর মুহম্মদ বখ্‌ত সিকান্‌দার। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী। আবু জাফর ১৯৩৬ সালে প্রবেশিকা ও পরে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতার মিলিটারি একাউন্টস বিভাগে যোগদান করে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে সিভিল সাপ্লাই অফিসে চাকরি করেন। মূলত তিনি পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। তিনি 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ', মিল্লাত' প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'সমকাল'। সে সময়ের তরুণ লেখকদের উৎসাহদান, জাতীয়তাবোধ ও বাঙালি চেতনায় অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটি অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭১ -এ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীনতা, দেশপ্রেম ও বিপ্লবের চেতনা-সম্পন্ন অনেক গান রচনা করেন। তাঁর রচিত 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' গানটি মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মুক্তিকামী জনতাকে অনুপ্রাণিত করে।

সিকান্‌দার আবু জাফর সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করেছেন। তবে তাঁর মূল পরিচয় তিনি কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিগুলো হলো– কাব্যগ্রন্থ : 'প্রসন্ন প্রহর', 'বৈরী বৃষ্টিতে', 'তিমিরান্তিক', 'কবিতা', 'বৃশ্চিক লগ্ন', 'বাংলা ছাড়ো'; নাটক : 'শকুন্ত উপাখ্যান', 'সিরাজউদ্দৌলা, 'মহাকবি আলাওল'; উপন্যাস : 'মাটি আর অশ্রু', 'পূরবী', 'নতুন সকাল'; কিশোর পাঠ্য : 'জয়ের পথে'। তিনি ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৮৪ সালে একুশে পদকে (মরণোত্তর) ভূষিত হন।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট সিকান্‌দার আবু জাফর মৃত্যুবরণ করেন।

শাখে শাখে চৈত্রের পল্লবে
দেখেছি বিমুগ্ধ চোখে সবুজের বর্ণ সমারোহ;
সে-বর্ণের কিছু আছে রহস্য জটিল
কিছু আছে অন্তরের কথা।
পত্রঝরা শাখা-বৃন্ত-প্রাণে
কী অব্যক্ত অনুনয় ছিল,
রুক্ষ শাখা ঊর্ধ্বশূন্যে কি কথা শোনালো,
উচ্ছ্বসিত বেদনার প্রাণস্পন্দ নিয়ে
কোথা থেকে এলো এই সবুজের শিশু,
তার কিছু ইতিহাস অদৃশ্য অক্ষরে আছে লেখা।
সে-দুর্জ্ঞেয় নীরব কাহিনি
রাত্রিদিন বারবার করে

শুনতে চেয়েছি আমি উন্মুখ শ্রবণে।
শোনার অতীত যত কথা
দেখার অতীত যত অপ্রতিম রূপ
তাই দিয়ে রূপে-রসে সৃষ্টির নিভৃত মর্মবাণী
লিপিবদ্ধ আছে সঙ্গোপনে।
সে-রূপের কিছু আলো পেয়েছি হৃদয়ে
কিছু কথা শুনেছি কখনো
মর্মের শ্রবণে
বুঝিনি অনেক কিছু তার।
যেটুকু বুঝেছি তাও কথা নেই শোনাবার মতো।
তবু সেই সুনিশ্চিত বাণী
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো অনুভূতি ঘিরে
স্পর্শ তার রেখে যায়, প্রলোভন রেখে যায় আরও,
আমি তাকে পাইনি আমার
চেতনার সহজ সন্ধানে।
তবু তাকে দেখবার বুঝবার অশেষ বিস্ময়ে
রুদ্ধদ্বার হৃদয়ের কাছে
অনুনয় করি বারংবার :
আলো চাই– আরও আলো, অন্তরের, তীব্রতম আলো।

শব্দার্থ ও টীকা

শাখে শাখে ... কিছু আছে অন্তরের কথা – চৈত্রের পত্রপল্লব বহু বর্ণিল। এই বর্ণিলতার মধ্যে অফুরন্ত রহস্য লুকিয়ে থাকে। যিনি সৃষ্টিশীল মানুষ, প্রকৃতিকে দেখার চোখ আছে যার, তিনি সেই রহস্যের মধ্যে মানব-মনের কথা শুনতে পান।

পত্র ঝরা শাখা-বৃন্ত-প্রাণে ... অদৃশ্য অক্ষরে আছে লেখা – ঝরে যাওয়ার মধ্যে দুঃখ থাকে। মানুষ যেমন সংসারের বন্ধন থেকে, পৃথিবীর বন্ধন থেকে চলে যেতে চায় না কিংবা তার প্রিয়জনকে চলে যেতে দিতে চায় না, কবিও তেমনি কল্পনায় একটি পাতাঝরা রূপের মধ্যেও তুলে ধরেন বেদনার হাহাকার, অব্যক্ত অনুনয়। কিন্তু বেদনাই শেষ কথা নয় সৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, আছে প্রাণের কোলাহল। 'সবুজ শিশু' তারই প্রতীক। আর এই সৃষ্টির মধ্যে গোপন এক ইতিহাসের মতো লেখা থাকে জীবনের জয়গান।

শোনার অতীত যত
কথা ... লিপিবদ্ধ
আছে সংগোপনে – প্রকৃতি চিরকালই রহস্যময়। কত না-জানা কথা, কত না-শোনা গান আর কত না- দেখা রূপ যে প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকে তার ইয়ত্তা নেই।

সে রূপের কিছু
আলো ... বুঝিনি
অনেক কিছু তার – প্রকৃতির বিপুল রহস্য আর অপরিমেয় সৌন্দর্যের আস্বাদ সব সৃষ্টিশীল মানুষেরই কাঙ্ক্ষিত। কবিও সেই রূপের, সেই সৌন্দর্যের, সেই রহস্যের কিছু আলো লাভ করেছেন। সেই রহস্যময় জগতের কিছু কথা তাল-লয়-ছন্দে অনুভব করেছেন। কিন্তু সেই রহস্যের খুব সামান্যই তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ধারণ করতে পেরেছেন– আর এই তাঁর আক্ষেপ।

তবু তাকে দেখবার
বুঝবার ... তীব্রতম
আলো – কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির যত রহস্য ও সৌন্দর্য উন্মোচন করুন না কেন, তিনি কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন না। তিনি প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে অবলোকন করতে চান, উন্মোচন করতে চান এর গোপন রহস্য ও আনন্দকে।

পাঠ-পরিচিতি

"আলো চাই" শীর্ষক কবিতাটি কবির 'প্রথম প্রহর' (১৯৬৫) শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুল রহস্য ও সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এই কবিতায় কবি তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির অন্তর্লোকে যেন সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির নিভৃত মর্মবাণী। এই মর্মবিচ্ছুরিত আলোর স্পর্শে কবি-হৃদয় সর্বদা উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত। কবি মনে করেন, আনন্দ-বেদনায়, নীরবতা ও শব্দময়তায়, ছন্দ-তাল-লয়ে প্রকৃতি চিরকালই ঐশ্বর্যময়। প্রকৃতির সেই বিপুল ঐশ্বর্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া একজন কবি নিজের অর্জন নিয়ে কখনোই তৃপ্তিলাভ করেন না। সেই অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে কবি সৃষ্টিশীল সত্তার কাছে শক্তি ও আলোর প্রার্থনা করেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "আলো চাই" কবিতায় কোন মাসে সবুজের সমারোহ দেখা যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. চৈত্র খ. বৈশাখ
গ. মাঘ ঘ. ফাল্গুন

২. "পত্রঝরা শাখা-বৃন্ত" কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

ক. সৃষ্টির খ. বেদনার
গ. মৃত্যুর ঘ. নবজাগরণের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

৩. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি "আলো চাই" কবিতার যে দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো–

ক. প্রকৃতির সৌন্দর্য
খ. প্রকৃতির রহস্য
গ. বাংলার ঐশ্বর্য
ঘ. বাংলার সৃষ্টিশীলতা

৪. উদ্দীপকের মাঝে "আলো চাই" কবিতায় কবির চাওয়ার কোন দিকটি অনুপস্থিত?

ক. সৌন্দর্যবোধ
খ. আত্মতৃপ্তি
গ. অতৃপ্তি
ঘ. প্রত্যাশা

সৃজনশীল প্রশ্ন

স্তবক-১ : পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়েÑ
তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

স্তবক-২ : জাগাও মুমূর্ষু ধরা প্রাণ।
ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি
আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্দ্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

ক. "আলো চাই" কবিতায় কবি বিমুগ্ধ নয়নে কী দেখেছেন?

খ. "পত্রঝরা শাখা-বৃন্ত-প্রাণে/কী অব্যক্ত অনুনয় ছিল"– উক্ত বক্তব্যের ইঙ্গিতপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের প্রথম স্তবকে "আলো চাই" কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা তুলে ধর।

ঘ. স্তবকদ্বয়ের সমন্বিত ভাবই "আলো চাই" কবিতার পূর্ণ প্রতিফলন– মন্তব্যটির যাথার্থ্য যাচাই কর।

আঠারো বছর বয়স
সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মায়ের নাম সুনীতি দেবী। ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত ছিলেন অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন। তিনি 'দৈনিক স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুকান্ত তাঁর কাব্যে অন্যায়-অবিচার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিপ্লব ও মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তাঁর কবিতা মুক্তিকামী বাঙালির মনে বিশেষ শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। 'ছাড়পত্র' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস'। অন্যান্য রচনা : 'মিঠেকড়া', 'অভিযান', 'হরতাল' ইত্যাদি। তিনি ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রতিভাবান এ কবির অকালমৃত্যু হয়।

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়–
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।
আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে

অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

শব্দার্থ ও টীকা

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ – এ বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এসময় থেকে তাকে এক কঠিন ও দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়।

স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি – অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।

বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি – নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে।

আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা – যৌবনে পদার্পণ করে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য – দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে।

সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে – তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ-প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে।

তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা – চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর	–	অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সেই মানুষের জীবনে বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও হয় গভীর।
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা	–	ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে এই বয়সের তরুণেরা।
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার	–	জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে	–	সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারার অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে	–	এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য।
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে	–	আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি– এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনে চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠ-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্যের “আঠারো বছর বয়স” কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘ছাড়পত্র’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। এদের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে হয়ে উঠতে পারে এরা ভয়ংকর।

কিন্তু এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রত– এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ১৯ খ. ২০

গ. ২১ ঘ. ২২

২. 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' Ñ কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি আঠারোর প্রত্যাশা করেছেন?

ক. ইতিবাচক খ. দুঃসাহস

গ. বয়স ঘ. তারুণ্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভারতবাসী। ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে এগিয়ে আসেন তাঁর অনেক অনুসারী। এঁদেরই একজন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি।

৩. প্রীতিলতার মাঝে "আঠার বছর বয়স" কবিতার কোন দিকগুলো ফুটে উঠেছে?–

i. তারুণ্য

ii. আত্মত্যাগ

iii. সর্বনাশের অভিঘাত

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i. ii ও iii

৪. উক্ত দিক নিচের কোন চরণযুগলে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে

খ. আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা

গ. প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে

ঘ. এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুজন ও সাধন সহপাঠ এবং লেখাপড়ায় বেশ ভালো। স্কুল জীবন পার হতে না হতেই সুজন মিশে যায় কিছু অসৎ বন্ধুর সাথে। লেখা-পড়ার পাঠ চুকে যায় ওখানেই। তার নাম শুনলে মানুষ আঁতকে উঠে। অপর দিকে সাধন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ভাষা আন্দোলন শুরু হলে সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে– মিছিলে সে নেতৃত্ব দেয়। সংগঠিত করে সহপাঠীদের, আর প্রতিজ্ঞা করে – জীবন দিয়ে হলেও মাতৃভাষার মান রক্ষা করবেই।

ক. কোন বয়সে দুঃসাহসেরা উঁকি দেয়?

খ. "বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে"– একথা দিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সুজনের মাঝে "আঠারো বছর বয়স" কবিতায় কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ঘ. উক্ত দিকটি কি "আঠারো বছর বয়স" কবিতার মূলভাব– তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বিচার কর।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শামসুর রাহমান

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাড়াতলি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মুখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। তিনি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'দৈনিক মর্নিং নিউজ'-এ সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরে 'দৈনিক বাংলা') পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায় কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। আজীবন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন; তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পক্ষে, ছিলেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ ও পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁর কবিতাকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নগর জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিরালোকে দিব্যরথ', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দি শিবির থেকে', 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা', 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' ইত্যাদি। এছাড়া গল্প-উপন্যাস, শিশু সাহিত্য ও অনুবাদ কর্মেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়—ফুল নয়, ওরা
শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
এ—রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,
যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়—
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।

আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রি-দিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের চোখ আজ আলোচিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়। [*সংক্ষেপিত*]

শব্দার্থ ও টীকা

আবার ফুটেছে দ্যাখো ...

আমাদের চেতনারই রং	– প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন ভাষা-শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। তাই একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে-স্তবকে।
মানবিক বাগান	– মানবীয় জগৎ। মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।
কমলবন	– পদ্মবন। কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।

বুঝি তাই উনিশশো ...

থাবার সম্মুখে। – ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন।

সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ – ফুল বলতে এখানে বাংলা ভাষা বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

“ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের ‘নিজ বাসভূমে’ কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” দেশপ্রেম, গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনার কবিতা।

১৯৬৯-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, কবিতাটি সেই গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত। জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ১৯৬৯-এ। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথে। শামসুর রাহমান বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক শিল্পভাষ্য রচনা করেছেন এই কবিতায়।

কবিতাটিতে দেশমাতৃকার প্রতি জনতার বিপুল ভালোবাসা সংবর্ধিত হয়েছে। দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদান ও আত্মাহুতির প্রেরণাকে কবি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন। কবিতাটি একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মাহুতির মাহাত্ম্যে প্রগাঢ়তা লাভ করেছে। গদ্যছন্দ ও প্রবহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯” কবিতায় বর্ণমালাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

ক. নক্ষত্র　　খ. রক্ত

গ. ফুল　　ঘ. রৌদ্র

২. "আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে"– চরণটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দিকটি তুলে ধরে?

ক. গণআন্দোলন
খ. ভাষা আন্দোলন
গ. স্বাধীনতা আন্দোলন
ঘ. স্বদেশি আন্দোলন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

১৯৭১ সালে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন মতিউর রহমান, মোস্তফা কামাল, মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

৩. উদ্দীপকের ত্যাগী মানুষদের প্রতিচ্ছবি "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতায় যাদের নির্দেশ করে তারা হলেন–

i. সালাম
ii. বরকত
iii. দুঃখিনী মাতা

কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. ওই ব্যক্তিদের আত্মত্যাগের মূলমন্ত্র কী ছিল?

ক. আদর্শ
খ. দেশপ্রেম
গ. বিদ্রোহ
ঘ. স্বাধিকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

কপালে কব্জিতে লাল সালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক
হাতের মুঠোয় মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্নবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, ভবঘুরে
আর তোমাদের মত শিশু পাতা কুড়ানিরা দল বেঁধে।

ক. শহরের পথে থরে থরে কী ফুটেছে ?

খ. "এ–রঙের বিপরীত আছে অন্য রং" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতার যে সাদৃশ্য নির্দেশ করে তার পরিচয় দাও।

ঘ. 'উদ্দীপকের বক্তব্য "ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯" কবিতার খণ্ডাংশ'– যৌক্তিকতা দেখাও।

তোমার আপন পতাকা
হাসান হাফিজুর রহমান

কবি-পরিচিতি

হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি জামালপুরে তাঁর নানাবাড়িতে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার কুলাকান্দি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুর রহমান এবং মায়ের নাম হাফিজা খাতুন। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। পরে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে বিএ পাস করেন।

কর্মজীবনে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকরি– এমনি নানা পেশায় তিনি যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য-সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ তিনিই সম্পাদনা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি ষোল খণ্ডে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংকলন ও সম্পাদনা করেন। কেবল কবিতা নয় প্রবন্ধ, গল্পসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল দৃপ্ত পদচারণা। স্বদেশ, সমকাল এবং সাধারণ মানুষ তাঁর সাহিত্যচর্চার মুখ্য প্রণোদনা। সাহিত্য ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্যে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : ‘বিমুখ প্রান্তর’, ‘আর্ত শব্দাবলি’, ‘অন্তিম শরের মতো’, ‘যখন উদ্যত সঙ্গীন’, ‘বজ্রে চেরা আঁধার আমার’, ‘শোকার্ত তরবারি’ প্রভৃতি।

তিনি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

এবার মোছাব মুখ তোমার আপন পতাকায়।
হাজার বছরের বেদনা থেকে জন্ম নিল
রক্তিম সূর্যের অধিকারী যে শ্যামকান্ত ফুল
নিঃশঙ্ক হাওয়ায় আজ ওড়ে, দুঃখভোলানিয়া গান গায়।
মোছাব তোমার মুখ আজ সেই গাঢ় পতাকায়।
ক্রূর পদাতিক যত যুগে যুগে
        উদ্ধত পায়ের দাগ রেখে গেছে কোমল পলির ত্বকে,
বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে
        খুরে খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনীয়া মাটি,
লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কত
        অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,
বিদীর্ণ বুক নীল বর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাংলাভূমি
        নত হয়ে গেছে মুখ ক্ষোভে ও লজ্জায়।
এবার মোছাব সেই মুখ শোকাক্রান্ত, তোমার আপন পতাকায়।
কে আসে সঙ্গে দেখ দেখ চেয়ে আজ :
কারখানার রাজা, লাঙ্গলের নাবিক,

উত্তাল ঢেউয়ের শাসক উদ্যত বৈঠা হাতে মাল্লা দল,
এবং কামার কুমোর তাঁতি। এরাতো সবাই সেই
মেহনতের প্রভু, আনুগত্যে
শানিত রক্তে ঢল হয়ে যায় বয়ে তোমার শিরাময় সারা পথে পথে।
দুহাতে সরায় দ্রুত শহরের জটিল পঙ্কিল,
মধ্যবিত্ত অনড় আবিল। একে একে সকলকে নামায় মিছিলে।
ডাকে আপামর ভাই বোন। একসাথে মিলে নিশ্ছিদ্র
বিশাল শিলাদৃঢ় পাহাড় বানায়।
সেই কোটি হাত এক হাত হয়ে
মোছাবে তোমার মুখ তোমার আপন পতাকায়।
সমস্ত শূন্যতায় আজ বিশুদ্ধ বাতাস বয়ে যায়
আকাশ চাঁদোয়া জ্বলে রাহুমুক্ত ঘন নীলিমায়।
অকলুষ বাংলাভূমি হয়ে ওঠো রাতারাতি আদিগন্ত তীর্থভূমি।
অন্তহীন মিছিলের দেশ,
সারি সারি মানুষের আকারে হলে মূর্তিময়ী
সমস্ত স্বদেশ আজ রাঙা রাজপথে।
দিবালোক হয়ে ফোটে প্রাঞ্জল বিপ্লব
সাত কোটি মুখ হাসে মৃত্যুর রঙিন তীর হাতে নিয়ে।
শ্রেণিবদ্ধ এই ভিড়ে সকলেই সবার আগে
একবার শত্রুকে শেষ দেখা দেখে নিতে চায়।
দুঃসাহস চমকায় বরাভয় হিল্লোলিত তোমার আপন পতাকায় ॥
তুমি আছো কাজল দিঘির পাড়ে, কোকিলের মধুক্ষরা স্বরে,
হরিৎস্বপ্নে ফুলে-ওঠা প্রান্তরের উর্বর আদরে
সিংহপ্রাণ গিরিবর্ত্মে এবং বঙ্গোপসাগর
নামক আকুল ঐ অস্থিরতার তুমুল গভীরে
আছো দিন-রাত্রি অগ্নিমুখ অশনির অশেষ অধীরে।
তুমি আছো আজো, ছিলে চিরকাল।
বিশ্বের সেরা সুন্দরী বলে লুটেছ প্রবাদের খ্যাতি
যদিও রত্নখচা তোমার সৌন্দর্য সেই অবিরত তোমারই হয়েছে কাল।

তোমাকে মুঠোতে ভরে আনন্দের ঝুমঝুমি
বাজাতে এসেছে যারা
সুকালের ভোজসভার ক্ষুধার্ত অতিথি
রক্ত নিয়ে মুখে ধিক্কারে ধিক্কারে পলাতক তারা,
আবহমান বাংলার বর্বরতম দখলদারও দেখ আজ
কুৎসিততম আঁধারে নির্ঘাৎ হবে লীন।
তুমি ছিলে অমলিন, আজো আছ অমলিন।
শত কোটি লাঞ্ছনার তিক্ত দাগ সারা দেহে সয়ে
আজো তুমি মাতা, শুচিশুদ্ধ মাতা সাত কোটি সংশপ্তক
সন্তানের অকাতর তুমি মাতা।
প্রেম অবারিত হবে বিজয়ের ধারাজলে, রৌদ্র, জোছনায়।
শত শতাব্দীর অবগুণ্ঠিত আশা পূর্ণ করে—
মোছাব তোমায় মুখ তোমারই আপন পতাকায়॥

শব্দার্থ ও টীকা

রক্তিম সূর্যের অধিকারী যে শ্যামকান্ত ফুল – কবি এখানে আমাদের পতাকার সবুজ শ্যামল জমিনে ঘেরা লাল অংশকে বোঝাতে চেয়েছেন।

পদাতিক – স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য।

অসুর – ভয়ংকর বিপজ্জনক শত্রু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিদীর্ণ বুক নীল বর্ণ হয়ে গেছ তুমি – কষ্টের রংকে নীল বলে সাধারণত অভিহিত করা হয়। এখানে স্বদেশের ওপর যুগে যুগে বহিঃশক্তির যে নির্যাতন আগ্রাসন সংঘটিত হয়েছে তার পরিণতিতে দুঃখ-ক্লিষ্ট বাংলাকে বোঝানো হয়েছে।

কারখানার রাজা – শ্রমিকরাই কারখানার প্রাণ। তাই তাদের রাজা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

লাঙলের নাবিক – সমুদ্রপথে নাবিক যেমন জলের বুক কেটে নতুন পথ আবিষ্কারে ব্রতী হয় তেমনি বাংলার কৃষকও লাঙলের ফলা দিয়ে মাটি চিরে সমৃদ্ধ ফসলভরা আগামী দিনের পথ তৈরিতে সচেষ্ট হয়।

এরা তো সবাই সেই মেহনতের প্রভু – দেশের শ্রমজীবী মানুষকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের সমাজে মেহনতি

		মানুষ তাদের প্রাপ্য সম্মান পায় না। অনেক সময় তাদেরকে অন্যের দাসত্ব করতে হয়। কিন্তু কবি এখানে খেটে খাওয়া মানুষের শ্রমের ওপর তাদেরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেছেন।
আনুগত্যে শানিত রক্তে ঢল হয়ে যায় বয়ে তোমার শিরাময় সারা পথে পথে	–	নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীর জলকে শ্রমিকের শ্রমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।
দুহাতে সরায় দ্রুত শহরের জটিল পঙ্কিল	–	মেহনতি মানুষের কথা বলতে গিয়ে কবি এখানে শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কথা স্মরণ করেছেন।
মধ্যবিত্ত অনড় আবিল। একে একে সকলকে নামায় মিছিলে	–	এদেশের শ্রমজীবী মানুষের যে লড়াকু মানসিকতা রয়েছে তার বিপরীতে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন মধ্যবিত্তের স্থবিরতা, আপসকামিতা। কিন্তু এই দুর্বলতাকে পরাভূত করেছে তাদের প্রতি শ্রমজীবী মানুষের উদাত্ত আহ্বান। তাই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মিছিলে এক হয়ে গেছে, স্বদেশের মুক্তি সকলের কাছে অভিন্ন লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।
আপামর	–	পামর তথা নিচ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিসহ সকলে। অর্থাৎ কাউকেই বাদ না দিয়ে।
চাঁদোয়া	–	কাপড়ের তৈরি চিত্রবিচিত্র ছাউনি, সামিয়ানা।
রাহু	–	ক্ষতিকারক ব্যক্তি বা শত্রু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
দিবালোক হয়ে ফোটে প্রাঞ্জল বিপ্লব	–	এটি একটি চিত্রকল্প। সূর্যের আলো ফুটে দিনের শুরু হয়। কবি সেই আলো ফোটার সঙ্গে বিপ্লবের প্রাণময়তাকে তুলনা করেছেন।
হরিৎ	–	সবুজ
গিরিবর্ত্ম	–	পাহাড়ি পথ।
সংশপ্তক	–	যে যোদ্ধা এই মর্মে শপথ নেয় যে, হয় যুদ্ধে জয়ী হবে অথবা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। মহাভারতে কৃষ্ণের নারায়ণী সেনাদলে সংশপ্তক যোদ্ধা ছিল, যারা মরণপণ করে যুদ্ধ করত।

পাঠ-পরিচিতি

"তোমার আপন পতাকা" কবিতাটি হাসান হাফিজুর রহমানের 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে হাজার বছরের যন্ত্রণা ঘুচিয়ে বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যুদয়কে কবি দ্যোতিত করেছেন এই কবিতায়। স্বাধীন দেশের একান্ত আপন যে স্বাধীন পতাকা, তা দিয়েই হাজার বছর ধরে পরিশ্রান্ত বঙ্গজননীর সকল ক্লান্তি মুছিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে।

ইতিহাস-সচেতন কবি অনুভব করেন কীভাবে দীর্ঘকাল ধরে বাংলা অঞ্চল বারংবার আক্রান্ত হয়েছে। শত্রুসেনার অস্ত্রের ঝনঝনানি আর তাদের দম্ভপূর্ণ পদভারে বেদনা-নীল হয়েছে এদেশের মাটি, প্রকৃতি এবং প্রাকৃত জীবন। কিন্তু এ-ও সত্য যে, শত্রুর হুংকার কখনোই এদেশে চিরস্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। কেননা, এদেশের শ্রমিক, কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, মাঝি– প্রভৃতি সাধারণ মানুষ তাদের বুকের রক্ত ঢেলে সজীব করে রেখেছে এই মাটির প্রাণস্পন্দনকে। তারা যুগে যুগে মিছিলের মতো সমবেত হয়েছে, দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছে, কোটি হাত এক হয়ে গিয়ে সেই হাতে বাংলা মায়ের মুখের সবটুকু শ্রান্তি মুছে দিতে চেয়েছে। একই পতাকাতলে মিলিত হওয়ার প্রেরণায় উনিশশো একাত্তরে উজ্জীবিত হয়েছিল এ দেশের মানুষ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তার উত্তাপ। সে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে কবির অনুভবে। কবিচৈতন্যে ভিড় করে মিছিল, লড়াই, রক্তে রাঙা রাজপথ আর শত্রুকে রুখে দেওয়ার দুরন্ত সাহসে ভরা দৃপ্ত মানুষের মুখ। সেই সংগ্রামকে তিনি প্রতিবিম্বিত হতে দেখেন লাল-সবুজের পতাকায়।

সংগ্রামী অনুভবের পাশাপাশি কবির অনুভবে ধরা পড়ে আবহমান বাংলার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ। বাংলার কাজল দিঘি, কোকিলের গান, সবুজ ফসল ভরা মাঠ, পাহাড়ি পথ কিংবা উচ্ছ্বসিত সমুদ্র– বহুবৈচিত্র্যের সমন্বয়ে যে স্বদেশ, তাকে কবি প্রতীকায়িত করে তুলেছেন স্বাধীন দেশের আপন পতাকায়। এই তিলোত্তমা স্বদেশের অমিত সৌন্দর্যই শত্রুপক্ষকে এদেশ আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছে। এ দেশের সাহসী জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে শত্রুরা পালাতে বাধ্য হয়েছে। মুক্ত হয়েছে স্বদেশ। নতুন আশায় নতুন দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন কবি। তাঁর একান্ত প্রত্যয় – অনেক রক্তের বিনিময়ে পাওয়া পতাকার মধুর স্পর্শে দূর হয়ে যাবে দেশমাতৃকার সকল বেদনা।

কবিতাটিতে হাসান হাফিজুর রহমান দেশ আর কাঁধে কাঁধ-মেলানো অজস্র মানুষকে একই পতাকার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। আর তাই 'পতাকা' শব্দবন্ধটি এই কবিতায় ঐক্য ও প্রত্যাশা পূরণের প্রতীক। পুরো কবিতাতেই স্বদেশকে শিল্পান্বিত অবয়বে উপস্থাপনের জন্য কবি একের পর এক চিত্রকল্পের মালা গেঁথেছেন। আর শিল্পকৌশলের সুসমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতাটি সমুন্নত হয়েছে নান্দনিক উচ্চতায়।

কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এতে ৮+১০, ১০+৬ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্বের মাত্রা বিভাজন পরিলক্ষিত হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিঃশঙ্ক হাওয়ায় আজ কী ওড়ে?

ক. শ্যামকান্ত ফুল খ. বন্দুক কামান

গ. আকাশ চাঁদোয়া ঘ. কোটি সংশপ্তক

২. 'ক্রূর পদাতিক' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

i. স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠুর সৈন্যদল

ii. বাংলায় আগত যুগ-যুগান্তরের শাসক-শোষকশ্রেণি

iii. বাংলার সম্পদ-সৌন্দর্য লুণ্ঠনকারী শত্রুসেনা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও–

ওরা কারা বুনোদল ঢোকে
এরি মধ্যে (থামাও থামাও), স্বর্ণশ্যাম বুক ছিঁড়ে
অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ

৩. "তোমার আপন পতাকা" কবিতার যে দিকগুলো উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো–

i. বাংলায় শত্রুসেনার আগমন
ii. বাংলার মানুষের প্রতিবাদী সত্তা
iii. যুগে যুগে আক্রান্ত বাংলা-মা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. নিচের কোন চরণযুগলে উদ্দীপকের সান্ত্রী কাপুরুষদের পরাজয়ের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কতো
অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,

খ. ডাকে আপামর ভাই বোন। এক সাথে মিলে নিশ্ছিদ্র
বিশাল শিলাদৃঢ় পাহাড় বানায়।

গ. তুমি আছো কাজল দিঘির পাড়ে, কোকিলের মধুক্ষরা স্বরে,
হরিৎস্বপ্নে ফুলে-ওঠা প্রান্তরের উর্বর আদরে।

ঘ. তুমি ছিলে অমলিন, আজো আছ অমলিন
শত কোটি লাঞ্ছনার তিক্ত দাগ সারা দেহে সয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন

ছোট ভাইটিকে আমি কোথাও দেখি না
নরম নোলক পরা বোনটিকে আজ আর কোথাও দেখি না
কেবল পতাকা দেখি, কেবল উৎসব দেখি, স্বাধীনতা দেখি
তবে কি আমার ভাই আজ ঐ স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন তিমিরের বেদিতে উৎসব?

ক. সাত কোটি সন্তানকে কী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে?

খ. "তুমি ছিলে অমলিন, আজো আছ অমলিন"– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের কবির জিজ্ঞাসা "তোমার আপন পতাকা" কবিতার যে দিকটিকে ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ.উদ্দীপকটি "তোমার আপন পতাকা" কবিতার খণ্ডপ্রকাশ মাত্র– বিশ্লেষণ কর।

হাড়

আলাউদ্দিন আল আজাদ

কবি-পরিচিতি

আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম গাজী আবদুস সোবহান ও মায়ের নাম আমেনা খাতুন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সম্মান ও ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০-এ তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। সরকারি কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এছাড়া মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসে সংস্কৃতি-উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হয়েছেন। তবে কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মনোজাগতিক বিকার-বিকৃতি তাঁর কথাসাহিত্যে নিগূঢ় জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে তিনি ঐকান্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে আঁকতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : 'মানচিত্র', 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ', 'সূর্যজ্বালার সোপান', 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি', 'নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ', 'আমি যখন আসবো', 'সাজঘর' ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার, একুশে পদক ইত্যাদিতে ভূষিত হয়েছেন।

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের তেসরা জুলাই আলাউদ্দিন আল আজাদ মৃত্যুবরণ করেন।

লাল পলাশের ভস্মস্তূপে কিসের জ্বালা
স্তব্ধ অধীর বজ্রগর্ভ মেঘের মতো?
শিবির-সীমায় মনের ছায়ায় ইতস্তত
ছড়ায় সে তার কূট-মন্ত্রণা ঘৃণায় ঢালা
দুই শতকের সেই একদিন মনে কি পড়ে?
মিরজাফরের গুলির শিখায়, সমুদ্ধত
নিভলো তোমার দিনের সূর্য দিগন্তরে
দূর গোধূলির সেই একদিন মনে কি পড়ে
মনে কি পড়ে?
নিভলো তোমার ঘরের প্রদীপ পথের বাতি
নিভলো সহসা মহাশূন্যের লক্ষ তারা
কালো রাত্রির যাত্রিক হলে, লক্ষ্যহারা
সড়কে সড়কে ঝড়-ঝঞ্ঝাই তোমার সাথি।
সমুখে কোথাও এমন সে দেশ আছে কি ভাই
যেখানে আলোর সম্ভারে হাসে বসুন্ধরা?

স্বদেশ আমার চক্র-রাতের মুঠোয় ভরা
গ্রাম জনপদ কাঁপে বর্গীর অশ্বখুরে
সোনার শস্য পোড়ে ছারখার; দৃষ্টি পুড়ে
হলো সঙ্গীন, তাই নেই আর অশ্রুঝরা
টোটায় ঝরে
অযুত প্রাণের অগ্নিশিখার সূর্য-কুঁড়ি
ফৌজের হাঁকে কাঁপে থরথর দস্যুপুরী
নিমেষে ছড়ায় তারই আওয়াজ দিগন্তরে
মনে কি পড়ে?
রক্ত ঝরে
অগ্নির মতো বাঁশের কেল্লা বেদির পরে
রক্ত ঝরাই ফাঁসির মঞ্চে দ্বীপান্তরে
ঝরেছে সকল রক্ত। এখন কখানা হাড়ে
ঝকঝক করে তীব্র তীক্ষ্ণ বর্শা-ফলা
নতুন দস্যু আসে যদি, দেশ দেবোনা তারে
ইস্পাত-হাড়ে গড়েছি বজ্র বহ্নি-জ্বালা ॥

শব্দার্থ ও টীকা

ভস্মস্তূপ – ছাইয়ের গাদা।

বজ্রগর্ভ মেঘের মতো – বজ্র ধারণ করে আছে এমন মেঘের অনুরূপ।

মিরজাফর – মির জাফর আলি খাঁ ছিলেন নবাব আলীবর্দি খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে তিনি সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটান। তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়।

মিরজাফরের গুলির শিখায় ... মনে কি পড়ে। – মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ সালে বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ বাংলার স্বাধীন সূর্য অস্তমিত হয়। বাংলাদেশ দুইশ বছরের পরাধীনতা বরণ করে। সে দিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা এদেশের দেশপ্রেমিক কোনো নাগরিকেরই ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

যাত্রিক – যাত্রা সম্বন্ধীয়। যাত্রাযোগ্য। যাত্রাকারী।

নিভলো তোমার ঘরের প্রদীপ ... ঝড় ঝঞ্ঝাই তোমার সাথি – অপরিসীম শক্তি, সাহস ও শৌর্যবীর্য থাকা সত্ত্বেও মিরজাফর প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশির যুদ্ধে বাংলায় স্বাধীনতা

	সূর্য অস্তমিত হয়। সুদীর্ঘ অন্ধকারের মধ্যে পতিত হয় দেশমাতৃকা। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে পুরো দেশ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকট তৈরি করা হয় সর্বত্র। এই পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য লড়াই হয়েছে কিন্তু ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র, শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নে তাঁদের সংগ্রাম বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।
বর্গী	– ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যরা বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে লুণ্ঠন, হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও করে চলছিল। এদের বর্গী বলা হয়। এরা অস্ত্র বহন করত এবং দ্রুতগতির ঘোড়ায় চড়ে আক্রমণ চালাত। বর্গীর অত্যাচারে মানুষ সন্ত্রস্ত ও ভীত-বিহ্বল হয়ে উঠেছিল।
টোটা	– বন্দুকের কার্তুজ।
বাঁশের কেল্লা	– ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার জন্য ১৮৩১ সালের ২৩এ অক্টোবর তিতুমির একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। অস্ত্রশস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁর অনুসারীদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি এই কেল্লা তৈরি করেন।
নতুন দস্যু আসে যদি ... বজ্র বহ্নি-জ্বালা	– বাংলার মানুষ এখন প্রতিরোধের শক্তিতে বলীয়ান। দীর্ঘ সংগ্রাম বিপ্লব-বিদ্রোহ ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এখন বাংলার জনগণ সমৃদ্ধ। তার ইস্পাতদৃঢ় হাড়ে বজ্রের সংক্ষোভ। কোনো দস্যু আর এদেশ দখল করতে পারবে না। কোনো বিদেশি শত্রুর কাছে পরাভব মানবে না এদেশের কোটি কোটি মানুষ।

পাঠ-পরিচিতি

আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত "হাড়" শীর্ষক কবিতাটি তাঁর 'মানচিত্র' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। দেশপ্রেমমূলক এই কবিতাটির মধ্যে এদেশের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ও তাৎপর্য উন্মোচিত হয়েছে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকে যে শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের পটভূমিতে বিপুল বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল কবিতাটিতে সেই সংগ্রামের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সুখ-সমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্যময় এবং প্রাণৈশ্বর্যে ভরপুর এই সুন্দর দেশটি বর্গীর আক্রমণ থেকে শুরু করে অসংখ্যবার শত্রুর আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিপর্যস্ত হয়েছে এদেশের সহজ-সুন্দর জনজীবন, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। দেশের শান্তিকামী মানুষ একেক সময় ফুঁসে উঠেছে এবং সংগ্রামে সংগ্রামে, যুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে দখলদার বাহিনীকে। বিস্ময়কর শক্তি-সাহস এবং শৌর্যবীর্য ও সমৃদ্ধিতে এখন এদেশের মানুষ আত্মবিশ্বাসী। কোনো বিদেশি শক্তি এদেশকে আক্রমণ করার সাহস আর পাবে না। এখন এ দেশের মানুষ ইস্পাতদৃঢ়, হাড়ে তার বজ্রের শক্তি। এদেশ আর পরাধীন করতে পারবে না কেউ। দখলদারদের তছনছ করে দেওয়ার মতো 'বজ্র বহ্নি-জ্বালা' জন্ম নিয়েছে এ দেশের বুকের মধ্যে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "হাড়" কবিতায় 'বাঁশের কেল্লা'কে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক. অগ্নির খ. বর্শার

গ. ইস্পাতের ঘ. বজ্রের

২. 'নিভলো তোমার দিনের সূর্য দিগন্তরে'—বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. পলাশির প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যাওয়া

ii. ইংরেজদের শাসন-শোষণ-নিপীড়নে বিপর্যস্ত হওয়া

iii. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুত হওয়া

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ

৩. কবিতাংশের লেনিনের সাথে "হাড়" কবিতায় কার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. বর্গীর খ. মিরজাফরের

গ. তিতুমিরের ঘ. স্বয়ং কবির

৪. যে চেতনাগত দিক থেকে তারা সাদৃশ্যপূর্ণ তা হলো–

i. স্বাদেশিকতা

ii. বিশ্বাসঘাতকতা

iii. প্রতিবাদমুখরতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাশে
বুঝছনি ভাই বুঝছনি, আসল কথা বুঝছনি
এক গেরামের গরিব চাষি কালা মিয়া নাম
সবার পেটে ভাত জুটাইতে ক্ষেতে ঝরায় ঘাম
ও তার ছাওয়াল কান্দে ক্ষুধার জ্বালায়
মহাজনরা হাসে।
ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাশে।

ক. বর্গীর অশ্বখুরে কী কাঁপে?

খ. 'কালো রাত্রির যাত্রিক হলে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. কবিতাংশের বাগডাশ ও মহাজন "হাড়" কবিতায় কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চাষি কালা মিয়ার দারিদ্র্যাবস্থা থেকে উত্তরণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় "হাড়" কবিতায় —মন্তব্যটির যাথার্থ্য যাচাই কর।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কবি-পরিচিতি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান)-সহ এমএ পাস করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী এবং ১৯৮৪-তে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

তাঁর কবিতার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এই বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : 'সাত নরীর হার', 'কখনো রং কখনো সুর', 'কমলের চোখ', 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি', 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা', 'আমার সময়' প্রভৃতি। এছাড়া ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
আমি উচ্চারিত সত্যের মতো

স্বপ্নের কথা বলছি।
উনোনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
যে গাভীর পরিচর্যা করে
জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
আমি তোমাদের বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।

[*সংক্ষেপিত*]

শব্দার্থ ও টীকা

কিংবদন্তি – জনশ্রুতি। লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।

পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত – মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ, শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্ত মানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ের বীরোচিত সাহস দেখায়নি।

শ্বাপদ	–	হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু।
উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা	–	আগুনে সবকিছু শুচি হয়ে ওঠে। তাই আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলে আলোয় ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা জানাতে উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।
বিচলিত স্নেহ	–	আপনজনের উৎকণ্ঠা। মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনরা উদ্বিগ্ন হন। ভালোবাসা আর শঙ্কা একসঙ্গে মিশে যায়।
সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা	–	সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা; কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'-র নাম কবিতা। রচনাটিতে বিষয় ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব রয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে, রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস; এই জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষঙ্গসমূহ। তিনি এই কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সোচ্চার হন। কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয় একটি বিশেষ শব্দবন্ধ 'কবিতা'। কবি তাঁর পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। কবির বর্ণিত এই ইতিহাস মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস; বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস। 'কবিতা' ও সত্যের অভেদকল্পনার মধ্য দিয়ে কবি নিয়ে আসেন মায়ের কথা, বোনের কথা, ভাইয়ের কথা, পরিবারের কথা। কবি এ-ও জানেন মুক্তির পূর্বশর্ত যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে হয়। ভালোবাসার জন্য, তাদেরকে মুক্ত করবার জন্যই তাদের ছেড়ে যেতে হয়। এই অমোঘ সত্য কবি জেনেছেন আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস থেকে।

কবিতাটির রসোপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো এর আঙ্গিক বিবেচনা। এক্ষেত্রে, প্রথমেই যে বিষয়টি পাঠককে নাড়া দেয় তা হলো, একই ধাঁচের বাক্যের বারংবার ব্যবহার। কবি একদিকে "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" পঙ্‌ক্তিটি বারংবার প্রয়োগ করেছেন, অপরদিকে "যে কবিতা শুনতে জানে না/ সে..." কাঠামোর পঙ্‌ক্তিমালার ধারাবাহিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে কবিতা আর মুক্তির আবেগকে একত্রে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন। এখানে 'কিংবদন্তি' শব্দবন্ধটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের প্রতীক। কবি এই নান্দনিক কৌশলের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন গভীরতাসঞ্চারী চিত্রকল্প। একটি কবিতার শিল্পসার্থক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত হলো হৃদয়স্পর্শী চিত্রকল্পের যথোপযুক্ত ব্যবহার। চিত্রকল্প হলো এমন শব্দছবি যা কবি গড়ে তোলেন এক ইন্দ্রিয়ের কাজ অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করিয়ে কিংবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত আশ্রয়ে; আর তা পাঠক-হৃদয়ে সংবেদনা জাগায় ইন্দ্রিয়াতীত বোধের

প্রকাশসূত্রে। চিত্রকল্প নির্মাণের আরেকটি শর্ত হলো অভিনবত্ব। এ সকল মৌল শর্ত পূরণ করেই আলোচ্য কবিতায় চিত্রকল্পসমূহ নির্মিত হয়েছে। কবি যখন বলেন : "কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা"; তখন এই ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনাই সঞ্চারিত হয়। নিবিড় পরিশ্রমে কৃষকের ফলানো শস্য একান্তই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি অনুষঙ্গ। কিন্তু এর সঙ্গে যখন কবিতাকে অভেদ কল্পনা করা হয় তখন কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে একে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। সার্বিক বিবেচনায় কবিতাটি বিষয় ও আঙ্গিকের সৌকর্যে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।

কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল?

ক. রক্তজবার　　খ. পলিমাটির

গ. শস্যদানার　　ঘ. শ্বাপদের

২. "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি"— বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন—

i. বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য

ii. বাঙালির সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার ইতিকথা

iii. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির শাশ্বত প্রতিবাদী সত্তা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?'

৩. কবিতাংশের "বাংলার আলপথ"–এর সাথে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চেতনা হলো-

i. ইতিহাসমনস্কতা

ii. ঐতিহ্যপ্রিয়তা

iii. সংগ্রামশীলতা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা ব্যক্ত হয়েছে নিচের কোন চরণে?
   ক. সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
   খ. সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
   গ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
   ঘ. যে কর্ষণ করে/শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি
মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি

ক. প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে?

খ. 'ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. 'উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথার' সাথে উদ্দীপকের চেতনার ঐক্য নির্দেশ কর।

ঘ. উক্ত ঐক্যের প্রেক্ষাপট "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতায় কতটুকু সার্থক– মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
সৈয়দ শামসুল হক

কবি-পরিচিতি
সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭এ ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। সৈয়দ হক প্রথমে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। পরে তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, কাব্যনাট্য ও শিশু সাহিত্যের লেখক হওয়ায় তিনি সব্যসাচী লেখক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবেও তিনি খ্যাত। মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা। সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই নিরীক্ষাপ্রিয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : 'বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা', 'প্রতিধ্বনিগণ', 'পরাণের গহীন ভিতর', 'রজ্জুপথে চলেছি'। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'গণনায়ক', 'নূরলদীনের সারাজীবন', 'এখানে এখন', 'ঈর্ষা' প্রভৃতি তাঁর কাব্যনাটক। সৈয়দ শামসুল হক বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আদমজি সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং একুশে পদকসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার
তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস
দিয়ে এত বড় চাঁদ?
অতি অকস্মাৎ
স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?
গোল হয়ে আসুন সকলে,
ঘন হয়ে আসুন সকলে,
আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে।
অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।
এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।
কালঘুম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,
রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
১১৮৯ সনে।

আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে;
যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,
তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ভেতরে?
কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে?
সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে।
নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"

শব্দার্থ ও টীকা

নিলক্ষা	–	দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না	–	সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
স্তব্ধতার দেহ	–	এখানে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।
প্রপাত	–	নির্ঝরের পতনের স্থান। জলপ্রপাত।
হানা দেয়	–	আক্রমণ করে। আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত।
কালঘুম	–	মৃত্যু; চিরনিদ্রা।
মরা আঙিনায়	–	মৃত্যু নিথর অঙ্গনে।
বাহে	–	বাপুহে। দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধনবিশেষ।

কোনঠে – কোথায়।

পাঠ-পরিচিতি

"নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।

নাটকটির প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধর আবেগঘন কাব্যিক বর্ণনার মাধ্যমে দর্শকদের সঙ্গে নাট্যকাহিনির সংযোগ স্থাপন করেছেন। নূরলদীন এক ঐতিহাসিক চরিত্র। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীনের সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে।

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে দীর্ঘ নয় মাস যখন এই বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়, যখন শকুনরূপী দালালের আলখাল্লায় ছেয়ে যায় দেশ; যখন বাঙালি হারায় তার স্বপ্ন ও বাক্-স্বাধীনতা, যখন স্বজনের রক্তে ভেসে যায় ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা– তখন মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনকে – এই চেতনাই কবিতাটিতে সৈয়দ শামসুল হক তুলে ধরতে চেয়েছেন। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে [১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ] নূরলদীনের ডাকে মানুষ যেভাবে জেগে উঠেছিল, এখনও ঠিক সেইভাবে জেগে উঠবে বাংলার জন-মানুষ– এটাই কবির বিশ্বাস। এভাবে কবির শিল্পভাবনায় নূরলদীন ক্রমান্বয়ে এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে পরিণত হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে– অংশগ্রহণ করে সমকালীন সকল আন্দোলন-সংগ্রামে। তাই কবির মনে হয়– অভাগা মানুষ জেগে উঠে পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অন্যায় যখন নূরলদীন দেবে ডাক– "জাগো, বাহে, কোনঠে সবাই।"

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নূরলদীনের ডাকে কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছিলেন?

ক. ১৭৮২ খ. ১৭৮৭

গ. ১৮৫৭ ঘ. ১৯৭১

২. "নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতায় ফুটে উঠেছে—

i. নূরলদীনের প্রতিবাদী চেতনায় উদ্ভাসন

ii. বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের আহ্বান

iii. বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলার আপদে আজ লক্ষ কোটি বীর সেনা
ঘরে ও বাইরে হাঁকে রণধ্বনি, একটি শপথে
আজ হয়ে যায় শৌর্য ও বীরগাথার মহান

সৈনিক, যেন সূর্যসেন, যেন স্পার্টাকাস স্বয়ং সবাই।

৩. উদ্দীপকে সবার সূর্যসেন ও স্পার্টাকাস হওয়ার ব্যাপারটি "নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতার যে দিকগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত তা হলো–

i. অধিকার আদায়ে নবজাগরণ

ii. পূর্বসূরির আহ্বান

iii. সকলের সমন্বিত প্রয়াস

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. সম্পর্কিত দিকের প্রেক্ষাপট নির্মাণে কোন চরণটি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।

খ. অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।

গ. নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।

ঘ. জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?

সৃজনশীল প্রশ্ন

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা।

ক. নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল?

খ. 'যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়'– বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. কবিতাংশের কবির চেতনার সঙ্গে নূরলদীনের চেতনাগত সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রেক্ষাপটগত সাদৃশ্য থাকলেও কবিতাংশটিতে "নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতায় কবির অভিব্যক্তির সার্থক রূপায়ণ ঘটেনি– মন্তব্যটির যাথার্থ্য যাচাই কর।

ছবি
আবু হেনা মোস্তফা কামাল

কবি-পরিচিতি

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এম. শাহজাহান আলী, মাতা খালেকুননেসা। বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন একই সঙ্গে খ্যাতিমান অধ্যাপক, সফল গীতিকার, সম্মোহনক্ষম বাগ্মী ও মননশীল সাহিত্য-সমালোচক। সমগ্র শিক্ষাজীবনে তিনি সুপরিচিত ছিলেন কৃতী ছাত্র হিসেবে। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর কর্মজীবন। তিনি ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালে তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। আবু হেনা মোস্তফা কামালের রোমান্টিক কবিস্বভাব তাঁর কবিতাকে করেছে নন্দনশোভন। শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মিতা তাঁর কবিতার প্রধান সম্পদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ : 'আপন যৌবন বৈরী', 'যেহেতু জন্মান্ধ', 'আক্রান্ত গজল'; গীতি-সংকলন : 'আমি সাগরের নীল'; প্রবন্ধগ্রন্থ : 'শিল্পীর রূপান্তর', 'কথা ও কবিতা'। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেছেন 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' ও বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত 'একুশে পদক'।

কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ সেপ্টেম্বর ৫৩ বছর বয়সে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।
অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট আমাদের নেই,
কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না— আপনার স্ফীত সঞ্চয় থেকে
উপচে-পড়া ডলার মার্ক কিংবা স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে যা পাবেন
ডাল্লাস অথবা মেম্ফিস অথবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ!

আসুন, ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান
রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা
আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বস্তুত শিল্প মানেই নকল নয় কি?
অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির জন্যে ব্যবহৃত সব উপকরণ
অকৃত্রিম;

আপনাকে আরও খুলে বলি : এটা, অর্থাৎ আমাদের এই দেশ,

এবং আমি যার পর্যটন দফতরের অন্যতম প্রধান, আপনাদের খুলেই বলি,
সম্পূর্ণ নতুন একটি ছবির মতো করে
সম্প্রতি সাজানো হয়েছে :
খাঁটি আর্যবংশ সম্ভূত শিল্পীর কঠোর তত্ত্বাবধানে ত্রিশ লক্ষ কারিগর
দীর্ঘ ন'টি মাস দিনরাত পরিশ্রম করে বানিয়েছেন এই ছবি।
এখনো অনেক জায়গায় রং কাঁচা– কিন্তু কী আশ্চর্য গাঢ় দেখেছেন?
ভ্যান গগ্–যিনি আকাশ থেকে নীল আর শস্য থেকে সোনালি তুলে এনে
ব্যবহার করতেন– কখনো, শপথ করে বলতে পারি,
এমন গাঢ়তা দ্যাখেন নি :
আর দেখুন, এই যে নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার– ওর ভেতরেও
একটা গভীর সাজেশান আছে– আসলে ওটাই এই ছবির– অর্থাৎ
এই ছবির মতো দেশের– থিম!

শব্দার্থ ও টীকা

মনোহারী স্পট – চিত্তাকর্ষক পর্যটনস্থল।

স্ফীত সঞ্চয় – ফুলে ফেঁপে ওঠা সঞ্চিত অর্থ।

ডলার – আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সরকারি মুদ্রার নাম।

মার্ক – বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের মুদ্রার নাম বা হিসাবের একক। সোনা ও রুপার ওজন পরিমাপে মার্ক হিসাবের একক হয়ে কাজ করে।

স্টার্লিং – পাউন্ড স্টার্লিং। পাউন্ড নামে বিশেষভাবে পরিচিত যুক্তরাজ্যের সরকারি মুদ্রা।

ডাল্লাস – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অন্যতম জনাকীর্ণ নগর।

মেম্ফিস – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য টেনিসির একটি নগর। নগরটি মিসিসিপি নদীর তীরে অবস্থিত।

কালিফোর্নিয়া – আয়তনের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য।

শিল্প মানেই নকল নয় কি? – কাব্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, সাহিত্য বা শিল্প হচ্ছে জীবনের বা ঘটনার অনুকরণ। এ অর্থেই কবি শিল্পকে 'নকল' বলেছেন।

খাঁটি আর্যবংশ সম্ভূত – আর্য মানে Aryan। মানবজাতিবিশেষ। এখানে খাঁটি বাঙালি চেতনার ধারক এক মহামানবকে বোঝানো হয়েছে।

ত্রিশ লক্ষ কারিগর – বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ।

ভ্যান গগ – বিশ্ববিখ্যাত ডাচ চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট উইলেম ভ্যান গগ (১৮৫৩-১৮৯০)। ইনি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী হিসেবে সমধিক পরিচিত। আবেগের সততা, রূঢ় সৌন্দর্য ও গাঢ় রং ব্যবহারের কুশলতায় বিশ শতকের চিত্রশিল্পে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি। *The Potato Eaters, self portraits, wheat fields* এবং *sunflowers* তাঁর অন্যতম বিখ্যাত ছবি।

নরমুণ্ডের ক্রমাগত ব্যবহার – বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী অসংখ্য শহিদের করোটি কবিকথিত ছবিতে বারবার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

সাজেশান – একটি বিশেষ চিন্তা যা নতুন কিছুর উন্মেষ ঘটায়।

থিম্ – আঁকা ছবিতে সঞ্চারিত বিশেষ কোনো চিন্তা বা বাণীকেই চিত্রশিল্পে থিম্ বলা হয়। সাধারণত ওই বাণী জীবন, সমাজ ও মানবীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়ে থাকে। থিম্-এর মাধ্যমে একটি ছবির মৌলিক ও বিশ্বজনীন মূল্য প্রতিভাত হয়।

পাঠ-পরিচিতি

“ছবি” কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আপন যৌবন বৈরী’ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় রোমান্টিক কবি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি কালজয়ী ছবি হিসেবে কল্পনা করেছেন। কবি নিপুণ শব্দের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন ত্রিশ লক্ষ খাঁটি বাঙালি-শিল্পী তথা শহিদের দীর্ঘ নয় মাসের শ্রমে-আত্মদানে সৃজিত হয়েছে এই ছবি। তাঁর নিশ্চিত ধারণা, রঙের জাদুকর শিল্পী ভ্যান গগও ছবিটিতে ছড়ানো রঙের আশ্চর্য গাঢ়তা কখনো দেখেননি। কবি মনে করেন, ছবিটিতে ব্যবহৃত অসংখ্য নরমুণ্ডের ব্যবহার ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে, যা এই ছবির মতো দেশটির গৌরবময় স্মারক। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এই দেশ পরিদর্শনের জন্য কবি বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবিতায়।

কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের গীতি সংকলন?

ক. আক্রান্ত গজল　　খ. আমি সাগরের নীল

গ. যেহেতু জন্মান্ধ　　ঘ. শিল্পীর রূপান্তন

২. ‘মেম্ফিস অথবা কালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ’– বলতে বোঝানো হয়েছে–

i. এদেশের অতুলনীয় সৌন্দর্য

ii. দেশের প্রতি কবির মমত্ববোধ

iii. মেম্ফিস, কালিফোর্নিয়ার সৌন্দর্য শিশুদের উপযোগী

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

এসেছি আবার ফিরে...রাতজাগা নির্বাসন শেষে
এসেছি জননী বঙ্গে স্বাধীনতা উড়িয়ে উড়িয়ে

৩. উদ্দীপকে "ছবি" কবিতার যে ভাবগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা হলো–

i. সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ii. যুদ্ধকালীন মানুষের বিপর্যস্ত জীবন

iii. বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত ভাবকে কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল 'নতুন একটি ছবি' হিসেবে কল্পনা করেছেন কেন?

ক. ছবির মতো সুন্দর দেশ বলে
খ. খাঁটি বাঙালি শিল্পীর আঁকা বলে
গ. অকৃত্রিম রঙ ব্যবহৃত হয়েছে বলে
ঘ. ত্রিশ লক্ষ কারিগরের রক্তে রঞ্জিত বলে

সৃজনশীল প্রশ্ন

শহিদের পুণ্য রক্তে সাত কোটি
বাঙালির প্রাণের আবেগ আজ
পুষ্পিত সৌরভ। বাংলার নগর, বন্দর
গঞ্জ, বাষট্টি হাজার গ্রাম
বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা
আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে।

ক. কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল এদেশকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

খ. কবি নিজেকে এদেশের পর্যটন দফতরের অন্যতম প্রধান বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে বাঙালির প্রাণের আবেগ পুষ্পিত হবার বিষয়টি "ছবি" কবিতায় কীভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে –ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বৈসাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপক ও "ছবি" কবিতা যেন একই সূত্রে গাঁথা– উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

লোক-লোকান্তর

আল মাহমুদ

কবি-পরিচিতি

আল মাহমুদ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মির আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তাঁর পিতার নাম আবদুর রব মির ও মাতার নাম রওশন আরা মির। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। দীর্ঘদিন তিনি সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'দৈনিক গণকণ্ঠ' ও 'দৈনিক কর্ণফুলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পরে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যোগদান করেন এবং পরিচালকের পদ থেকে অবসরে যান।

আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ অনন্য এক জগৎ তৈরি করেন। সেই জগৎ যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন নিয়ে নয়— স্নিগ্ধ-শ্যামল, প্রশান্ত গ্রামজীবন নিয়ে। গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির চিরায়ত রূপ নিজস্ব কাব্যভাষা ও সংগঠনে শিল্পিত করে তোলেন কবি আল মাহমুদ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— কাব্যগ্রন্থ : 'লোক-লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালী কাবিন', 'মায়াবি পর্দা দুলে উঠো', 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না', 'বখতিয়ারের ঘোড়া', 'আরব্য রজনীর রাজহাঁস'; শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ : 'পাখির কাছে ফুলের কাছে'; উপন্যাস : 'ডাহুকী', 'কবি ও কোলাহল', 'নিশিন্দা নারী', 'আগুনের মেয়ে' ইত্যাদি; ছোটগল্প : 'পানকৌড়ির রক্ত', 'সৌরভের কাছে পরাজিত', 'গন্ধবণিক'। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;
মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।
তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

শব্দার্থ ও টীকা

আমরা চেতনা...
চন্দনের ডালে – কবি তাঁর কাব্যচেতনাকে সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। এই চন্দন সুগন্ধি কাঠের গাছ। আর এর ফুল ঝাল-মিষ্টি লবঙ্গ। কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত।

মাথার ওপরে
নিচে... হয়ে
আছে ঠোঁট তার – চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির ওপরে-নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা। প্রকৃতির এই রহস্যময় ও সৌন্দর্যময় পরিবেশের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির চেতনারূপ পাখির ঠোঁট, তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ ও কাব্যভাষা।

আর দুটি চোখের
কোটরে...ঝোপের
ওপরে – কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলা, বাংলার অফুরন্ত রং তাঁর চেতনারূপ পাখির চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং, তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল। এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির সমগ্র চৈতন্য জুড়েই প্রাকৃতিক রঙের বৈচিত্র্য এবং নিসর্গ-উপলব্ধিরই এক অনিন্দ্যপ্রকাশ।

তাকাতে পারি
না আমি...
কবিতার আসন্ন
বিজয় – সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর তখন থাকেন না। তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, চেতনার রং-রূপ-রেখা, শব্দব্রহ্ম। তিনি শব্দ দিয়ে গড়ে তোলেন চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে; এবং জয় হয় কবিতার।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতাটি আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' কাব্যের নাম-কবিতা। এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। কবির চেতনা যেন সত্যিকারের সপ্রাণ এক অস্তিত্ব–পাখিতুল্য সেই কবিসত্তা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে বিরাজমান। প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে তার বসবাস। কবি চিত্রকল্পের মালা গেঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। এ কবিতায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা কবিকে কাতর করে, আহত করে। তবু কবি সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী। তাঁর সৃষ্টির বিজয় অবশ্যম্ভাবী – এই প্রত্যয় তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবির চেতনারূপ পাখি কোথায় বসে আছে?

ক. পানলতায় খ. ডালে
গ. ঝোপের ওপর ঘ. সুপারি পাতায়

২. "লোক-লোকান্তর" কবিতায় কবি পাখিটির দিকে তাকাতে পারেন না কেন?

ক. উজ্জ্বল রং বলে

খ. চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্যের জন্য

গ. সকল বাঁধন ছিন্ন করে সৃষ্টির জগতে চলে যাবার জন্য

ঘ. রঙের বাহারের জন্য

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডাকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।

৩. উদ্দীপকে "লোক-লোকান্তর" কবিতার যে ভাবের অনুরণন ঘটেছে, তা হলো–

i. কবি-হৃদয়ের বিহ্বলতা

ii. সৃষ্টির উন্মাদনা

iii. প্রকৃতির জাগরণ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উল্লিখিত দিকটি কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকারের পাখি

খ. যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল

গ. তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়

ঘ. সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

আমারও মন চৈত্রে পলাতক,
পলাশে আর আমের ডালে ডালে
সবুজ মাঠে মাঝবয়সী লালে
দণ্ড দুই মুক্তি-সুখে জিরায়ঃ
মাটির কাছে সব মানুষ খাতক।
... ...
একটি গানে গহন স্বাক্ষরে।
জানো কি সেই গানের আমি চাতক?

ক. "লোক-লোকান্তর" কোন জাতীয় কবিতা?

খ. 'আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক ও "লোক-লোকান্তর" কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত দিক কবিসত্তার প্রকাশ— বিচার কর।

ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

কবি-পরিচিতি

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যশোর জেলা শহরের পশ্চিম প্রান্তে খড়কি গ্রামে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ শাহাদাৎ আলী এবং মায়ের নাম রাহেলা খাতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সম্মান ও এর পরের বছর এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। ১৯৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই স্বদেশ ও সমকাল সচেতন এই কবির সাহিত্য-প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঋজু বক্তব্য, ছন্দ সচেতনতা এবং গীতিময়তা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘দুর্লভ দিন’, ‘শঙ্কিত আলোকে’, ‘বিপন্ন বিষাদ’, ‘প্রতনু প্রত্যাশা’, ‘ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার’, ‘ধীর প্রবাহে’ প্রভৃতি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের তেসরা সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

নদীর ধসের নিচে
বাতাসের মধ্যে আছে
কিছুটা আশ্রয়;
গানের বদলে পাখি চুপিসারে কথা বলে
শঙ্খের পরিভাষা শিখে,
ঢেউ হয়ে গেছে বালুময়।

ভেসে যাওয়া ডালপালা কুড়িয়ে কাড়িয়ে
আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে আছে
ভূমিহীন কৃষিজীবী, ইচ্ছে তার
জেলে হয়ে কিছু মাছ ধরে।

কোনো কোনো দিন যখন জলের তোড়
পাড় ভেঙে ঢুকে পড়ে ক্ষেতের উজানে
ফাটলে, দলিত ঘাস ফসলের শোভা ঠোঁটে

আবার সে ফিরে যায় কাদায় অক্ষর এঁকে দিয়ে;
তখন সে মাছ খোঁজে কাদাখোঁচা পাখির মতন।
সব মাঠ, হলুদ সবুজ কালো ফসলের সব মাঠ,
সময়ের প্রতীক্ষায় থাকে শুধু।
কখন মেঘের রঙ সাদা থেকে কালো হবে
জমে উঠবে মেঘের পাহাড়
কখন ক্ষেতের কাজ শুরু হবে কৃষকের
সময়ের প্রতীক্ষায় থাকা শুধু।

লাঙল নিড়ানি রেখে এখন কেবল
কোঁচ হাতে গোঁজ হয়ে মাছরাঙা গামছা পরে
একঠ্যাঙা বগের মতন চেয়ে থাকে।
মাটির টিলার পরে তার ঘরে
ঢিলাঢালা ফতুয়ার মধ্যে বসে
মাছভাত খেতে খেতে একদিন
আকালের গল্পকথা বলাবলি করবে তার স্বজনের সাথে
এই স্বপ্ন চোখে নিয়ে
প্রতীক্ষায় থাকা শুধু
মাছরাঙা গামছা পরে একঠ্যাঙা বগের মতন।

চোখের লবণ জমে চোখ জ্বলে
শুধু জ্বলে। কোঁচ হাতে গোঁজ হয়ে
সময়ের প্রতীক্ষায় থাকা শুধু।

শব্দার্থ ও টীকা

ধস – পাহাড়, নদীর পাড় প্রভৃতি থেকে মাটি বা পাথর খসে পড়া।

জলের তোড় – জলের চাপ।

দলিত ঘাস ফসলের শোভা
ঠোঁটে আবার সে ফিরে যায়
কাদায় অক্ষর এঁকে দিয়ে – জলে ঘাস ফসল ডুবে যাওয়ার পর আবার যখন জল নেমে যায় তখন বেরিয়ে আসা কর্দমাক্ত ভূমির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

কাদাখোঁচা	–	এক ধরনের পাখি।
হলুদ সবুজ কালো ফসলের সব মাঠ	–	সবুজ ফসল থাকে, পেকে সোনালি বা হলুদ হয়, ফসল কাটার পর নাড়া পোড়ালে মাঠ কালো বর্ণ ধারণ করে।
কোঁচ	–	মাছ-শিকারের জন্য লোহার ছুঁচালো ফলা লাগানো হাতিয়ার বিশেষ।
চোখের লবণ জমে চোখ জ্বলে	–	কৃষকের বেদনাকে বোঝানো হয়েছে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কৃষক জেলে হয়েছে। তবুও তার কষ্ট লাঘব হয় না। মাছের জন্যও তাকে প্রতীক্ষা করেই যেতে হয়। এই কষ্টের জীবন তাকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। প্রকৃতিনিবিড় মানুষের পরিবর্তমান জীবনপ্রবাহের এক নান্দনিক স্বপ্ন-উপাখ্যান এই কবিতাটি। জলবেষ্টিত এই বাংলার জনপদের একজন সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের কথা আছে এতে, আছে তার স্বপ্নসাধ। জলের তোড়ে এই কৃষক হয়ে ওঠে ভূমিহীন। কিন্তু আশাবাদী মানুষের এই দেশে সহজে কেউ হতোদ্যম হয় না। তাই ভূমি হারানো এই মানুষটি জলকে ঘিরেই বাঁচতে চায়। সে জেলে হতে চায়। খড়কুটো ডালপালা আশ্রয় করে আগুন জ্বালিয়ে সে জীবনের উত্তাপকে ফিরে পেতে চায়। এরই সঙ্গে সে মিলিয়ে নেয় তার চাওয়া– জেলে হয়ে মাছ ধরার। কেননা, জলমগ্ন এই চারপাশ ভূমিকর্ষণের অনুপযোগী। তাকে প্রতীক্ষা করতে হয় ভাবী সময়ের জন্য। আর এই অন্তর্বর্তী সময়ে সেই কৃষক বরণ করে নিতে চায় জেলেজীবন। জীবিকার এই রূপান্তর তাকে স্বপ্নশূন্য করে না। সে সুন্দর ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর হয়। বিগত কষ্টের দুঃখস্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে সেই আনন্দ এই কৃষকও একদিন লাভ করবে – এই আশা নিয়ে কবিতার এই কৃষক তার জীবনকে সজীব করে রাখে। সে মাছ ধরার প্রতীক্ষা করে। কিন্তু কবি এই সরল কাঠামোয় কবিতাটি বিন্যস্ত করেন না। তাঁর বোধের বহুমাত্রিকতায় উল্লিখিত ভূমিহীন কৃষককে পাখির আদল দিতে চান। মূলত পাখির প্রতীকেই কবি উল্লিখিত কৃষক চরিত্রটিকে রূপায়ণ করেন। তাই নদীর জলে ভূমি নিমজ্জিত হলে সেই কৃষক বাতাসে আশ্রয় খোঁজে; ঠিক যেমন একটি পাখি ডানা এলিয়ে ভেসে বেড়ায় বাতাসে। শুধু তাই নয়, ওই কৃষক তখন পাখির ভাষাও বোঝে। তাই পাখির কূজনকে তখন গান মনে না হয়ে সংজ্ঞাপনযোগ্য কথোপকথন বলেই তার বোধ হয়। আবার মাছরাঙা পাখির মতোই তার পোশাক, বকের ভঙ্গিতেই চলে তার মাছ ধরার প্রতীক্ষা। এভাবে পাখির সঙ্গে মিশে যায় সেই ভূমিহীন কৃষিজীবীর আপাত-উন্মূলিত জীবন। পাখির ভূমিতে আশ্রয় হয় না, এই কৃষকের ভূমিনির্ভর আশ্রয় হারিয়ে গেছে। মৎস্য শিকারি মাছরাঙা কিংবা বক যেমন করে মাছের প্রতীক্ষা করে, এই কৃষকও তেমনি জেলেজীবন গ্রহণ করে মাছের অপেক্ষা করে। এত যে পরিবর্তন, জীবনকাঠামোর রূপান্তর – এসব সত্ত্বেও ওই মানুষটি প্রকৃতিলগ্ন হয়ে বেঁচে থাকে, স্বপ্ন দেখে, অমিত জীবনীশক্তির উদ্বোধন ঘটায়। এই অনিঃশেষ প্রাণময়তাকেই কবি উপস্থাপন করেন আলোচ্য কবিতার সূত্রে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কবিতাটিতে কবি পর্ব নির্মাণে প্রয়োজন অনুসারে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। আবার ব্যতিক্রমী চরণ বিন্যাসের কারণেও ছন্দের দোলায় বিশেষত্ব যোজিত হয়েছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার" কবিতার ভূমিহীন কৃষিজীবীর কী ইচ্ছে জাগে?

ক. জেলে হয়ে মাছ ধরার
খ. সময়ের প্রতীক্ষায় থাকার
গ. চুপিসারে কথা বলার
ঘ. আকালের গল্প বলার

২. ভূমিহীন কৃষিজীবী লোকটিকে 'মাছরাঙা গামছা পরে একঠ্যাঙা বগের মতন' কল্পনা করার কারণ হলো–

i. প্রাকৃতিক বৈরিতায় তার অসহায়ত্ব
ii. বিপর্যস্ততায় নবজীবনের আশাবাদ
iii. রূপান্তরের সাথে অভিযোজন প্রয়াস

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

কত কথা আজ মনে পড়ে তার, গরিবের ঘর তার,
ছোটোখাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।

৩. উদ্দীপকে "ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার" কবিতায় যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, তা হলো–

ক. বিলাসী জীবন
খ. সংগ্রামশীলতা
গ. সুখের আশাবাদ
ঘ. দুঃখভারাক্রান্ত জীবন

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত চেতনার দিকটি যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

ক. নদীর ধসের নিচে/বাতাসের মধ্যে আছে/কিছুটা আশ্রয়;
খ. আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে আছে/ভূমিহীন কৃষিজীবী,
গ. চোখের লবণ জমে চোখ জ্বলে/শুধু জ্বলে।
ঘ. ...মাছরাঙা গামছা পরে/একঠ্যাঙা বগের মতন চেয়ে থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

গ্রামের পর গ্রাম কাল-কলেরায় উজাড়!
নিরীহ তালেব মাস্টারের বুকেও বজ্র পড়ল! কলেরায়
ছেলেটি মারা গেল বিনা পথ্যে, বিনা শুশ্রূষায়!
কাফনের কাপড় জোটেনি, তাই বিনা কাফনে
বাইশ বছরের বুকের মানিককে কবরে শুইয়ে দিয়েছি এখানে!
এই-ই শেষ নয়– শুনুন : বলি
মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম পলাশতলী
সেখানেও আকাল! মানুষে মানুষ খায়।
তিনদিনের উপবাসী আর লজ্জাবস্ত্রহীন হয়ে নিদারুণ ব্যথায়
দড়ি কলসি বেঁধে পুকুরের জলে ডুবে মরেছিল একদিন সন্ধ্যায়।

ক. "ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার" কবিতার ভূমিহীন কৃষিজীবী ঢিলাঢালা ফতুয়ার মধ্যে বসে কী খায়?

খ. 'সময়ের প্রতীক্ষায় থাকা শুধু' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. তালেব মাস্টারের জীবনচিত্র "ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার" কবিতার কৃষিজীবীর সাথে কোনদিক থেকে সাজুয্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাজুয্যপূর্ণ হলেও "ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার" কবিতার কৃষিজীবীর মতো তালেব মাস্টার অভিযোজন প্রয়াসী নন– এই উক্তির যৌক্তিকতা বিচার কর।

রক্তে আমার অনাদি অস্থি

দিলওয়ার

কবি-পরিচিতি

দিলওয়ার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা জানুয়ারি সিলেট শহরসংলগ্ন সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ভার্থখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম দিলওয়ার খান। কিন্তু কবি-জীবনের শুরু থেকেই তিনি জনমনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে পারিবারিক 'খান' পদবি বর্জন করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান, জননী রহিমুন্নেসা। দিলওয়ার সাধারণ্যে 'গণমানুষের কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। পেশাজীবনে প্রথমে দুইমাস শিক্ষকতা করলেও ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় এবং ১৯৭৩-৭৪ খ্রিষ্টাব্দে 'দৈনিক গণকণ্ঠে' সহকারী সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে ওই পেশা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। তিনি ছিলেন মূলত সার্বক্ষণিক কবি-লেখক ও ছড়াকার। তাঁর কবিতার মূল সুর দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা। গণমানবের মুক্তি তাঁর লক্ষ্য; বিভেদমুক্ত কল্যাণী পৃথিবীর তিনি স্বাপ্নিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'ঐকতান', 'উদ্ভিন্ন উল্লাস', 'স্বনিষ্ঠ সনেট', 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি', 'সপৃথিবী রইবোসজীব', 'দুই মেরু দুই ডানা', 'অনতীত পঙ্ক্তিমালা'। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'বাংলাদেশ জন্ম না নিলে' এবং ছড়াগ্রন্থ : 'দিলওয়ারের শতছড়া', 'ছড়ায় অ আ ক খ'। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও 'একুশে পদক'।
দিলওয়ার ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

পদ্মা তোমার যৌবন চাই
যমুনা তোমার প্রেম
সুরমা তোমার কাজল বুকের
পলিতে গলিত হেম।
পদ্মা যমুনা সুরমা মেঘনা
গঙ্গা কর্ণফুলী,
তোমাদের বুকে আমি নিরবধি
গণমানবের তুলি!
কত বিচিত্র জীবনের রং
চারদিকে করে খেলা,
মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে
কাটায় মারণ বেলা!
রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে
বঙ্গোপসাগরেই,
ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ
উপমা যে তার নেই!
এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন
গণমানবের বুকে—
যখন বোঝাই প্রাণের জাহাজ

নরদানবের মুখে!
পদ্মা সুরমা মেঘনা যমুনা ...
অশেষ নদী ও ঢেউ
রক্তে আমার অনাদি অস্থি,
বিদেশে জানে না কেউ!
[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

হেম	–	সুবর্ণ। সোনা।
পলিতে গলিত হেম	–	গলিত সোনা মেশানো পলিমাটি।
গণমানব	–	প্রান্তিক জনগণ।
গণমানবের তুলি	–	শিল্পী-জনতার তুলি। কবি এখানে গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন।
মারণ বেলা	–	হনন কাল। বিনাশ কাল।
ঘূর্ণি	–	ঘূর্ণ্যমান জলরাশি। আবর্তিত জলরাশি।
প্রাণের জাহাজ	–	এখানে জনতা ও জনসম্পদ বোঝাতে ‘প্রাণের জাহাজ’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।
নরদানব	–	নরপশু। মানুষরূপী দানব। এখানে বিদেশি নরপিশাচদের বোঝানো হয়েছে।
অশেষ নদী ও ঢেউ	–	আবহমান ছুটে চলা নদী ও ঢেউ।
রক্তে আমার অনাদি অস্থি	–	জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি যে কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন, এখানে সে-কথাই আলংকারিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

“রক্তে আমার অনাদি অস্থি” কবিতাটি কবির একই নামের কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। ‘রক্তে আমার অনাদি অস্থি’ ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাটি কবীর চৌধুরীর উদ্দেশে উৎসর্গিত। “রক্তে আমার অনাদি অস্থি” কবিতায় দিলওয়ার সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কবি বলেছেন, এই বাংলায় জীবনরূপ যেসব নদী নিরন্তর বয়ে চলেছে, গণশিল্পীর তুলি হাতে সেই বিচিত্র জীবনেরই তিনি রূপকার। তবে, বহমান জীবন এখানে বাধাহীন নয়। প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে পাতা রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদ। কিন্তু কবি একথা জানাতে ভোলেন না যে, তিনি তাঁর স্বপ্নকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের শক্তির কাছে আমানত রেখেছেন। এই শক্তিই সাগরের ঘূর্ণ্যমান ভয়াল জলরাশির মতো তাঁর ক্রোধকে শক্তিমান করেছে। আর এই ক্রোধ কেবল কবির একার নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন এ জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না। বিদেশিরা হয়ত জানে না যে, আবহমান ছুটে চলা নদীর মতোই কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন ওই জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি।

কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি পঙ্ক্তি ৬+৬ মাত্রার পূর্ণপর্বে এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “রক্তে আমার অনাদি অস্থি” কবিতার ‘প্রাণ স্বপ্ন’কে কোথায় রেখেছেন?

ক. ভয়াল ঘূর্ণিতে খ. বঙ্গোপসাগরে

গ. গণমানবের বুকে ঘ. নরদানবের মুখে

২. 'কত বিচিত্র জীবনের রং' বলতে বোঝানো হয়েছে জীবন–

ক. বহুমাত্রিক
খ. ভিন্নধর্মী
গ. সংগ্রামশীল
ঘ. সম্পদশালী

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

৩. উদ্দীপকে "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" কবিতায় কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. নদীর প্রবহমানতা
খ. সমুদ্রের ভয়াল জলরাশির শক্তি
গ. কবির অমিত মনোবল
ঘ. গণমানবের শক্তি

৪. উক্ত দিকটি কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ
খ. এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন/গণমানবের বুকে
গ. মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে/কাটায় মারণ বেলা
ঘ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি

সৃজনশীল প্রশ্ন

এ দেশের মাটি আমার শরীরে মাংসের মতো
কেউ চাইলেই–
আমার শরীর থেকে মাংস কেটে দিতে পারি না।
এ দেশের নদীর জল, আমার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত
প্রতিটি রক্তকণিকার মতো–
কেউ চাইলেই–
আমি এ নদীগুলোর অধিকার ছেড়ে দিতে পারি না।
এ দেশের বাতাস, আমার প্রতিটি বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস।
কেউ চাইলেই–
আমার নিঃশ্বাসের বাতাসে বারুদের গন্ধ ছড়াতে পারে না।
আমরা তা কিছুতেই দিতে পারি না...।

ক. "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" কবিতায় কবির ক্রোধকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

খ. বিদেশে জানে না কেউ!– কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "রক্তে আমার অনাদি অস্থি" কবিতায় কবির অভিব্যক্তি উদ্দীপকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা বিশ্লেষণ কর।

ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়
শহীদ কাদরী

কবি-পরিচিতি
শহীদ কাদরী ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খালেদ-ইবনে-আহমদ কাদরী। শহীদ কাদরী গত শতকের ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস-জীবন যাপন করছেন। সেখানে তিনি একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।
সুগভীর মননের অধিকারী শহীদ কাদরীর মূল প্রবণতা বৈশ্বিক বোধকে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে কবিতায় প্রকাশযোগ্য করে তোলা। বিশেষ করে ষাটের দশকের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বোপার্জিত বোধকে প্রকাশ করার উপায় হিসেবে তিনি রূপক-প্রতীকের আড়ালকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য শহীদ কাদরীর কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। কবিতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : ‘উত্তরাধিকার’ (১৯৬৭), ‘তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা’ (১৯৭৪), ‘কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই’ (১৯৭৮) প্রভৃতি।

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ
আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো
দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোর কাটা
জ্বলজ্বলে রূপ জ্যোৎস্নায়। তারপর তোমার উন্মুক্ত প্রান্তরে
কাতারে কাতারে কত অচেনা শিবির, কুচকাওয়াজের ধ্বনি,
যার আড়ালে তুমি অবিচল, অটুট, চিরকাল।
যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ— রক্তপাতে আর্তনাদে
হঠাৎ হত্যায় ভরে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
অথচ সেই প্রান্তরেই একদা ধাবমান জেব্রার মতো
জীবনানন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে উর্ধ্বশ্বাস বাতাস বয়েছে।
এখন সেই বাতাসে শুধু ঝলসে যাওয়া স্বজনের
রক্তমাংসের ঘ্রাণ এবং ঘরে ফিরবার ব্যাকুল প্ররোচনা।
শৃঙ্খলিত বিদেশির পতাকার নিচে এতকাল ছিল যারা
জড়োসড়ো, মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিস্তলের প্রোজ্জ্বল আদল
শীতরাতে এনেছিল ধমনীতে অন্য এক আকাঙ্ক্ষার তাপ।
আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিল নিদারুণ নির্বিকার,
সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়,
ব্ল্যাক-আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি;
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হয়ে
নিজেদের ঘরে।

শব্দার্থ ও টীকা

ব্ল্যাক-আউট	– নিষ্প্রদীপ। আলো বাইরে আনতে না দেওয়া। সাধারণত যুদ্ধ কিংবা জরুরি অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট এলাকা অন্ধকারে ঢেকে দেওয়ার কৌশল।
উদ্ধত তলোয়ারের মতো দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তার	– স্বদেশের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ যে ঘাস, কবি তার ভিতরেও প্রতিবাদের আলো, প্রতিরোধের সাহসকে অনুভব করেছেন।
কাতারে কাতারে কত অচেনা শিবির, কুচকাওয়াজের ধ্বনি	– শত্রুর আক্রমণ ও তাদের অস্ত্রের মহড়া। শত্রু কবলিত দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।
জীবনানন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস বাতাস বয়েছে	– জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এদেশের মানুষ ও প্রকৃতির কোমলতার প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। সেই কাব্যপ্রেরণা শহীদ কাদরীর চেতনায়ও গভীরভাবে ব্যাপ্ত। তাই তিনি জীবনানন্দের চোখ দিয়ে দেখা সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ আবহমান রূপসী বাংলার স্মৃতিচারণ করেছেন এই কবিতায়।
মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিস্তলের প্রোজ্জ্বল আদল	– কবি মানব-মস্তিষ্কের গঠনকে কুণ্ডলী পাকানো মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একই সঙ্গে এই মেঘ বিপদ ও শঙ্কার চিহ্ন বহন করে। এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে প্রয়োজন প্রতিরোধ – সশস্ত্র লড়াই। এই লড়াই চালিয়ে যেতে যত না শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার মানসিক শক্তির। তাই কবির কল্পনায় মস্তিষ্ক নিজেই হয়ে ওঠে অস্ত্র, পরিগ্রহ করে পিস্তলের আকার। এই বোধ ও চৈতন্যের অস্ত্রকে সঙ্গী করেই এদেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।
পূর্ণিমা	– যে তিথিতে চাঁদের ষোলকলা পূর্ণ হয়। পূর্ণিমার চাঁদের আলো বোঝাতে।
উঠোন	– আঙিনা। কবিতায় ‘নিজস্ব উঠোন’ বলতে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজের করে পাওয়া স্বদেশকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি শহীদ কাদরীর ‘নির্বাচিত কবিতা’ গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধ-বাস্তবতাকে কবি তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির ব্যতিক্রমী দ্যোতনায় উপস্থাপন করেছেন এই কবিতায়। আক্রান্ত স্বদেশ নিজেই এই কবিতায় এক সাহসী যোদ্ধা। সে প্রাকৃতিক কৌশলে তার সহযোদ্ধাদের যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে; শত্রুর বিরুদ্ধে গড়ে তোলে অলঙ্ঘ্যনীয় প্রতিরোধ। কবি এই সহযোদ্ধাদেরই একজন। তাই তিনি স্বদেশকে একটি

আংটির মতো করে আপন কনিষ্ঠ আঙুলে ধারণ করেন; স্বদেশের সঙ্গে গড়ে তোলেন নিবিড় এক সম্পর্ক। কবিতায় উল্লেখিত "কনি" আঙুল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন গ্রিসে হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে পাঁচ দেবতাকে বোঝানো হতো; যেমন : তর্জনী দিয়ে বোঝানো হতো দেবরাজ জিউসকে, বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বোঝানো হতো সমুদ্র দেবতা পসিডনকে। ঠিক একইভাবে গ্রিক যুদ্ধ দেবতা এরিসকে প্রতীকায়িত করে এই "কনি" আঙুল; যা কেবল লড়াই নয়, একই সঙ্গে নিরাপত্তা প্রদানেরও প্রতীক। আর এই ব্যঞ্জনাকেই কবি আলোচ্য কবিতায় ব্যবহার করেছেন। স্বদেশকে কবি এখানে আংটির সঙ্গে তুলনা করেছেন আর 'কনি আঙুল' দ্বারা প্রতীকায়িত এরিসের মতোই অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দেশ-মাতৃকার নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে, এই 'আংটি' শব্দবন্ধ দ্বারা উপমিত স্বদেশ হচ্ছে কবির অভিজ্ঞান তথা পরিচয়-চিহ্ন। কেননা, স্বদেশকে দিয়েই তো বিশ্বে আমাদের পরিচয় চিহ্নিত হয়। মাতৃভূমিকে নিয়ে কবির এই বহুমাত্রিক অনুভব ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। যাকে তিনি তুলনা করেছেন আংটির সঙ্গে, পরে তাকেই আবার তুলনা করছেন জেব্রার সঙ্গে। প্রাণিজগতে জেব্রা শারীরিক গঠনে ও স্বভাবে অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত; সৌন্দর্য, সততা আর স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। এদের দেহের সাদা-কালো ডোরাকাটা বৈপরীত্যের সম্মিলনকে নির্দেশ করে; ঠিক যেমন এদেশেও নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষ অনায়াসে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। একই সঙ্গে জেব্রা অত্যন্ত সামাজিক এবং একের বিপদে অন্যের এগিয়ে আসার প্রবণতার কারণে এরা বিশেষভাবে খ্যাত। বাংলা ভূখণ্ডেও এই সামাজিক সম্প্রীতি দূরাতীত কাল থেকেই সুলভ। তাই কবি অত্যন্ত সচেতনভাবে স্বদেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেন জেব্রার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বময়তাকে।

এদেশে সামরিক আগ্রাসন, পাকিস্তানি শোষকদের নির্মম অত্যাচার, লাখো মানুষের হত্যা, নির্যাতন – এত সবকিছুর পরেও কবির মহিমান্বিত স্বদেশ অটল অচঞ্চল হয়ে জেগে থাকে। লাখো মৃত্যুর বেদনা এদেশের মানুষকে দমিয়ে ফেলতে পারেনি। পরাধীনতার শিকলে যারা বাঁধা পড়েছিল দীর্ঘদিন, তারাই মুক্তির বোধে উজ্জীবিত হয়েছে; মগজের অস্ত্রের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে হাতে তুলে নিয়েছে যুদ্ধজয়ের আয়ুধ। মুক্তিসংগ্রামের এই পথে কবির কল্পনায় বাংলার নিসর্গও আবির্ভূত হয়েছে একজন সপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধার বেশে।

মুক্তিযুদ্ধের এই অমর অভিব্যক্তি কেবল কবিতাটির বক্তব্যে নয়, এর আঙ্গিক সৌকর্যেও গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই 'কনি আঙুল', 'জেব্রা', 'জীবনানন্দের কোমল শরীর', 'বিদ্রোহী পূর্ণিমা' প্রভৃতি শব্দবন্ধের আশ্রয়ে কবি প্রতীকের মালা গাঁথেন। আবার এরই সঙ্গে তিনি নান্দনিক চিত্রকল্পের ঋজু সমাহারকে সমন্বিত করেন। তাই 'বাতাসে শুধু ঝলসে যাওয়া স্বজনের রক্তমাংসের ঘ্রাণ', 'মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিস্তলের প্রোজ্জ্বল আদল', 'আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠান পার হ'য়ে নিজেদের ঘরে'– এসব পঙ্‌ক্তি পাঠক হৃদয়ে ইন্দ্রিয়াতীত বোধকে উদ্দীপিত করে। এর মধ্য দিয়ে কবিতাটি হয়ে ওঠে বিশেষভাবে নান্দনিকতাঋদ্ধ।

কবিতাটি অসমপর্ব বিশিষ্ট এবং অক্ষরবৃত্তের চালে গদ্যছন্দে রচিত।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়" কোন কবির নাম উল্লেখিত হয়েছে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ. জীবনানন্দ দাশের

গ. আল মাহমুদের ঘ. মহাদেব সাহার

২. "ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়" যে কারণে জেব্রার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে তা হলো–

i. গতিময় সৌন্দর্য প্রকাশে
ii. স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে
iii. বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্য বোঝাতে

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলার নগর বন্দর গঞ্জ বাষট্টি হাজার গ্রাম
ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে।

৩. উদ্দীপকে "ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়" কবিতার কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে?

ক. অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ
গ. পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ঘ. স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন

৪. উক্ত দিকটি যে অংশে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

ক. যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ– রক্তপাতে আর্তনাদে
খ. এখন সেই বাতাসে শুধু ঝলসে যাওয়া স্বজনের/রক্তমাংসের ঘ্রাণ
গ. মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিস্তলের প্রোজ্জ্বল আদল
ঘ. ব্ল্যাক-আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে/বিদ্রোহী পূর্ণিমা

সৃজনশীল প্রশ্ন

মিলিটারির দল বৃত্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপরে অনেক পুরনো বৃক্ষরাজি তার বিশাল বিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছায়াময় করে জায়গাটিকে মায়াময় করে তুলেছে। কয়েকটি শাখা ভেঙে ঝুলে আছে, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। সেই বৃত্তের মাঝখানে হাত বাঁধা সজীবকে টানতে টানতে এনে দাঁড় করানো হলো। সজীবের নাক-মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, মুক্তিবাহিনী কোথায় পালিয়ে গেছে? তার একই জবাব, তিনি কিছুই বলবেন না। বন্দুকের নলটা কপালের ঠিক মাঝখানটায়। তাকে শেষ সুযোগ দেওয়া হয়। সজীব বলেন, 'আমার মতো সাধারণ সজীবের মৃত্যুতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু মুক্তিফৌজদের জীবনের দাম আছে। মুক্তিফৌজ না হলে তোমাদের মারবে কে? বেঁচে থাক তারা।' গুলিটা কপাল ভেদ করে বেরিয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সজীব। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকট শব্দে ঝুলন্ত কয়েকটি বিশাল শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর মাথার ওপর পড়ে।

ক. "ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়" কবিতায় ঊর্ধ্বশ্বাস বাতাস বয়েছে কিসের মতো?

খ. বাঙালির 'নিজস্ব উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে' ফেরার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে "ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়" কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটি "ব্ল্যাক-আউটের পূর্ণিমায়" কবিতার মূল চেতনাকে আরও শানিত করেছে— মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিচার কর।

শান্তির গান

মহাদেব সাহা

কবি-পরিচিতি

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি মহাদেব সাহা ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পাবনা জেলার ধানঘড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গদাধর সাহা এবং মায়ের নাম বিরাজমোহিনী সাহা। কবির শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বগুড়া এবং রাজশাহীতে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

মহাদেব সাহার কবিতা মানবের সুখ ও দুঃখের এক চলমান উপাখ্যান। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, রাজনীতি-মনস্কতা মহাদেব সাহাকে টেনে আনে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', 'মানব এসেছি কাছে', 'চাই বিষ অমরতা', 'ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস', 'কোথা প্রেম কোথা সে বিদ্রোহ', 'বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ', 'একবার নিজের কাছে যাই' প্রভৃতি। তিনি ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকসহ আরও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা এশিয়ার কৃষক
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা আফ্রিকার শ্রমিক
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা ইউরোপের শিশু
আমরা শান্তি চাই;
আমাদের সকলের সমবেত প্রার্থনা আজ– শান্তি।
এই শান্তির জন্যে মিউনিখ শহরে তোলপাড় করেছি আমরা
এই শান্তির জন্যে ইতালির রাজপথে করেছি দীর্ঘ মিছিল
এই শান্তির জন্যে নিউইয়র্ক শহরে বিক্ষোভ করেছি অসংখ্য
মানুষ;
এই শান্তির জন্যে আমরা আফ্রিকার শিশু
প্যালেস্টাইনের কিশোর আর নামিবিয়ার যুবক
কতো বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি,
আবার এই শান্তির জন্যে বাংলার দুঃখিনী মায়ের চোখে
ঘুম নেই।

সবুজ শস্যক্ষেত, সদ্যফোটা ফুল ও শিশুর
হাসির জন্যে
পৃথিবী জুড়ে আমরা চাই শান্তিকল্যাণ।
শান্তি চাই যারা শিশুদের ভালোবাসি
শান্তি চাই যারা রাঙা গোলাপ ভালোবাসি;
শান্তি চাই যারা লুমুম্বা, আলেন্দে ও শেখ মুজিবের
নিষ্ঠুর মৃত্যুর জন্য কাঁদি
শান্তি চাই যারা পিকাসোর গোয়ের্নিকার কথা ভাবি
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই—
শিশুদের পদধ্বনির মতো শান্তি
বকুল ঝরে পড়ার মতো শান্তি
রজনীগন্ধার খোলা পাপড়ির মতো শান্তি।
আমরা হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যথিত আত্মা
আমরা শান্তি চাই;
আমরা ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের
স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদ
আমরা শান্তি চাই;
আমরা শোকাহত মায়ের চোখের জল
বোনের ক্রন্দন, স্ত্রীর শোকাশ্রু—
আমরা শান্তি চাই;
আমরা কবিতা ভালোবাসি
আমরা শান্তি চাই;
আমরা শিল্প ও জীবন ভালোবাসি
আমরা শান্তি চাই;
আমরা এখনো মানুষের হৃদয় ও মনুষ্যত্বে
সমান বিশ্বাসী
আমরা শান্তি চাই।

[*সংক্ষেপিত*]

শব্দার্থ ও টীকা

মিউনিখ — জার্মানির বায়ার্ন রাজ্যের রাজধানী। জার্মান ভাষায় শহরটির নামের উচ্চারণ ম্যুনশেন। শহরটি ইসার নদীর তীরে বেভারীয় আল্পসের উত্তরে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসময়ে হিটলারের বিরুদ্ধে এই শহরে ছাত্র ও শিক্ষকরা এক অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

নিউইয়র্ক — যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিউইয়র্ক রাজ্যের সবচেয়ে বেশি জন-অধ্যুষিত মহানগর। জাতিসংঘের সদর দপ্তর হওয়াতে এ মহানগর বিশ্ব মানবের মিলন কেন্দ্রে পরিণত।

প্যালেস্টাইন — আরবি উচ্চারণে ফিলিস্তিন। ভূমধ্যসাগর এবং জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। ইসরাইলের সঙ্গে এখনও এই অঞ্চলের জনগণের যুদ্ধ চলছে।

নামিবিয়া — আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি দেশ। দক্ষিণ-আফ্রিকার শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় চব্বিশ বছরব্যাপী দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধের পর ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে দেশটি স্বাধীন হয়।

লুমুম্বা — প্যাট্রিস এমেরি লুমুম্বা; জন্ম দোসরা জুলাই ১৯২৫, মৃত্যু ১৭ই জানুয়ারি ১৯৬১। আফ্রিকার দেশ কঙ্গোর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা এবং দেশটির প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা লাভের মাত্র বারো সপ্তাহ পরে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি নিহত হন।

আলেন্দে — সালভাদর গুইলার্মো আলেন্দে গোসেন্‌স; জন্ম ২৬এ জুন ১৯০৮ এবং মৃত্যু ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। চিলির বামপন্থি নেতা এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম মার্কসবাদী রাষ্ট্রপতি। দেশ পরিচালনার নীতিসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং সেনাবাহিনীর এক অভ্যুত্থানে বন্দি হন। বন্দি অবস্থাতেই তিনি তাঁর শেষ ভাষণ দেন এবং পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে হত্যা করা হয়।

পিকাসো — পাবলো রুইজ ই পিকাসো; জন্ম ২৫এ অক্টোবর ১৮৮১ এবং মৃত্যু ৮ই এপ্রিল ১৯৭৩। বিশ শতকের বিখ্যাত স্পেনীয় চিত্রশিল্পী। বিশ শতকের অন্যতম শিল্প-আন্দোলন কিউবিজমের অন্যতম প্রবক্তা। ওই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল আঁকা ছবিতে বিমূর্ততা সঞ্চার এবং ত্রিমাত্রিকতা যোজনা করা, যার সাহায্যে একটি ছবিকে বহু দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা যায়।

গ্যের্নিকা — পিকাসোর একটি বিখ্যাত ছবি। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলাকালে উত্তর স্পেনের একটি ছোট শহর গ্যের্নিকায় জার্মান ও ইতালির মদদে বোমা হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই ছবিটি তিনি আঁকেন। ছবিটিতে যুদ্ধের মর্মান্তিকতা এবং সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা ও অসহায়ত্বকে তুলে ধরা হয়।

হিরোশিমা-নাগাসাকি – জাপানের দুটি শহর। শহর দুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পারমাণবিক বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়।

ভিয়েতনাম – ইন্দোচীন উপদ্বীপের অংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পূর্বে অবস্থিত দেশ। বহু বছরের লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে দেশটির। একসময় উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম দুইটি পৃথক অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর ১৯৭৬ সালে এই দুই অংশ এক হয়ে যায়।

পাঠ-পরিচিতি

"শান্তির গান" কবিতাটি কবি মহাদেব সাহার 'ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস' (১৯৮৪) গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী মানুষের জন্য শান্তির অন্তহীন প্রত্যাশা নিয়ে কবি যে গান রচনা করে চলেন অবিরাম, তারই দ্যোতনা বহন করে আলোচ্য কবিতাটি। এ কবিতায় কবি ধাপে ধাপে তুলে ধরেছেন—কাদের জন্য এই শান্তি, কেমন করে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে, শান্তিকামী এই মানুষগুলোর মনস্তত্ত্বই বা কেমন। এক কথায় বলা যায় যে, কবির এই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা মূলত মেহনতি মানুষের জন্য, শিশুদের জন্য, মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত সকলের জন্য। তাই কবি এশিয়ার কৃষক, আফ্রিকার শ্রমিক, ইউরোপের শিশু—সকলকে এই শান্তি-পতাকার তলে সমবেত করতে চান। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কবি এবং কবির মতো মানুষেরা লড়াই করেন; প্রতিবাদের ঝড় তোলেন মিউনিখ, নিউইয়র্কসহ ইতালির বিভিন্ন শহরের পথে পথে। কিন্তু শান্তি বিরোধীরাও থেমে থাকে না। তারা হয়ে ওঠে আরও হিংস্র, ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর। এইসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে, অশান্তির গর্জনকে থামিয়ে দিতে প্রয়োজন হয় সতর্ক প্রহরার। তাই যুগে যুগে আফ্রিকার শিশু, প্যালেস্টাইনের কিশোর, নামিবিয়ার যুবক এমনকি বাংলাদেশের দামাল মুক্তিযোদ্ধারা নির্ঘুম রাত জেগে হয়ে ওঠে শান্তির প্রহরী। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন 'একটি ফুলকে' বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করেছিল, তেমনি এই শান্তির সেনানীরা 'শস্যক্ষেত, সদ্যফোটা ফুল, শিশুর হাসির জন্যে' শান্তি চায়। এই শান্তির পক্ষের মানুষগুলোর মন হয় কোমল, হৃদয়জুড়ে থাকে অফুরান আবেগ। তাই তারা লুমুম্বা, আলেন্দে, শেখ মুজিবের নির্মম হত্যাকাণ্ডে অশ্রুসিক্ত হয়, পিকাসোর গ্যের্নিকা তাদের আবেগাপ্লুত করে।

কবিতাটি বিবৃতিধর্মী; বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কবি একের পর এক স্বভাবোক্তি করে চলেন। কেননা, কবি জানেন, প্রতিবাদের কথা, প্রত্যাশার কথা বলতে হয় সরাসরি স্পষ্টভাবে। তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলা যায়, অলংকারসমৃদ্ধ কবিতা রচনার প্রচল রীতি থেকে মহাদেব সাহা এই কবিতায় বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। যা তিনি বলতে চান তাতে কোনো আড়াল রাখার পক্ষে তিনি নন। কবি মানুষের দুঃখের কথা বেদনার কথা আশার কথা প্রত্যাশার কথা তুলে ধরার জন্য গদ্যের সহজ ভঙ্গি কবিতায় ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কবিতাটিকে নিবিড়ভাবে বাস্তবঘনিষ্ঠ করে তুলতে তিনি ব্যবহার করেন অনেক ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ। পৃথিবীর চেনা ভূগোলকে তিনি কাব্যিক পেলবতায় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন। আর এরই সঙ্গে কবি অন্তর্বয়ন ঘটান 'বকুলের ঝরে পড়ার মতো শান্তি', 'রজনীগন্ধার খোলা পাপড়ির মতো শান্তি'— এরকম উপমামণ্ডিত নান্দনিক আবহসমৃদ্ধ পঙ্ক্তিমালা। এভাবে কবিতাটি বিষয়ে ও আঙ্গিকে বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে।

কবিতাটি গদ্যছন্দের চাল অনুসরণ করে রচিত। অন্ত্যমিলবিহীন ছোটবড় পঙ্ক্তিতে কবিতাটির কাঠামো গড়ে উঠেছে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. “শান্তির গান” কবিতায় কার চোখে ঘুম নেই?

ক. আফ্রিকার শিশুর
খ. প্যালেস্টাইন কিশোরের
গ. বাংলার দুঃখিনী মায়ের
ঘ. নামিবিয়ার যুবকের

২. ‘বকুল ঝরে পড়ার মতো শান্তি’ বলতে বোঝানো হয়েছে–

i. নিঃশব্দের শান্তি
ii. শান্তির বিস্তার
iii. শান্তির সৌরভ

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সঙ্গে আজ সংগ্রামের তরে।

৩. উদ্দীপকে “শান্তির গান” কবিতার যে ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, তা হলো–

i. অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো
ii. অধিকার আদায়ে নবজাগরণ
iii. শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত ভাব যে অংশে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. পৃথিবীজুড়ে আমরা চাই শান্তিকল্যাণ
খ. এই শান্তির জন্যে বাংলার দুঃখিনী মায়ের চোখে/ঘুম নেই
গ. শান্তি চাই যারা লুমুম্বা, আলেন্দে ও শেখ মুজিবের/নিষ্ঠুর মৃত্যুর জন্য কাঁদি
ঘ. এই শান্তির জন্যে মিউনিখ শহরে তোলপাড় করেছি আমরা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাটি থেকে করব উৎপাট একসঙ্গে সবচেয়ে লম্বা দেবদারু
যেখানে তার শিকড় ছিল আগে সেই গর্তে ফেলব ছুড়ে
আমাদের সব অস্ত্র।
ধরিত্রী গর্ভে, ধরণী তলে
পুঁতব মোরা আমাদের সব অস্ত্র, মোরা চিরতরে দেব কবর তাকে সেই গভীরে
আর পুঁতব সেই জায়গায় দেবদারু
হ্যাঁ, আসবে সময় মহা শান্তির।

ক. "শান্তির গান" কবিতায় কোন শহরে শান্তির জন্য তোলপাড়ের কথা বলা হয়েছে?

খ. 'আমরা হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যথিত আত্মা'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কবিতাংশে "শান্তির গান" কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত দিকটি "শান্তির গান" কবিতার মূলচেতনা প্রতিষ্ঠার একমাত্র নিয়ামক নয়– মন্তব্যটির যথার্থ্য বিচার কর।

সমাপ্ত

২০১৮-২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম

বাংলা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়